গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

চতুর্থ ষাণ্মাসিক

প্রথম পত্র **(Paper : 1)**
রবীন্দ্র-সাহিত্য

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)
বিভাগ - ১ : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস (কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প)
বিভাগ - ২ : আত্মপরিচয়
বিভাগ - ৩ : বলাকা (কবিতা সংখ্যা - ১, ৪, ৭, ৮, ৩৬)
বিভাগ - ৪ : রক্তকরবী

Contributor :

Dr. Debjani Taron Sarmah (Units: 1 & 2)	Dept. of Bengali Guwahati College
Devarati Jana (Units: 3 & 4)	Dept. of Bengali Gauhati University
Ratnadip Purakayastha (Units: 5, 6, 7, 8, 9, 10 &11)	Dept. of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya

Course Co-ordination :

Prof. Kandarpa Das	Director, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Language Editing :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Proof Reading :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati
Swapan Das	Research Scholar Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Cover Page Design

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-74-0

April, 2015

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset Press, Mirza, Copies printed 500.

Acknowledgement

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

পত্র পরিচিতি

চতুর্থ ষাণ্মাসিক প্রথম পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের আলোচ্য এই পত্রের পাঠ্যতালিকায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন কালপর্বে রচিত প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গদ্যগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসও এই পর্বে আমাদের পাঠ্য। বিভাগ বা অধ্যায়কেন্দ্রিক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আসুন, রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন এবং পঠন-পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে চিহ্নিত করা যাক।

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র পর্বের রূপকার। সৃষ্টির বিপুলতা ও বৈচিত্র্য, ভাবগাম্ভীর্য ও শিল্পনৈপুণ্যে তিনি একটি দীর্ঘস্থায়ী যুগের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় ব্যক্তিরূপে অভিহিত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগেই তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতা ও গভীরতা সর্বসক্ষমে প্রতিভাত হয়েছিল। তবু, সাধারণভাবে বিশ শতকের প্রথমভাগকে রবীন্দ্র-যুগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা এবং রচনার উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল। বস্তুত জীবনের শেষপর্বেও তিনি ছিলেন নব নব ভাবকল্পনা ও রূপচেতনাকে আয়ত্ত করার জন্য সদা-সতর্ক। আমরা এই আলোচ্য পত্রে নানাপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ করব।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য এক অভিনব অভিজ্ঞতা, রূপান্তর ও মত-সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন-পরিবর্জনের কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়সীমায় সাহিত্যের আদর্শ ও রূপরীতি নিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও দলের নানা সংঘাত ঘনিয়ে উঠেছে; ইউরোপ, আমেরিকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এই সময় বাংলা সাহিত্যে পক্ষবিস্তার করেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রপ্রভাব বিকাশের শীর্ষে আরোহণ করেছে, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সেই প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে ভিন্নপথে যাত্রা করার প্রবণতাও বাংলা সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। এই সমস্ত কিছুই রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। আমরা এই পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে নিয়েছি আলোচনার সুবিধার জন্য। আসুন, আমাদের পাঠ্যবিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক।

বিভাগ - ১ : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস (কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প)

বিভাগ - ২ : আত্মপরিচয়

বিভাগ - ৩ : বলাকা (কবিতা সংখ্যা - ১, ৪, ৭, ৮, ৩৬)

বিভাগ - ৪ : রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে সমসাময়িক এবং পরবর্তী সাহিত্যিকদের উপর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও শিল্প-সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই হাতে নাট্যসাহিত্যে অনেকগুলি নতুন ধারা

(কাব্যনাট্য, সংকেত-রূপকনাট্য ইত্যাদি) সূচিত হয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র পথানুসন্ধান করেছিলেন তিনি। বাংলা ছোটোগল্প প্রকৃতি রূপসিদ্ধি লাভ করল তাঁরই মাধ্যমে। কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে ভাব ও রূপরীতির বহুবিচিত্র নবীনতা তিনি আনয়ন করেছিলেন। বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই মূল্যবোধের যে নিশ্চিত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই নবমূল্যবোধের ভাবরসের ঐতিহ্য বহমান। উনিশ শতক এবং বিশ শতকের দুই স্বতন্ত্র পর্বকে তিনি যুক্ত করেছেন। ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি আধুনিকতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁরই জন্য বাংলা সাহিত্যে নবজাগৃতির ভাব-ভাবনার কৃত্রিমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, অন্যদিকে ইউরোপীয় চিন্তা-জগতের সাম্প্রতিক রুগ্‌ণতার অনুপ্রবেশ বিলম্বিত হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের প্রভাবিত করেছেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করা লেখকগোষ্ঠীর উপরও তাঁর প্রভাব ছিল অন্তর্লীন ফল্গুধারায় প্রবহমান।

উপযুক্ত কথাগুলো মনে রেখেই আমরা এই পত্রের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। বস্তুত এই প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডেই আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব ও উপযোগিতা নির্ভরশীল। আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুবিস্তৃত বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পাঠ্যগুলিকে আমরা কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক ভাগ করে আলোচ্য পত্ররে বিভাগে বিন্যস্ত করেছি।

আপনাদের নিজেদের মূল্যায়নের সুবিধার জন্য আলোচনার মধ্যে সংযোজিত হয়েছে 'আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন'। এছাড়াও রয়েছে 'লক্ষণীয় প্রসঙ্গ', — যার মাধ্যমে আপনারা অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আলোচনার শেষে রয়েছে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু প্রশ্ন (নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন), —যা থেকে আপনারা নিজেদের অগ্রগতির পরিমাপ করতে পারবেন।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিশেষ কারণ-বশত রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থটির আলোচনা এই পত্রে সংযোজিত করা গেল না। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংযোজন করব। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

বিভাগ পরিচিত

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের প্রথম পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের ইতিহাস, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনা এই পত্রে স্থান পেয়েছে। এই পত্রের বিভাগ-গত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক্—

বিভাগ - ১ : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস : কাব্য

বিভাগ - ২ : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস : নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্প

বিভাগ - ৩ : বলাকা : সাধারণ পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিভাগ - ৪ : বলাকা : নির্বাচিত কবিতার আলোচনা

বিভাগ - ৫ : রক্তকরবী : কাহিনিবৃত্ত

বিভাগ - ৬ : রক্তকরবী : প্রসঙ্গকথা ও পটভূমি

বিভাগ - ৭ : 'রক্তকরবী'-এর চরিত্র মালা —১ : রঞ্জন, নন্দিনী ও রাজা

বিভাগ - ৮ : 'রক্তকরবী'-এর চরিত্র মালা —২ : বিশু, কিশোর ও অধ্যাপক

বিভাগ - ৯ : রক্তকরবী : সংগীত প্রয়োগ

বিভাগ - ১০ : রক্তকরবী : ভাষা ও সংলাপ

বিভাগ - ১১ : রক্তকরবী : নামকরণ ও শ্রেণিবিচার

বিভাগ-১
রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস
রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস : কাব্য

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ রবীন্দ্র-কাব্যধারার সাধারণ পরিচিতি

- ১.২.১ রবীন্দ্র-কাব্যের উন্মেষ পর্ব
- ১.২.২ রবীন্দ্র-কাব্যের ঐশ্বর্য-পর্ব
- ১.২.৩ 'নৈবেদ্য'থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্র কাব্যে ভাববস্তুর অগ্রসরের পথ-রেখা
- ১.২.৪ রবীন্দ্র-কাব্যের অন্ত্যপর্ব

১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অন্তর্নিহিত গতিশীলতা এবং বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য নিয়ে ক্রম-পরিণামের পথেযাত্রা। একটি নির্দিষ্ট ধারায় বহমান রবীন্দ্র-কবিমানসের পরিণামের প্রকারই কাব্যমোদী পাঠনকে সমধিক চমৎকৃত করে। রবীন্দ্রনাথ কবি, ঋষি অথবা দার্শনিক যে রূপেই পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ না করুন কেন, তাঁর বিচিত্র বাণীর মধ্যে বেদ-বেদান্ত, আর্য বা লৌকিক ধর্ম ও দর্শনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের যেমন প্রতিবিম্বনই ঘটুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিস্বভাবের দিক দিয়ে বিচার না করলে তাঁর কাব্যের সর্বসংস্কারমুক্ত উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবে।

রবীন্দ্র প্রতিভা যদিও বহুমুখী, কিন্তু কবিত্বেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই তাঁকে বিশ্বকবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, প্রারম্ভ থেকে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত — অপ্রকাশের কাল, 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্যে 'প্রতিভার উন্মেষ', চিত্রা কাব্যে 'বিকাশের প্রথম পর্যায়', চৈতালি কাব্য থেকে নৈবদ্য কাব্য 'বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়' — সংস্কৃত সাহিত্যের ও প্রাচীন জীবনাদর্শের অনুকরণের কাল নৈবদ্য কাব্যটিতে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধর্মাদেশের পূর্ণতম অভিব্যক্তির পরিচয় লাভ করা যায়। নৈবেদ্য, উৎসর্গ, খেয়া বিকাশের তৃতীয় পর্ব বলে

পরিচিত। বিকাশের চতুর্থ পর্যায় হিসাবে গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি, মহুয়া পর্যন্ত বিকেলের শেষ পর্যায় আর তখনই অরূপের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়, এবং সমন্বয়েই জীবনের পরিপূর্ণতা। পরবর্তীকাল পরিশেষ, পুনশ্চ কাব্য থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবনের বিস্তৃত অধ্যায়টি 'গোধূলি পর্যায়' নামেই অভিহিত।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম পর্যায় হিসাবে রবীন্দ্রকাব্যেকে আমরা চিহ্নিত করেছি। রবীন্দ্রকাব্যের পরিধি বিশাল ও বিস্তৃত। তাই রবীন্দ্রকাব্যকে পর্যায় হিসাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন কাল-পর্বে রচিত কাব্যগুলির পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। কাব্যের প্রেক্ষাপট, কাব্যের রচিত সন ইত্যাদি আলোচনা করা হবে।

- আপনারা রবীন্দ্রকাব্যের সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তথা কবির মনোভাব জানতে সক্ষম হবেন।
- প্রতিটি কাব্যের রচনার উদ্দেশ্যও আলাদা আলাদা
- প্রতিটি কাব্যের মধ্যে আমরা লাভ করব কবির জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য।
- তাছাড়া উন্মেষ পর্ব থেকে একেবারে গোধূলি পর্যায় পর্যন্ত কবির জীবনের বিচিত্র চিন্তাধারার ধারণা ও রসয-রচনা পাঠ করতে সক্ষম হব। তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রেম ও প্রকৃতির যে অপূর্ব সমারোহ রয়েছে তাও আপনারা জানতে সক্ষম হবেন।

১.২ রবীন্দ্র-কাব্যধারার সাধারণ পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। সার্থক কবির সকল লক্ষণই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে বাড়ির সাহিত্যিক পরিবেশে থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সেই কাব্য নাটক প্রভৃতি রচনায় রত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো, তখন ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি পিতার সঙ্গে প্রথম বোল গিয়েছিলেন। এখানেই বালক-কবি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে এক বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেছিলেন। তারপর কবি কয়েকটি গাথা রচনা করে ছিলেন। 'শৈশব-সঙ্গীত' নামে সেগুলি একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮১ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে কবির প্রথম কাব্য-উপন্যাস 'বনফুল' ও পরে 'প্রলাপ' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। ১২৮৪ সালের কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম বৎসর থেকেই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস আদি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনায়ও প্রবৃত্ত হন। সেইসময় কবি 'কবি কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' নামে আরও দুইটি কাব্য রচনা করেন। প্রথম বর্ষের 'ভারতী'র

(১২৮৪ সাল) পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'কবি-কাহিনী'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসখানি 'কবি-কাহিনী'র পূর্বেই রচিত। কিন্তু পুস্তকাকারে এটি 'কবি-কাহিনী'র পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮২ সালে 'সন্ধ্যা সংগীত' প্রকাশিত হয়। তার পরবর্তী কাব্য 'প্রভাত সংগীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। 'সন্ধ্যা সংগীত' রচনার কাল পর্যন্ত কবিমনে একটা বিষাদের ভাব ছিল। 'প্রভাত সংগীত'-এ রবীন্দ্রনাথ সেই বিষাদের ভাবটুকু কাটিয়ে ওঠেন এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্ম বোধের আনন্দে তাঁর হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। নিজের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি 'প্রভাতে সংগীত' রচনার ফলে সচেতন হন। আসলে 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী' রচনার কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ও প্রকাশারম্ভ কাল বলে ধরা হয়। 'প্রভাত সংগীত' রচনার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ হলেও, রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র এবং বহুমুখী হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল বিশেষভাবে 'প্রভাত সংগীত' রচনার কাল থেকে। আর ঠিক সেই সময় থেকেই তাঁর প্রতিভা সাহিত্য-সৃষ্টির সমস্ত সঙ্কীর্ণ গতানুগতিক পথ ছেড়ে শতমুখে শতধারায় আনন্দের অভিমুখের অভিসারে যাত্রা করতে শুরু করে দিল। রবীন্দ্রনাথ একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যরাশি, অন্যদিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য একত্র সমাহৃত করে নিজের প্রতিভার অপূর্ব ছাঁচে ফেলে এক ললিত সুন্দরী তিলোত্তিমার সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা সুন্দরী। পূর্বের কবিরা কবিতার সৌন্দর্য দূর থেকেই শোভা দর্শন করেছেন এবং উপভোগ করেছেন, কবিতা তাদের কাছে তাই সরস্বতী। এই রূপেই তাঁরা কবিতাকে বন্দনা করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা সুন্দরী। তিনি ভাব ও সৌন্দর্যের মধ্যে একান্তভাবে প্রবেশ করে তা উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা — খেলার সঙ্গিনী, মর্মের মোহিনী প্রণয়িনী।

রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর। তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য বর্ণনাকালে কখনো ভাববিফলতা ঘটে না। সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে সত্যের ও প্রেমের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের কবি। প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার, তাই তিনি প্রকৃতির রূপমুগ্ধ প্রেমিক। উন্মাদ মধুনিশিতে আলো-ঝলমল শিশিঢালা করতে, রুদ্র ভৈরব বৈশাখে বাধাবন্ধ হারা ঝড়ের দিনে। জ্যোতির্ময়ী জ্যোৎস্না রাত্রে বালুকা-শয়নাপদ্রা নদীতে, আদি জননী সমুদ্রে, দেবাত্মা পর্বতে, প্রশান্ত প্রান্তের — সর্বত্র এবং সর্বকালে প্রকৃতির বিচিত্র এবং অপরূপ প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি। মাকে মা হলে সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলে কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করেছেন।

বিধাতার সৃষ্টি নারীকে কবি তাঁর মনের ঐশ্বর্যে নতুন করে গড়েছেন নিজস্ব ছাঁচে। তাই তাঁর কাব্যে নারী স্বপ্ন-সঙ্গিনী। মর্ম মোহিনী রূপে প্রতিভাত হয়েছে। উর্বশী, মানসী, বিজয়িনী, প্রভাবের লক্ষ্মী বিভিন্ন নামে তিনি নারীকে সংশোধন করেছেন। কবির কাব্যে পতিতাও মহীয়সী নারী হিসাবে উন্নীত হয়েছে।

সকল স্রষ্টার সৃজনী প্রতিভা যে ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করে, রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশও ঠিক সেই ভাবেই হয়েছিল। প্রথম যৌবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিভার বিকাশ-বেদনা তাঁকে আকুল করেছিল — তখন কুঁড়ির ভিতর কেঁদেছে গন্ধ আকুল হয়ে, তখন 'কস্তুরীমৃগ সম'কবি আপনগন্ধে পাগল হয়ে বনে বনে ফিরেছেন। তাই প্রথম জীবনের রচনায় এই আকুলতার বাণী, আশার বাণী, উৎকণ্ঠা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্প, ক্ষণিক নৈরাশ্যে আত্মসান্ত্বনা মহাসাগরের ডাক-বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ইত্যাদির কথা বর্ণিত আছে।

১.২.১ রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষ-পর্ব : (১২৮৮-১২৯০)

রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা সংগীত' ১২৮৮ সালে (ইংরাজি ১৮৮১) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারপর 'প্রভাত সংগীত' (১২৯০ বৈশাখ, ইংরাজি ১৮৮৩) ও 'ছবি ও গান' (১২৯০ ফাগুন, ইংরাজি ১৮৮৪) একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে ইহাদের কিছু কিছু পরিবর্তনও পরিবর্জন হয়েছে, প্রথম প্রয়াসের ত্রুটি-অপূর্ণতা কিছু কিছু সংস্কৃত ও মার্জিত হয়েছিল।

কবি নিজেই 'সন্ধ্যা সংগীত'কে তুলনা করেছেন কষাযুক্ত কচি আমের গুটির সঙ্গে, কিন্তু ইহা তাঁহার প্রথম স্বকীয় রচনা। রসাল ফলের পরিপূর্ণ মিষ্টতা ইহারই মধ্যে অজ্ঞাতসারে নিহিত ছিল। 'প্রভাত সংগীত' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই যে এতে মননের কথাও একটা অস্পষ্ট বিরাট দার্শনিক অনুভূতি প্রথম দেখা দিয়েছে আন্তরিক ভাবে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী— কবির ষোল বছর বয়সের লেখা, 'কবিকাহিনী' রচনারও আগে। এই রচনাটি কবির কিশোর বয়সের অন্যান্য কাব্য রচনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সময় কবি বিহারীলাল কিশোর কবির আদর্শ ছিলেন, তাই বিহারীলালের মতো কবি হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনের মধ্যে ছিল এবং যেন বিহারীলালের অনুকরণই দেখা যায় তাঁর কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড, শৈশব সংগীত, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি রচনাগুলিতে, বিশেষভাবে ছন্দ ও প্রকাশ ভঙ্গিতে। আবার অন্য দিকে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলিও তাঁর তরুণ চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। তাঁদের ভাষা ও ছন্দও কবির কাব্য সৃষ্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে মৈথেলীকবি বিদ্যাপতির মৈথেলী ভাষার পদ ও অন্যান্য কবিদের মৈথেলী মিশ্রিত ব্রজবলির পদ রবীন্দ্রনাথের মনে একটি বোঝা ও না বোঝা মিলিয়ে অলো-আঁধারির ভাবের রহস্য ঘনিয়ে তুলেছিল।

রুদ্রচণ্ড — 'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল' প্রকাশের পরে কবি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য ও গাথা পর পর প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে বিলাতে বসে 'ভগ্নতরী' নামে এটি গাথা রচনা করেন। সবগুলির উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনিমূলক, এবং ট্রাজেডি সমাপ্ত। ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৮৮ বাংলা সালের জৈষ্ঠ মাসে 'রুদ্রচণ্ড' নামক নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাখানি কাব্য- চতুদর্শবর্গে ৮০০ লাইনে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত দুইটি

গান রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত টালি-আকারের গ্রন্থাবলির মধ্যে ছাপা হয়েছিল। কবি তাঁর জ্যোতিদাদাকে এই নাটিকা উৎসর্গ করেছিলেন। গাথাটিতে প্রবাস যাত্রার উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয়, কবির প্রথম বিলাত যাত্রার পূর্বে এই নাটিকা রচিত হয়েছিল। ১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যখন বিলাতে যান, তখন তার বয়স সতেরো বৎসর। কবি তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে এই নাটিকার উল্লেখ করেননি।

ভগ্নহৃদয় — কবি ১৭ বৎসর বয়সে প্রথমবার বিলাতে যান। বিলাতে থাকাকালীন তিনি 'ভগ্নহৃদয়' নামে একখানি কাব্য-নাটিকা রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তা বাংলা ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকার কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়, এবং পরে ১৮৮১ খ্রি:(বাংলা ১২৮৮ সালে) পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে, প্রকাশিত হয়। এটি আর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়নি, কেবল এর কোনো কোনো অংশ স্বতন্ত্র গীতিকবিতার আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে কৈশোরক পর্যায়ে ছাপা হয়েছিল। এই নাট্যকাব্য রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল উনিশ বৎসর। কাব্যখানি ৩৪ সর্গে বিভক্ত। এই কাব্য-নাটিকার মধ্যে কবির অপরিণত বয়সের লেখাও যেমন রয়েছে, তার মধ্যে বিকাশোন্মুখ মহাপ্রতিভার পরিচয়ও পদে পদে পাওয়া যায়। নারীকে বিশিষ্ট কল্পনায় মণ্ডিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কাব্য, নাটক, উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। তার আভাস এই ভগ্ন-হৃদয়ের মধ্যে প্রথম ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর দুটি রূপ, একজনা — উর্বশী, সুন্দরী আর একজনা কল্যাণীমূর্তি। এই দুয়ের সমাহারে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য নাটকটি অপরিণত বয়সের রচনা হয়েও পরিণত বয়সের একটি বিশেষ উপলব্ধির ইঙ্গিতটুকু বহন করছে।

বনফুল — (কাব্য রচনা ১৮৭৫, গ্রন্থপ্রকাশ ১৮৮০) রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য পুস্তক 'বনফুল' ১২৮৬ সালে গুপ্তপ্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একখানি আখ্যায়িকামূলক কাব্য। এটি আট সর্গে বিভক্ত। এটি 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রথম ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু লেখা হয়েছিল আরও অনেকদিন পরে। গ্রন্থটি কবির ১৩/১৪ বৎসর বয়সে লেখা।

বালক-কবির প্রকৃতি-বর্ণনা একটি সরল স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত, স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বের প্রকাশ বহু বয়স্ক কবিরও সাধনার ও লোভের সামগ্রী বলে মনে হবে। এই অল্পবয়সের লেখার মধ্যেও কবির সহৃদয়তা ও মানব-মনের জ্ঞান ফুটে উঠেছে।

বনফুল কমলা যে বনে ললিত-পালিত সেই বন হিমালয়ের পদপ্রান্তে অবস্থিত। বালক কবি এখানে হিমালয়ের বর্ণনাও খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কমলার পিতার মৃত্যু হয় যখন তখন কমলা পিতার মৃত্যু শোকে কাতর হয় এবং বিজয়কে দেখে বিস্ময়ে কৌতূহলে প্রশ্ন করে, পরবর্তীকালে বিজয় কমলাকে নিয়ে লোকালয়ে গমন করে। কিন্তু কমলার অবস্থা তখন শকুন্তলার বনের মতো। সে শোকে বিহ্বল হয়ে হরিণ ও পক্ষীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তার আসন্ন-বিয়োগে বনভূমিও কাতর হয়। বালক কবি এই সফল বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কমলা লোকালয়ে গিয়েও পূর্বের শান্ত বনভূমিকে তুলতে পারে না কমলা পরবর্তীকালে নীরদকে ভালোবেসেছে। নীরদ বিজয়ের

বন্ধু। তাই নীরদ কমলাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, সমাজে স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে ভালোবাসতে নেই। ভালোবাসলে পাপ হয়। কিন্তু কমলার সেই জ্ঞান নেই। তাই সে তা বুঝতে পারে না। শুধু ভালোবাসার পাত্রকেই সে ভালোবাসবে। তার অসামাজিক কথা শুনে নীরদ পালিয়ে যায়।

বালক কবি সেই বয়সেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে' অনাবশ্যকরূপে জটিল করে তুলে মানুষ কত দুঃখ পায় এবং বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যেও কৃত্রিমতা থেকে যায় কখনও। এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে নরনারী যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে, তার ফল আস্বাদ করতে গিয়ে তারা যেমন করে মৃত্যু বরণ করে।

তাছাড়া কবি এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-সম্বন্ধ যে কত গভীর তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাব্যটির ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অনেক অপরিপক্কতা আছে। কবির উপর বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের রচনার প্রভাব বিদ্যামান।

কবি Wordsworth বলেছিলেন, "Child is the father of man"। এই কথার সত্যতা রবীন্দ্রনাথের এই পাঠটি পাঠ করলে বোঝা যায়।

কবি-কাহিনী — এই খণ্ড বাক্যটি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২৮৪ সালে) প্রথম পর্বের 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ মাসের সংখ্যা থেকে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে, চৈত্র সংখ্যার সমাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো বছর। ১২৮৬ সালে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে) পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় এই সংখ্যাটি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনের বিপরীত চিত্র কল্পনায় অংকন করেছেন এই 'কবি-কাহিনী'-এর মধ্যে। শিশু কবির শৈশব ক্রমে যৌবনে প্রবেশ করল। এবং প্রকৃতির সঙ্গে কবির যোগ যেন আরও ঘনিষ্ট হয়ে উঠল।

প্রকৃতির দিকে চেয়ে কবির প্রাণমন ভরে উঠত। আপন মনে অনেক কথাই চিন্তা করতেন কবি। প্রকৃতিকে তিনি এতই ভালোবেসেছিলেন যে, রাত্রির অন্ধকারে প্রলয়ের মধ্যেও কবি প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

মানুষ নিকটের জিনিসকে অবহেলা করে দূরে চলে যায়, তাতে নিকটকেও হারায়, আবার দূরকেও লাভ করতে পারে না। এই কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের কাব্য থেকে শেষ জীবনের কাব্য পর্যন্ত বলে গিয়েছেন। 'কবি-কাহিনী' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের একটি মূল সুর ধরা পড়েছে। প্রিয়কে প্রিয় বলে বুঝতে না পারা, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং পরে হাহাকার করা — এই কাব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে।

মানুষ নিকটের জিনিসকে অবহেলা করে দূরে চলে যায়, তাতে যে নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না — এই কথাটি কবি রবীন্দ্রনাথ এই বাল্য রচনার মধ্যে — প্রকাশ করেছেন।

কাব্যটির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা অনেক বলা হয়েছে সত্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরিপক্ক বয়সের লেখা বলে নিজেই বর্ণনা করেছেন।

'কবি-কাহিনী'-এর বিষয় নির্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করেছে। ইহার মধ্যে তাঁর পরিণত জীবনের আদর্শের ছায়াপাত হয়েছে। একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন।

সন্ধ্যা সংগীত — 'সন্ধ্যা সংগীত' রচনার কাল পর্যন্ত কবি তাঁর পূর্বোক্ত কবিগণের অনুকরণ করেছিলেন কাব্যের ধরনে এবং ভাবে- ভাষায়-ছন্দে। বিশেষ করে পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর। কিন্তু 'সন্ধ্যা সংগীত'-এর কবিতায় এসে তিনি প্রথম সেই অনুকরণের বন্ধন ছেদন করে নিজের ইচ্ছার অনুরূপ ছন্দ ও স্বকীয় ভাব অবলম্বন করেন।

বাংলা ১২৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়ির তেতলার ছাদের ঘরগুলিতে একাকী বাস করছিলেন, সেই সময় তিনি একটা শ্লেট নিয়ে কবিতা রচনার বাঁধা দস্তুর পরিহার করে সেচ্ছামতো কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। দুই একটা কবিতা লেখার পর তাঁর মনে অত্যন্ত আনন্দ হল, এবং তিনি নিজের প্রতিভার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করতে পারলেন। সে সময় কবির ১৯ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

বাংলা ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে বই ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু বই প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের আষাঢ় মাসে, ইংরেজি ১৮৮২ সালের ৫-ই জুলাই। পুস্তকের পরিচয়পত্রে বই ছাপা আরম্ভের তারিখই ছাপা হয়েছিল। 'সন্ধ্যা সংগীত'-এ কতক কবিতা কলকাতার বাড়িতে ও কতক কবিতা চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক বাগানবাড়িতে বসে লিখেছিলেন।

মানুষের সঙ্গে বাইরের যোগ স্থাপন করে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি। এই দুইয়ের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য কবির প্রাণ সবসময়ই কেঁদেছিল। বিশেষ করে যখন তিনি ছেলেবেলা বাড়ির ভৃত্যদের গণ্ডির মধ্যে বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়েছিল — তখন কবি তাঁর চোখের সামনে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের জগৎ খেলা পড়ে থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারছিলেন না। ফলে তাঁর হৃদয়ের অসন্তোষ ও বিষণ্ণতা তাঁর এই সময়ের কবিতাগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'সন্ধ্যা সংগীত'-এর কবিতার মধ্যে একটি বিষাদের সুর আছে। উদাহরণস্বরূপ — সন্ধ্যা, আত্মহারা, আমার নৈরাশ্য পরিত্যক্ত, দুঃখ-আবাহন, হলাহল, পরাজয়-সংগীত ইত্যাদি কবিতাগুলির ছন্দ এলোমেলো। ভাষা আর ভাবও অপরিস্ফুট, কিন্তু তার মধ্যে কবির আত্মশক্তি আবিষ্কারের ও আত্মপ্রত্যয় লাভের মূল্য অপরিসীম।

কবি তখন পর্যন্ত নিজের বক্তব্য বিষয়টির সুস্পষ্ট সন্ধান পাননি। কবি নিজেই বলেছেন যে মনুষ্য প্রকৃতিতে যা সত্য তা আবিষ্কার করে প্রকাশ করার আকৃতিই 'সন্ধ্যা সংগীত'-এর বিষণ্ণতার কারণ।

মানুষের সঙ্গে বাইরের যোগ স্থাপন করে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি। এই-দুই এর মধ্যে যোগ স্থাপন করার জন্য কবি প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি যেন সে যোগ স্থাপন করতে সমর্থ হতে পারেননি বলেই তাঁর হৃদয়ের অসন্তোষ ও বিষণ্ণতা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও পরবর্তীকালে তিনি কাঁচা হাতের লেখা বলে কাব্যটিকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন।

প্রভাত সংগীত — 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতাগুলির সূত্রপাত হয় ১২৮৮ সালে এবং পুস্তকাকারে ছাপা হয় ১৯৯০ সালে, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। ১২৮৯ সালের আশ্বিন থেকে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত 'প্রভাত সংগীত'-এর পাঁচটি কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'সন্ধ্যা সংগীত'-এ যেমন বিশ্বের সঙ্গে যোগের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি 'প্রভাত সংগীত'-এর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রভাত সংগীত'-এর তাই কবি প্রকৃতির মধ্যে ও মানব সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি খুঁজছেন। 'প্রভাত সংগীত'-এ প্রকৃতির অহ্বান প্রবল হয়ে কবির সুকোমল প্রাণকে বিহ্বল করেছে। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে কবি এক অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি লাভ করেছেন। কবি এখানে বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং মানুষে মিলে বিশ্বের সৃষ্টি সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর নিজের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন এই 'প্রভাত সংগীত'-এ। তাঁর কবিতার মধ্যে যে একটি বিশেষ বাণী আছে, বিশেষ ভঙ্গি আছে তা কবি এখন জানতে পেরেছেন। প্রভাতসঙ্গীতে কবির প্রতিভা অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল — সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় গুহা ছেড়ে তাঁর প্রতিভা আলো-বাতাসের মুক্ত জগতে বের হয়ে এল। প্রকৃতির আহ্বানে প্রথম জাগরণের উদ্দাম সাড়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ অপূর্ব ছন্দে ও গানে স্রোতস্বিনীর ন্যায় বয়ে চলেছে।

সীমাবদ্ধ কবি-মন অকস্মাৎ অসীম বিশ্বপ্রকৃতির আভাস অনুভব করে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। প্রভাত-সঙ্গীতের কবিতা সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়াছে।"

কবি শৈশবে ভৃত্য রাজতন্ত্রের খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে যে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করেছিলেন, তা একসময় বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। 'প্রভাত সংগীত'-এ এসে তা পুনঃস্থাপিত হল।

'প্রভাত-সংগীত'-এ যে ভাবমুর্তির আনন্দ বিঘোষিত তা শুধু কবি কল্পনার বিষয় নয়, কবির আত্মজীবনীর তথ্যভিত্তিক। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি রবীন্দ্র কাব্যজীবনে একটি মহাপরিবর্তনের রূপক রাগিনী-রূপে স্বীকৃত হয়েছে — সেখানেই তাঁর প্রকৃত কবিচেতনার উন্মেষ। কবি প্রতিভারই আত্মজীবনচরিত, ইহা কবিপ্রতিভাই বা জাগরণ।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে বিশেষত্ব পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই সর্বকালীন ভাবগতি ও বিশ্বানুভূতি এই কবিতার মধ্যে প্রথম উন্মেষ লাভ করেছিল। অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সাধনা — বিশ্ববোধ ও বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করাই কবিচিত্তের বিশেষত্ব। এই কাব্যের অন্য কবিতায় তা ফুটে উঠেছে। 'প্রভাত সংগীত' পর্য্যায়ে কবির

একটি পর্ব শেষ হল। তারপর যে আর একটি নতুন পর্ব আরম্ভ হল, তার বিশেষত্ব হচ্ছে চোখে দেখা ও মনে ভাবা সমস্ত ব্যাপারের ছবি এঁকে যাওয়া। চোখে দেখা বস্তুর যে ছবি কথা দিয়ে আঁকা হয়, তাকেও ছবি বলতে হয় আর মনের ভাবনার যে ছবি কথায় পরিব্যক্ত হয়, তাকে গান বলা হয়। কবি তাঁর চাক্ষুষ ও মানস ছবির বইয়ের নাম রাখা হয় 'ছবি ও গান'। এই কাব্যরচনার কাল পর্যন্ত কবির সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় শুধু বাইরের কবি প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যের মাধুর্যে বিভোর। এই বইয়ের সব কবিতাই কবির ২২ বৎসরের বয়সের লেখা। ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবির বিবাহ হয়। ছবি ও গান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এ বৎসরের ফাগুন মাসে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কবির বিয়ের তিন মাস পরে। এর রচনার সূত্রপাত হয় কারোয়ারে (বম্বে প্রেসিডেন্সিতে) আশ্বিন মাস থেকে।

'ছবি ও গান'-এ কবির মধুর অবেশময়তা ক্রমশ একটা স্থির রূপের দিকে অগ্রসর হয়েছে। লেখকের ঝোঁক ছবি আকার দিকেই বেশি, গানের সুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতোই কাব্যশাসন না মেনে নিজ খুশি খেয়ালমতো আসা যাওয়া করছে।

ছবি ও গানের পূর্ববর্তী রচনায় কবির মন আত্মকেন্দ্রিক — 'ছবি ও গান'-এর সময় হতে মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানালা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড জলছবির মতো দেখা দিতে লাগল।

এই পর্যায়ে এসে অশরীরী, কল্পনাত ছায়ামূর্তির পরিবর্তে জীবন্ত নর-নারীর প্রতি কবি কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে রক্তমাংস সমন্বিত ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা এক প্রকারের ক্ষীণ ভাবপ্রতিচ্ছবিই প্রকটতর হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী পথ-চলা বালিকা, পূর্বদিগন্তে উদীয়মান সূর্যের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি ধ্যানমগ্ন যোগী, পোড়োবাড়ির 'করুণ মানবিক স্মৃতি' একটি অভিমানিনী মেয়ে ভাবের কুহেলিকার আভার থেকে কবির মনে শিথিল রেখাপাত করেছে। পাগল ও মাতাল দুই জাতীয় আত্মভোলা, ভাবমত্ত মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে কবির সমবেদনা জাগিয়েছে, তারা যে মধ্যাহ্নের নিঃসঙ্গতা ও সন্ধ্যার গোধূলিরচ্ছায়ার মানব-প্রতিচ্ছবি নিসর্গ-কবিতাও ধীরে ধীরে ভাবরূপে সুস্পষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

কড়ি ও কোমল — ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর পূর্ববর্তী কাব্য কবিত্বের জলাভূমি বলে রবীন্দ্রনাথ সেগুলো একরকম পরিত্যাগ করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় কবি মন্তব্য করেছেন — "কড়ি ও কোমল"-এ অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থাপনে ডাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

কবির এই উক্তির যথার্থতা আছে, কারণ 'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা কবির কাছে ধরা দেয়নি — 'সন্ধ্যা সংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' তারপর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পর্যন্ত তাঁর কাব্যের তুলনা করলে 'কড়ি ও কোমল'কে অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা বলা চলে। 'জীবনস্মৃতি'তে এই কাব্য সম্পর্কে কবির উক্তি — "আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" তাই তো কবি বিশ্বজীবনের কাছে

আবেদন জানিয়েছেন—

"মরিতে চাহি আমি সুন্দর ভবনে

মানবের মাসে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এই প্রথম কাব্য যেখানে কবির অনির্দেশ সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা কিছুটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হয়েছে। এটাই তার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন যে, সৌন্দর্যের স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের পথে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তববিমুখিতা ও কল্পলোকগামিতা — এই দুই বিরুদ্ধ প্রবর্তনার বিরোধ এখান থেকেই শুরু হয়েছে। এই উভয়ের দ্বন্দ্বই রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কড়ি ও কোমল'-এর পর থেকেই আমার কাজ রচনা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার প্রথম পরিণত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', ও 'চিত্রা' কাব্য চতুষ্টয়ে। 'কড়ি ও কোমল'-এর রবীন্দ্র প্রতিভা সর্বপ্রথম একটি সুসংহত, সুবিন্যস্ত রূপ গ্রহণ করেছে। কবিচিত্তের বিভিন্ন ভাব-মননের মধ্যে একটি সমীকরণ প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হতে চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবির মনে গাঢ় ছায়া ফেলে, নানা করুণ ও বিষাদময় চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে তাঁর কাব্যানুভূতিকে অধিকতর শক্তিশালী ও সমন্বয়ী করে তুলেছিল। জীবনের এই অন্তিম ও অন্তহীন রহস্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির স্বপ্নাবিষ্ট ভাববিলাস অন্তর্মুখী হয়েছিল।

এই কাব্যটিতে গীতিকবিতার প্রথম সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু কবিতায়, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভাবিত রাধা-বিরহ স্মৃতিবাহী ভাবাসঙ্গের সঙ্গে কবিহৃদয়ের অনির্দেশ্য প্রণয়াকুতি এক মিশ্র সুর তুলেছে।

১.২.২ রবীন্দ্র-কাব্যের ঐশ্বর্য-পর্ব

রবীন্দ্রনাথের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে লেখা এই পর্বটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় বলে অভিহিত করা যায়। প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির অনেকগুলিই এই পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬) ও চৈতালী (১৮৯৬) এই চারখানি কাব্যের মধ্যে কবিচেতনার এক অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু কাব্যসৃষ্টির মৌলিকতা, শিল্পকলা এবং চৈতন্যের গভীর উপলব্ধি বিচার করে দেখা যায় যে, এই পর্বের ছয় বছরের মধ্যে লেখা উক্ত কাব্যগুলির একটা আলাদা মাত্রা আছে বলে বোধ হয়।

'মানসী' কাব্যের মধ্যে দ্বিধা, সংশয় ও অশান্তি রয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতি এই দুটির সুরের মধ্যেই সংশয় রয়েছে। কবি প্রথমে প্রেমকে দেহ চেতনার অঙ্গীভূত করে দেখেছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মনে মানসিক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বাসনার উত্তাপে প্রেমকে

লাভ করা যায় না। তা কবি প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেননি। "নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে" তাই 'মানসী' কাব্যে কবি শেষ পর্যন্ত মর্ত্যকেন্দ্রিক বাসনাবদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে 'অনাদি কালের হৃদয় উৎস' থেকে প্রবাহিত 'যুগল প্রেমের স্রোত' ভেসে গেছেন এবং "আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।" — এই কথা বলে দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের জগৎ থেকে বিদায় চেয়েছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের মিল ঘটাতে পারেননি কবি। তাই পোষমানা প্রাণের দাসত্বগিরি ত্যাগ করে বন্য-বর্বর জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছেন। কখনও প্রকৃতির মধ্যে দ্বৈতসত্ত্বা লক্ষ করেছেন। কখনও বীভৎস মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পরম ঐক্যকে তিনি অবিষ্কার করেছেন কখনও, কখনও আবার বাঙালি জীবনকে কটাক্ষ করেছেন। কবি এই কাব্যে যেন কিছু একটা মেলাতে পারছেন না। এই বোধ হয়।

'সোনার তরী' কাব্যটি কবির জীবনের একটি উৎকৃষ্ট রচনা এবং তা রবীন্দ্রজীবনের প্রতীক বলা যেতে পারে। এই কাব্য নিসর্গের অপূর্ব মাধুরী কবির ব্যক্তিমানসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবি জাতিস্মর হয়ে অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে নিজ জীবন-প্রবাহকে অঙ্গীভূত করে উপলব্ধি করেছেন। প্রেমকে তিনি মানবিক প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'সোনার তরী'তেও কবির সঙ্গে মানসসুন্দরীর পরিপূর্ণ মিলন হয়নি। এই কাব্যের প্রথম কবিতাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। কবি জীবনের উপকূলে বলে যত সোনার ধান সঞ্চয় করেছিলেন। 'সোনার তরী'-এর নাবিক এলে সে সমস্ত তুলে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু কবি সেই তরীতে স্থান পেলেন না। এর গূঢ় অর্থ এই সে মানুষ সমস্ত জীবনের ফসল অর্থাৎ যা কিছু মূল্যবান তা সংসারকে দান করে, মানুষ তা গ্রহণ করে কিন্তু মানুষকে নয়। পরবর্তী সময় কবি শেষ কবিতাটিতে নিরুদ্দেশময় নৌকায় স্থান পেয়েছেন। কাব্যটিতে কবির অন্তর্জীবনের আর বহির্জীবনে মিলন ঘটেছে।

১৮৯৬ সালে 'চিত্রা' কাব্য প্রকাশিত হয়। কাব্যটি তাঁর পরিণত মনের কাব্য। বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা লাভ করতেও সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ঠ কবিতা এই কাব্য বর্তমান। এই কাব্যে মানসসুন্দরীও জীবনদেবতার তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে সমন্বয় লাভ করেছে। এই কাব্যের চিত্রা, জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, সিন্ধুপারে — কবিতাগুলি কবির জীবনদেবতা বিষয়ক কাব্যগুলোর প্রথম সংস্করণ বলা যেতে পারে। আর তখনই কবি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। ছোটো সত্তার সঙ্গে বড়ো সত্তার মিলনলীলা। ছোটো আমির সঙ্গে বড়ো আমির এক মিলন পর্ব। কবি সবসময়ই উল্লেখ করেছেন যে, এক অদৃশ্যসত্তা তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাঁকে কবি কখনও বলেছেন মানসসুন্দরী কখনও বলেছেন লীলাসঙ্গিনী, আবার কখনও বলেছেন জীবনদেবতা। এই তত্ত্বটিই পরবর্তী কাব্যগুলিতে কখনও আত্মনিবেদন রূপে, কখনও বা প্রেমসৌন্দর্যের রক্তরাগে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই জীবনদেবতাই কবির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি।

সৌন্দর্যের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাকাব্যে বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের গুণগান

করেছেন। তিনি অন্তর-বাসিনী সৌন্দর্যদেবীর প্রতিমূর্তি চাঞ্চল্যময় জগতে উপলব্ধি করেছেন। সৌন্দর্যকে তিনি প্রথমে বাইরে দেখেছেন, অন্তরে অনুভব করেছেন এবং পরে তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। বৈপরীত্য, বৈশাদৃশ্য, অনৈক্যের মধ্যেও কবি এক ঐক্যর সুরকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই শিল্প, সৌন্দর্য, তত্ত্ব সব কিছু বিচার করলে 'চিত্রা' কাব্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যায়।

'চিত্রা' কাব্যের পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি' — এই কাব্যেই ঐশ্বর্য পর্বের পরিসমাপ্তি। কবিতাগুলির অধিকাংশই শিলাইদহে ও পতিসরে বোটে বাস করার সময় লেখা। কবিতাগুলির অধিকাংশই সনেট।

কবির বাল্যজীবন অবরোধের মধ্যে কেটেছিল বলে কবির মনে সবসময়ই আগ্রহ ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার। এর আগের কবিতাগুলিতে কবি প্রকৃতিকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ ছাড়া প্রকৃতি নিরর্থক। সেই ভাবনারই ইতিবাচক পরিণতি দেখা গেল 'চৈতালি' কাব্যে। তিনি অনুভব করলেন যে, প্রকৃতি আর মানুষ কেই কাউকে ছেড়ে সম্পূর্ণ নয়, প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলেই বিশ্বের সৃষ্টি সৌন্দর্য সম্পূর্ণ করে।

চৈতালির অনেকগুলি কবিতাতেই কবি মানষ্যত্বের চিত্র অংকন করেছেন। কবি অতি সামান্য ও দরিদ্র নরনারীর জীবনযাত্রা প্রতি তাঁর মমতা প্রকাশ করেছেন, এবং তাদের সে সুখ-দুঃখ কর্তব্যনিষ্ঠা ও মহত্ব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তার ছোটো ছোটো চিত্র অংকন করেছেন। চৈতালির বহু কবিতায় পল্লীগ্রামের সরল অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রাম্য নরনারীর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন সে কলকারখানারময়, নগরের অস্বাভাবিক কৃত্রিম জীবন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তার ইঙ্গিত আছে — প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েই একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে। কবি প্রাচীন ভারত ও আধুনিক সভ্যতার চিত্রও পাশাপাশি অংকন করেছেন। মোটকথা, কবি প্রকৃতি, মানুষ সবকিছুকেই সমান ভাবে দেখেছেন ও ভালোবেসেছেন।

১.২.৩ 'নৈবেদ্য' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে ভাববস্তুর অগ্রসরের পথরেখা

কবিজীবনের প্রথমার্ধে তাঁর কবি-প্রতিভা রূপজগৎ ও মানবজীবনের ধ্যান করেছে কিন্তু 'নৈবদ্য' (১৩০৪-১৩০৭) থেকে জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেন পাল্টে গিয়েছিল। এই সময় থেকে কবির কাব্যে যে জীবন-দর্শনের পরিচয় নেওয়া যায় তা আধ্যাত্মিক-জাতীয়। রাপ নয়, অরূপের প্রতি কবির প্রাণগত আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল এবং সে সময় থেকেই সেই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছিল। কবির কাব্যে এই সময়ে একটা ধর্মভাব, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম নয়, একটা সর্বজনীন ধর্মচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সীমার মধ্য থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন লক্ষ

করা যায়। সীমার মধ্য থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন সাধনের যে পালা, যা রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ পালা, তা এই সময়কার কাব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই সময়কার কবিতার মর্ম কথাই হল 'সীমার মাঝে অসীমের সুর' — ধ্বনিত করে তোলা — বিশ্বদেবতার সঙ্গে জীবন-দেবতার ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপন করা।

'নৈবেদ্য' কাব্যটি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যে শুধু ধর্ম-চেতনাই নয় — কবির সমাজচেতনা ও স্বদেশ-চেতনারও পরিচয় রয়েছে। এই স্বদেশ-চেতনার সঙ্গে কল্পনা-প্রিয়তার দ্বন্দ্ব — রোমান্টিক কবিদের 'রিয়্যাল' ও 'আইডিয়াল' এর চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে — কবি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য পরমপুরুষ বিশ্বদেবতার ধ্যান করেছেন এবং আপন অন্তরের আধ্যাত্মিক উৎসটা তাঁরই চরণে সমর্পন করেছেন। নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য ও গীতালিকাব্য বিশ্বদেবতার চরণে কবির ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। ভক্তিভাব ও কবির কাব্যিক চেতনা দুই-এ মিলে তাঁর এই পর্যায়ের কাব্যগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রতিভার দ্বারা কবি ধর্ম ও কাব্যের বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন। তাই তিনি রোমান্টিক কবি হয়েও আধ্যাত্মিক হতে পেরেছেন।

এই কাব্যের পর্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আলোচনা করলে দেখা যায় — বিজ্ঞানীবন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে কবি লিখেছিলেন— "নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মতো দেখি না। লোকে যা বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন — আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।"

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিত কাব্য 'নৈবেদ্য' যে বিশ্বদেবতা সার্থক করে তুলেছেন — বিশ্বকবি অভিধা লাভ করার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জগৎপিতার আগে তিনি তাঁর পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। বিশেষ করে ব্রহ্মসঙ্গীত অপেক্ষাও 'নৈবেদ্য'-এর কবিতার উৎকর্ষ আরও বেশি।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের পরিচয় আছে। আসলে সংসারের সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অবহেলা করে বৈরাগ্য সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ কিংবা স্বর্গের আনন্দলাভ কবির কাম্য ছিল না, সংসারকে বিশ্বাস করে এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করে যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। আবার শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্য দিয়েই নয়, সুখ দুঃখ ভালোমন্দ আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়েও তিনি মানুষকে মুক্তির পথ দেখান।

'নৈবেদ্য' -এর সব কবিতাই প্রার্থনা। স্বদেশ এবং স্বদেশ মহিমা সম্বন্ধে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে কয়েকটি কবিতায়। সবকয়টি একটা মহান অধ্যাত্ম আদর্শে বাঁধা, কিন্তু একটি কবিতা তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়, বহুজন বন্দিত।

"চিত্ত যথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির

জ্ঞান যথামুক্ত, সেথা গৃহের প্রাচীর।"

তারপর কবি যে কাব্য লিখলেন তার নাম 'স্মরণ' (১৩০৯), 'স্মরণ' গ্রন্থের কবিতাগুলি অত্যন্ত শান্ত, সংযত ও সংক্ষিপ্ত। শোকের উচ্ছ্বাস কোথাও নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল একচল্লিশ। কবির স্পর্শকাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু খুব গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত, একান্ত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। মৃত্যুর আগমন সম্পর্কে কবি পূর্বেই যেন আভাস পেয়েছিলেন 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে, কবিতাগুলো পড়লেই তা মনে হয়। কিন্তু কবি কোনোদিনও মৃত্যু নিয়ে বেশি বিচলিত হননি। তিনি নৈবেদ্যর সাধনার মধ্য দিয়ে বহুদিন কটিয়েছিলেন। তাই শান্ত সংযম ভাব তাঁর সমগ্র জীবনকে অধিকার করে রেখেছিল। শোক গ্রহণ করার মতো শক্তিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তাই অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ দূর হয়ে নতুন রূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৩১০ -এ 'শিশু' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবির স্ত্রীর মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ কন্যা মীরার বয়স দশ ও পুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স ছিল আট। মাতৃহারা পুত্র-কন্যার পিতা ও মাতা একসঙ্গে দুই-এর ভূমিকাই তাঁকে পালন করতে হয়েছিল। বিচ্ছেদের মধ্যেও কবি পরম সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন তাদের সান্নিধ্যে। পুত্র শমীন্দ্র যখন রোগশয্যায় তখন পুত্রবৎসল পিতা তাঁকে কবিতা রচনা করে শোনাতেন। এই সময় এই কাব্যের সৃষ্টি। শিশুকে তিনি দেখেছেন বিশ্বজীবনের একটি খণ্ড অংশ রূপে। 'শিশু'র কবিতা, শুধু শিশুর দুঃখের কথা নয়, মনের ও কথা নয়, শিশুকে আশ্রয় করে যে বাৎসল্য রস ফুটে উঠেছে তার কথাই বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

'উৎসর্গ' প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে, কবিতাগুলির মধ্যে ভাবপ্রসঙ্গের যোগাযোগ নেই, যদিও এর মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা শুধু কাব্য হিসাবে মূল্যবান নয়, রবীন্দ্র কবিজীবনের মর্মবাণী তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

'খেয়া' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে। কবিতাগুলো লেখা আরম্ভ হয়েছিল ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসেই। তার মধ্যে কিছু সময় কবি স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। শুরু হয়েছিল তাঁর অন্তর-জগতে এক নতুন জীবন-যাত্রা সূচনার পূর্ব-মুহূর্ত। বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিকে বাংলা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জেগেছিল। বাঙালির মনে তখন প্রবল ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা রবীন্দ্রনাথের লেখায়, গানে প্রকাশিত হয়েছিল। 'এবার তোর মরা গাঙে', 'বাংলার মাটি, বাংলারজন্ম' ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে একই সময়ের মধ্যে কবি প্রিয়জনদের হারিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক্ষভাবে বেদনার চিহ্ন নেই, কিন্তু অন্তর-জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে তাঁর। 'খেয়া' কাব্যের প্রত্যেক কবিতাই একটু বিষাদ-হতাশে ভারাক্রান্ত।

এ বিষাদ ব্যর্থতাজনিত নয়। হতাশা বঞ্চনাজনিত নয়। কবি তখন ভাবছিলেন যে, কর্ম-জীবনের চঞ্চতলতা, উন্মাদনা, বিক্ষোভ এই সমস্তের মধ্যে কোনো তৃপ্তি নেই, অথচ জীবন একদিন শেষ হয়ে যায়; প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় জীবন, এই কর্মময় জীবনের তট থেকে খেয়া পার হয়ে অধ্যাত্মজীবনের তটে না পৌঁছলে জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। 'খেয়া'র কবিতায় যে বিষাদ হতাশা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা লক্ষ্য করে কবির রচনা—

"ঘরেও নহে, পারেও নহে,
যেজন আছে মাঝখানে।
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

'আগমন' কবিতায় —

"ওরে দুয়ার খুলে দেরে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।"

এইভাবে আরও অনেকগুলি কবিতা লিখিছিলেন কবি এই কাব্যে। তার পরবর্তী কাব্য রচনায় কবি শুধু ভাবের জগতই নয়, রূপের জগতেও নবজন্ম লাভ করলেন। সোনার তরী - চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকা-এর কবি মানব ও প্রকৃতির কবি, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালি-তে অনাস্বাদিত পূর্ব অধ্যাত্মজীবনে দ্বিজত্ব লাভ করলেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যর প্রত্যেকটি গানও তাদের সুরে রস-স্বরূপকে পাওয়ার জন্য অন্তরের যে আকুলতা এবং তার আস্তিত্বকে অনুভব করার যে তীব্র আবেগ এবং নিজের সব অহংকার চূর্ণ করে জীবন-কুসুম দেবতার চরণে উৎসর্গ করার যে আপ্রাণ চেষ্টা তা ফুটে উঠেছে।

গীতাঞ্জলি-গীতামাল্য-গীতালি সম্বন্ধে একটি কথাই মনে রাখা প্রয়োজন। এই গ্রন্থকয়টির প্রায় সব কবিতাই গান। কথাও আছে। তাই কথা ও সুর মিলে সৃষ্টি করেছে এই গ্রন্থকয়টির কাব্যজগৎ। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য কবি চিত্তের বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না পাওয়ার দুঃখ ফুটে উঠেছে। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশের মধ্যে কবি নানাভাবে দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন, নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি হলেন মূলত কবি, তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা এবং উপলব্ধি রূপ ও রস সাধনাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেনি, বরং তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল।

কবি তাঁকে পেতে চাইছেন, কিন্তু কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হয়নি; সত্যকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি তখনও হয়নি; সেজন্যই একটা ব্যথা ও বেদনার সুর 'গীতাঞ্জলি'র

অনেকগানেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। দুঃখ-আঘাত-বিপদের ভিতর দিয়ে যে সাধনা সে সাধনাকে কবি স্বীকার করেছেন। এবং সে সাধনার ভিতর দিয়ে, তা উত্তীর্ণ হয়ে দেবতার স্পর্শ তিন চেয়েছেন। নিজের অহংকারকে চূর্ণ করার যে সাধনা সে সাধনাও তিনি স্বীকার করেছেন। অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত গানগুলিতে বেশি করে লক্ষণীয়। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অধিকাংশ গানে রসের কথা অপেক্ষা সাধনার কথা বড়, আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক। উক্ত কাব্যের রচনার জন্যই কবি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই অনেক প্রশংসা লাভ করেছিল। বিখ্যাত গানগুলি এই গীতাঞ্জলি কাব্যর অন্তর্গত। যেমন —

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

অপর একটি গান —

"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি ..."

গীতামাল্য কাব্যও অনুরূপ। কবি এই কাব্যের মধ্যেও অধ্যাত্ম-জগতের মধ্যেই বিচরণ করেছেন। কিন্তু কবি যেন 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' কাব্যদ্বয়ে সুপরিচিত অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রকাশের ধারাটা কাটিয়ে উঠেছেন। অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাও তাঁর ইতিমধ্যে গভীরতর হয়েছে। নিসর্গানুভূতি তাঁর গভীরতর হয়ে উঠেছিল, অধ্যাত্মভূতির যা কিছু প্রকাশ তাও আশ্রয় করেছে এই নিসর্গানুভূতিকে। গীতিমাল্য ও গীতালি-তে অধ্যাত্মনুভূতি সহজতর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছোটোবেলা থেকেই উপনিষদের আবহাওয়া বড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্ব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অধ্যাত্মরসকে অনুপ্রাণিত করেনি; 'গীতাঞ্জলি'তে যে ভক্ত কবি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় দেবতাকে চেয়েও ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, 'গীতিমাল্য' গ্রন্থে সেই উক্ত কবি দেবতাকে বন্ধু মেনে নিয়ে, তাঁর দুই হাত ধরলেন। কবি গীতিমাল্য-তে গাইলেন —

"প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে,
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে —"

আরও একটি গান,—

"তোমারি নাম বলবো নানা বলে
বলবো একা বসে আপন
মনের ছায়াতলে।"

গ্রন্থটির প্রায় সব কটি গানেই একটা শান্তি ও সার্থকতার সুর ধ্বনিত হয়। দেবতার

সঙ্গে বিচিত্র লীলা। বিচিত্র গভীর, রহস্য নিসর্গ-সৌন্দর্যদ্বারা মণ্ডিত।

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো

তোমায় করিগো নমস্কার।"

কবির উপলব্ধি এখানে গভীর ও পরিপূর্ণ।

'গীতালি'র সব কয়টি গানই (১৮৮) ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে ৩ রা কার্তিকের মধ্যে রচিত। এই গ্রন্থের সব গানেই একটা শান্তি ও সার্থকতার সুর ধ্বনিত; দেবতার সঙ্গে বিচিত্র লীলা, দুঃখের কথা কবি একেবারে ভুলতে চেয়েছেন এই পর্যায়ে এসে। কবি তাঁর মনের নিভৃতে, নিদ্রিত প্রিয়তমকে প্রেমের আকর্ষণে জাগ্রত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে

একেলা রয়েছে নীরব শয়ন' পরে -

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।"

এখানে এসে কবির উপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করল ও সাধনা সার্থকতা লাভ করল।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-র পরিসমাপ্তির পর কবি 'বলাকার'র যাত্রা করলেন।

মানুষ সারাজীবন সুখ, দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, মিলন-বিষাদের ভিতর দিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। চরম শান্তি লাভ করতে পারলে অবশেষে ভগবানকে আশ্রয় করে তাঁর চরণে নিজকে আত্মসমর্পণ করে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করেই ক্ষান্ত রইলেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথ চিরচঞ্চল। তিনি নিজেই বলেছেন— "আমি চঞ্চলহে, আমি সুদূরের পিয়াসী' সুতরাং কবি তাঁর চিরপথিক কবিচিত্ত কোনও নির্দিষ্ট ভাব ক্ষেত্র হতে অনেকদিন রস আহরণ করে নিজেকে সতেজ রাখতে পারেননি, কেবল অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে নতুন নতুন রসাস্বাদ করার আকুল প্রেরণা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। অধ্যাত্ম রসবোধ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির একটা স্বচ্ছ সহজ আনন্দ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেই স্থির শান্ত বিহীন আনন্দ ক্ষেত্র তাঁকে শেষ পর্যন্ত বেঁধে রাখতে পারল না। 'গীতিমাল্য'-এর শেষের দিকে এবং 'গীতালি'তে আধ্যাত্মিক রসানুভূতিকেও ছেড়ে মাঝে মাঝে স্বপ্রকাশ ঘটেছে মানবপ্রীতি ও নিসর্গ-সৌন্দর্য-প্রেরণা। 'গীতালি'র শেষের দিকে পথের আহ্বান আবার তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে। 'বলাকা'য় নতুন করে ফিরে পাওয়া নিসর্গ সৌন্দর্যবোধ এবং পুরাতন ধরণীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে যৌবনের উৎসবে ধীরে ধীরে পুনরাহ্বান করার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল।

'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-র রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক — শুধুমাত্র ভাবের ক্ষেত্রেই পৃথক নন, কলাকৌশলেও পৃথক। বলাকা-র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী। যৌবন যে পুনরায় ফিরে এল, কবি

তা নিজেই স্বীকার করেছেন।

"বহু দিনকার

ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার

সহসা কী মনে করে

পত্র তার পাঠায়েছে মোরে

উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে

অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।"

'বলাকা'র প্রায় সব কবিতাতেই প্রেম, যৌবন, সৌন্দর্য অথবা জীবনগতিবেগের জয়গানের অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গির আড়ালে সেই সকল তত্ত্ব ও সত্য, চিন্তা ও কল্পনা অতি নিপুণভাবে আপন অস্তিত্ব জানিয়েছে। কবিতাগুলিতে একটা intellectual appeal আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'নৈবেদ্য'র জগৎ থেকে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-র জগৎ অতিক্রম করে বলাকা-য় পৌঁছানোর সময়সীমায় অনেক ভাবধারার পরিবর্তন ঘটেছে এবং কবি পুনরায় গতির জগতে ফিরে এসেছেন।

১.২.৪ রবীন্দ্র-কাব্যের অন্ত্যপর্ব

১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বারো বৎসরে কবির বারোখানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও কবি তখন বার্ধক্যের চাপে পড়ে শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল করেছেন, কিন্তু কবিগুরুর মন-প্রাণ তখন উজ্জ্বল সজীব হয়েছিল। তিনি পরবর্তীকালের এই কাব্যগুলির মধ্যেও অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবি তাঁর পরিচিত পথ পরিবর্তন করে অন্য গতি পথে যাত্রা করেলেন এই পর্বে। ১৯৩২- এ প্রকাশিত 'পুনশ্চ' থেকে তাঁর নতুন কাব্য- প্রতীতির যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' (১৯৩২-১৯৩৬) চার বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রা' (১৯৩৩), 'শেষসপ্তক' (১৯৩৫), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬) — অন্ত্যপর্বের প্রথম দিকের এই কয়খানি কাব্যকে 'পুনশ্চ'-বর্গের কাব্য বলা যায়। 'বলাকা' কাব্যে প্রবহমান পয়ার ছন্দে যে সাফল্য দেখা দিয়েছিল 'পুনশ্চ' বর্গের কাব্যগুলিতে তারই চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। 'পুনশ্চ' কাব্য থেকেই গদ্য-কবিতার সূচনা হয়েছিল। 'শ্যামলী' কাব্য পর্যন্ত সেই ধারাই অব্যাহত রয়েছিল। আবার 'লিপিকা'য় তিনি গদ্যের অনুচ্ছেদবন্ধনে গদ্য-কবিতার স্বাদ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'পুনশ্চ'র প্রথম কবিতা 'কোপাই' নদীর ভাষার মধ্যে কবি তাঁর নতুন রীতির প্রতীক আবিষ্কার করেছেন।

'পুনশ্চ'- 'শেষসপ্তক'- 'পটপুট'-'শ্যামলী' এই চারটি গ্রন্থ রীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'ঋতু'রও পরিবর্তন ঘটেছে। 'শেষসপ্তক'-এর অনেকগুলি কবিতাই কবির ব্যক্তি-

জীবনের নিবিড় ও নিগূঢ় পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত, বিশেষত শেষ দিকের কবিতাগুলি। বিশেষত, রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রমানসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে হলে তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি লক্ষ করতে হবে। বিশেষভাবে 'শেষসপ্তক' ও 'পত্রপুট' থেকে আরম্ভ করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত।

'শ্যামলী'র অনেকগুলি কবিতাই লিরিকজাতীয়, এবং সেগুলিতে মানবজীবনের ছোটো ছোটো ছবি, জীবনের ছিন্নপত্র, বিস্মৃতির ছাওয়ায় উড়ে যেতে যেতে যেন কবি কল্পনায় বাঁধা পড়েছেন। পরিশেষ-পুনশ্চ-শ্যামলী-র অনেক কবিতাই পুরাতনস্মৃতিবহ। আর এই স্মৃতি রোমন্থনকে আশ্রয় করেই কবিচিত্তে নেমে এসেছিল এক গভীর প্রশান্তি, স্তব্ধ-গাম্ভীর্য যার আভাস 'বীথিকা'তেও সুস্পষ্ট ও গভীর। 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলি একই রীতিতে লেখা যদিও একেবারে অন্য জাতের কবিতা। জীবনের অনুভূতির কথা এখানে ততটা নেই। কবির অন্ত্যপর্বের কাব্যগুলির পরবর্তী পর্যায় হল — 'প্রান্তিক' (১৩৪৪), 'সেঁজুতি' (১৩৪৫), 'প্রহাসিনী' (১৪৪৫) 'আকাশ-প্রদীপ' (১৩৪৬), 'নবজাতক' (১৩৪৭), 'সানাই' (১৩৪৭), 'প্রান্তিক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ পৌষ মাসে। ওই বৎসরই ভাদ্র মাস কাটে তাঁর নিদারুণ রোগে। এই রোগে কবিকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আশ্বিনের গোড়ায় কবির চেতনা 'লুপ্তিগুহা' থেকে মুক্তি লাভ করল। "প্রান্তিকে'র ১৮টি কবিতা আশ্বিন থেকে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। তার মধ্যে ষোলটি কবিতারই মৃত্যু এবং মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে। 'প্রান্তিক' নামটি অর্থবহ। কবির জীবনে মৃত্যুদূত একদিন চুপে চুপে এসে দেখা দিল — "বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে।" শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-অন্ধকারকে অতিক্রম করল আলোকের খর- প্রবাহ, জয় হল শুভ্র চৈতন্যময় জ্যোতির। চেতন-অবচেতনর প্রান্ত দেশে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাও অবশেষে ঘুচে গেল।

'আকাশ প্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১৩৪৬-এর বৈশাখে। কবিতাগুলি ১৩৪৫-এর কার্তিক থেকে চৈত্রমাসের মধ্যে লেখা। কবিতাগুলির মধ্যে কবিমনের শঙ্কা বর্তমান, কারণ কবির মনে হয়েছিল কবিতাগুলির বিষয়ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো নতুন- কালের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু তা শুধু কবির ধারণা মাত্র। কবিতাগুলি ছিল অনেক স্মৃতিবহ। তাই কবিতাগুলি এক বিশেষ ধরনের অর্থ বহন করেছে। 'সেজুঁতি' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫-এর ভাদ্রমাসে। কাব্যটির নামকরণ অর্থবহ। এর অধিকাংশ কবিতাই সাঁজের বাতি। সন্ধ্যা বাতি জ্বালিয়ে জীবন-দিবার হিসাব-নিকাশ, মৃত্যু-রাত্রির প্রতীক্ষা। কতগুলি কবিতা একান্তভাবে ব্যক্তিগত জীবনকেই আশ্রয় করে লেখা। আত্মভাবনাই তার প্রধান অবলম্বন। 'জন্মদিন', 'পত্রোত্তর' 'প্রতীক্ষা', 'পরিচয়' ইত্যাদি কবিতা কবি স্পষ্টতই সাঁজের বাতি জ্বালিয়ে বিগত জীবনের এবং অগ্রসরমান মৃত্যুর পরিচয় নিয়েছেন। 'প্রহাসিনী' একেবারে অন্যজাতের অন্য-সুরের কবিতা। হাস্যে, পরিহাসে, প্রলাপে, কৌতুকে, ব্যঙ্গ-কটাক্ষে কবিতাগুলি যেন ধূমকেতুর পুচ্ছ ঝাঁটার এক একটি শলাকা। প্রকাশ-কাল ১৯৪৪-এর পৌষ মাস। 'নবজাতক' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪৭-এর বৈশাখে। কাব্যটিতে নতুনের চেতনা যেমন — নতুন সমাজচেতনা, বৃহত্তর জন-মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস-চেতনা

এবং সেই চেতনার সাহায্যে কাব্যে বস্তুর বাস্তব অনুভূতির সকার।

তারপর প্রকাশিত 'সানাই' কাব্য। এটি সার্থক কাব্য। গীতিকাব্য হিসাবে তা মধুর। সুরে ও গীতময়তায় শ্রেষ্ঠ, ভাবমাধুর্যে ও কল্পনায়, পুরাতন মধুর প্রেমের নতুন আস্বাদনে, নিসর্গের ক্লান্ত মধুর রূপের, সুকুমার সম্ভোগে।

অন্ত্যপর্বের শেষের ভাগে আগে — রোগশয্যায় (১৩৪৭), আরোগ্য (১৩৪৭), জন্মদিনে (১৩৪৮) শেষলেখা (১৩৪৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের বর্তমান বিভাগে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাস। এই বিভাগে রবীন্দ্র-কাব্যধারার সাধারণ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর রবীন্দ্র-কাব্যের উন্মেষ পর্বটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এরপর আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যের ঐশ্বর্য-পর্ব। তাছাড়া 'নৈবেদ্য' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে ভাববস্তু অগ্রসরের পথরেখার বিষয়টি চিত্রিত করা হয়েছে। পরিশেষে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যের অন্ত্যপর্বটি।

১.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। রবীন্দ্র-কাব্যধারার সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

২। রবীন্দ্র-কাব্যের উন্মেষ-পর্বটি আলোচনা করুন।

৩। 'নৈবেদ্য' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যধারার ভাববস্তুর বিশ্লেষণ করুন।

৪। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্ত্যপর্বের সামগ্রিক আলোচনা তুলে ধরুন।

৫। টীকা লিখুন —

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চিত্রা, ছবি ও গান, প্রভাব সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, বলাকা, গীতাঞ্জলি, প্রান্তিক।

১.৫ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ-২
রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস
রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস : নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্প

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ রবীন্দ্রনাথের নাটক

- ২.২.১ 'প্রায়শ্চিত্ত' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিয়মানুগ সাধারণ নাট্য রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- ২.২.২ 'শারদোৎসব'-এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- ২.২.৩ রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির কলানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

২.৩ রবীন্দ্র-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

- ২.৩.১ 'চোখের বালি' থেকে 'যোগাযোগ' পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীর অস্তিত্ব ভাবনার বিভিন্ন রূপরেখা
- ২.৩.২ 'গোরা' পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয় এবং শিল্পমূল্য

২.৪ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

- ২.৪.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প : প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে তাঁর নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বিচিত্র ভাব ও বিষয়বস্তুর উপরেও আলোকপাত করব।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের প্রথম পত্রের দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছে "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস : নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্প" বর্তমান বিভাগ থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- 'প্রায়শ্চিত্ত' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিয়মানুগ সাধারণ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার বিষয়বস্তু।
- 'শারদোৎসব'- এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিষয়বস্তু।
- রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিষয়বস্তু।
- রবীন্দ্র-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বিষয়বস্তু এবং নারীর অস্তিত্ব ভাবনার রূপরেখা।
- রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিষয়বস্তু।

২.২ রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি, উপন্যাসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার বেশিদিন সময় অতিবাহিত হয়নি, নাট্যকার বলতে বাংলা সাহিত্যে আমরা দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এঁদের কথাই মূলত স্মরণ করতে পারি। তাছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক নাট্যকারই নাটক রচনা করেছিলেন। সে-গুলোর অনুবাদ অথবা ইংরাজি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ, এই ছিল বাংলা নাটকের সম্পদ।

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নাটকের প্রাচীন লক্ষণ, প্রাচীন সংজ্ঞা সমস্ত পরিবর্তন হয়ে, প্রাচীন রূপ ও ভঙ্গিমারও বিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, ইংরেজি নাটক ইত্যাদিতে বস্তুধর্মই এদের প্রাণ, ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহে এদের ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয় রচনাগুলিকে গীতি, নাট্য-কাব্য-নাট্য অথবা নাটক ইত্যাদি বলা হয়, তাদের মধ্যে এই বস্তুধর্ম নেই, এবং ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহ তাদের রাগ ও ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রিত করে না। দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাগুলি বিচার্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিভিন্ন পর্ব একটির পর একটি কালানুক্রমিক সাজিয়ে নেওয়া চলে। প্রথম পর্বের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীতধর্মী মানস যে শুধু কাব্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে তা নয়, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটকেও তা প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁর নাটকেও নিজস্ব আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন ও তত্ত্ববাদ প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্র সমালোচক ড° টমসন একটি মূল্যবান বক্তব্য করেছিলেন — "His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action."

রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্য নাটক, সাংকেতিক নাটক— সবই কবি প্রত্যয়ের বাহন হয়ে উঠেছিল, একথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অনেক সময় অতিমাত্রায় লিরিক প্রধান। কখনও বাস্তব পরিবেশ, কখনও অতি রোমাণ্টিকতাতে পরিপূর্ণ, কখনও বা কবির সমগ্র নাটকই কবির তত্ত্বকথা ও অনুভূতির বাহন বলে পরিগণিত হয়। তবুও তাঁর রচিত নাটকগুলিতে এক বিচিত্র ঐশ্বর্য দেখা যায়, বিশেষ করে প্রতীক নাটকে তিনি এক দিগ্‌বিজয়ী নাট্যকার।

২·২.১ 'প্রায়চিত্ত' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিয়মানুগ সাধারণ নাট্য রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ সনাতন রীতির নিয়মানুগ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। নাটকগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্য নিয়মানুগ-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকগুলি হল— 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) এই নাটকগুলিতে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির অনুসরণ হয়েছে। তার আগে লেখা নাটকগুলি সাহিত্য বিচারে উৎকৃষ্ট ছিল যদিও, নাট্য লক্ষণ ছিল ক্ষীণ। উপরিউক্ত নাটকগুলিতে পঞ্চাঙ্করীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু মঞ্চ উপযোগী নাটকের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট। কবি ভাবনার বিশেষ তত্ত্বকথা এবং লিরিকগুণ এই নিয়মানুগ নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডি নাটক। রাজা বিক্রম ও রানি সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আকাঙ্ক্ষার পীড়ন থেকে স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে পরিত্যাগ এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চূড়ান্ত বেদনার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। —এই আদর্শ কবি অনেকটা শেক্‌স্‌পীয়রীয় ঢঙেই অনুকরণ করেছেন বলেই মনে হয়। হত্যা-আত্মহত্যা ইত্যাদি রক্তাক্ত কাহিনির মধ্য দিয়েই নাটকগুলি চালিত হয়েছে। এই নাটকের রচনাংশ, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনি গ্রন্থন কিছুটা দুর্বল। কবি এই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই এই একই বিষয় অবলম্বনে সম্পূর্ণ ভিন্নরসের আর একটি গদ্যনাটক লিখেছিলেন 'তপতী' (১৯২৯) নাম দিয়ে। এই নাটকটিতে তত্ত্বের প্রাধান্যই বেশিছিল, নাটকীয়তা যেন তত্ত্ববাদ দিয়ে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। 'বিসর্জন'ও পঞ্চাঙ্ক সনাতন পদ্ধতির নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূল কাহিনিকে নাটকের ছকে লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটি সুরুচিসঙ্গত ও অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করেছেন, যার সাহিত্য মূল্য ও অভিনয় মূল্য দুই-ই প্রশংসার যোগ্য। প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং শেষে প্রেমের জয়লাভ, তা-ই এই নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম থেকেই ঘটনার পর ঘটনা এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত হয়েছে যে, কোথাও কোনো ফাঁক নেই, সর্বত্র নাটকীয়— সংস্থান অত্যন্ত ঘন ও নিবিড়।

রাজা গোবিন্দমানিক্য দেবী মন্দিরে বলিদানের নির্মম প্রথা উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তা নিয়ে প্রথা ও সংস্কারে দাস মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বাধল! রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মহত্যার ফলে তাঁর কঠোর চরিত্র একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, এক মুহূর্তেই সংস্কারের বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি রঘুপতি স্নেহপ্রেমের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে হৃদয়ের মূল্য বুঝতে পারলেন।

'বিসর্জন' আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল একটি ছোটো বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে, এবং সেই ভাষাকে ভাষা দিয়েছিলেন গোবিন্দমানিক্য।

এই নাটকে আগাগোড়া বিশেষ তত্ত্বকথার প্রাধান্য, অনেক সময় চরিত্রগুলি সুদীর্ঘ বিবৃতিমূলক সংলাপের মারফতে কবির ভাবনা কল্পনারই প্রতীক পর্যবসিত হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটক ভাল করে বুঝতে হলে তার দুই বছর পর রচিত 'মালিনী' নাটকটিকে বুঝতে হবে। এই নাটকটির বিষয়বস্তুও অনুরূপ। রাজকুমারী মালিনীর হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হল, দুই বন্ধু ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের মধ্যেও প্রথার সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব ঘনাল। ক্ষেমঙ্কর মনে করেছিল, বন্ধু সুপ্রিয় প্রেমের মোহে বহুকালাশ্রিত বহু জীবনের নির্ভর প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচারকে ত্যাগ করে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন সে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রিয়বন্ধুকে নির্মম শাস্তি দিয়ে স্বহস্তে সুপ্রিয়কে হত্যা করল। এই নাটকেও প্রেমজয়ী হল কিন্তু ক্ষেমঙ্করকে রঘুপতির মতো রিক্ত হতে হয়নি।

'মুকুট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রায় একই ধরনের নাটক। মুকুট বোলপুরে আশ্রম বালকদের জন্য রচিত নাটক। ত্রিপুরার রাজবাড়ির সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় কবি এর মধ্যে বালকমনের উপযোগী করে একটি মহান আত্মত্যাগের কাহিনি লিখেছেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' তাঁর লেখা প্রথম পর্বের উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটির নাট্যমূল্য অতি উচ্চস্তরের নয়। কিন্তু বীরত্ব ও জাতি প্রেমের সর্বনাশ ভয়াল রূপ প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকেই 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) রচনা করেন। মূল কাহিনি একই ছিল। কিন্তু চরিত্র ঘটনার সমাবেশ ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচণ্ডতা ও বলের সামনে আত্মত্যাগ ও অসহযোগের দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা— এই তত্ত্বকথাই নাটকটির উপজীব্য। কিন্তু নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহ তত্ত্ব ও লিরিক প্রভাব কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

২.২.২ 'শারদোৎসব'-এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাল্মীকি প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য। ১৩০৩ সালে কবির কাব্যগ্রন্থের যে সংস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, 'গ্রন্থাবলীর' অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্য এই গীতি-নাট্যখানিতে এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কবি স্বয়ং বলেছিলেন— "এই গীতি-নাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে

শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।" রবীন্দ্রনাথ নিজেই বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ও সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রতিভা দেবী।

এই নাটকটি বিশুদ্ধ গীতিনাট্য, নাটকের আধারে সংগীত পরিবেশনই এর মূল লক্ষ্য। 'মায়ার খেলা'ও (১৮৮৮) সেই ধরনের নাটক। বাল্মীকি প্রতিভা রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকির কবিত্ব লাভের ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে, অবশ্য এতে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর প্রভাব আছে। 'মায়ার খেলা' সখীসমিতির মহিলাদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রচিত হয়েছিল, প্রেমের হাসি-কান্নাই এর মুখ্য বক্তব্য।

পরবর্তী নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)। এই কাব্যনাট্যে সর্বপ্রথম এমন একটা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের বিশেষ যোগ আছে। প্রেমের মধ্যেই মুক্তি আছে, শুষ্ক ও জীবনবিহিত বৈরাগ্য-সাধনায় জীবনরস নেই— "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" উত্তর কালে এই কবিভাবনাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সনাতন রীতির নিয়মানুক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করে নাট্য-প্রতিভার এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) হল একটি পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডি। রাজা বিক্রম ও রানি সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আকাঙ্ক্ষার পীড়ন থেকে স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে পরিত্যাগ এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছুড়ান্ত বেদনার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। এই নাটকের আদর্শ তিনি শেক্স্পীয়রীয় নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখেছিলেন। এর রচনাংশ, চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনি-গ্রন্থন কিছু দুর্বল। কবি এর ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই এই একই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরসের আর একখানি গদ্যনাটক লেখেন, 'তপতী' (১৯২৯), 'তপতী' নাটকে তত্ত্বেরই প্রাধান্য বেশি। 'বিসর্জন' (১৮৯০) পঞ্চাঙ্ক সনাতন পদ্ধতির নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূল কাহিনিকে নাটকের ছকে লিখে রবীন্দ্রনাথ নাটকের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে প্রেমেরই জয়লাভ এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। রাজা গোবিন্দমানিক্য দেবীমন্দিরে বলিদানের নির্মম প্রথা উঠিয়ে দিলেন। তখন প্রথা ও সংস্কারের দাস মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের আত্মহত্যার কালে সমস্ত সংস্কার ভেঙ্গে গেল রঘুপতির। নাটকটিতে লিরিকের প্রাধান্য রয়েছে।

'মালিনী' নাটকের বিষয়টিও অনুরূপ। রাজকুমারী মালিনীর হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়েছিল। দুই বন্ধু সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের মধ্যেও প্রথার সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ছিল। পরে ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে স্বহস্তে হত্যা করল। এখানেও প্রেমকে জয়ী করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪), সতী (১৩০৪), নরকবাস (১৩০৪), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৩০৪), কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৩০৬) লিখেন। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'।

গান্ধারীর চরিত্রে একদিকে পুত্রস্নেহ, স্বামী ধর্ম, অন্যদিকে সত্য নিত্যধর্ম। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে পুত্রস্নেহ ও নিত্য-মানবধর্মের বিরোধ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তার নাটকীয়

সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হতে দেননি। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায় না, কারণ তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ। গান্ধারীর চরিত্রে একদিকে পুত্রস্নেহ, অপরদিকে পঞ্চপাণ্ডবদের প্রতি সমর্থন, কারণ তিনি সত্যকে সবসময়ই সমর্থন করে এসেছিলেন। পুত্রদের প্রতি বিরাগ, দুঃখ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডবদেরই আশীর্বাদ দিলেন প্রাণভরে। এই দুই ধরনের মনোভাব মিলে মিশে নাটকটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' নাটকে কর্ণ ও কুন্তী উভয়েরই মানসিক দ্বন্দ্বের কাব্যময় প্রকাশের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কর্ণের চিত্তে একদিকে পালয়িত্রী মাতার প্রতি মমত্ব ও কর্তব্যবোধ, দুর্যোধনের প্রতি বীরের ধর্মবোধ, অন্যদিকে গর্ভদাত্রী মাতার এবং ভাইদের প্রতি নবজাগ্রত একাত্মবোধের চেতনা, এই দুই মিলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, তার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ গীতি-কাব্যের ভূমিকার মধ্যে যথাসম্ভব বিকশিত করে তুলেছেন। তার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ বিষয়ক কিছু রঙ্গ নাটক লেখেন। 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) ১৯২৮ সালে 'শেষরক্ষণ' নামে পুরোপুরি নাটকীয় আকারে অভিনয়যোগ্য সংস্করণ দ্বারা প্রকাশিত, বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭) ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭) চিরকুমার সভা ১৯২৬-১৯০৮ সালে প্রজাপতির নির্বন্ধ নামে গদ্য-কাহিনিরূপে প্রচারিত শ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্য ও প্রথম কমিডিরূপে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। উইট বা বাক্‌রীতির কৌতুকময় বৈচিত্র্য তাঁর রঙ্গনাট্যকে বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবময় স্থান দিয়েছে। 'চিরকুমার সভা'-এর চিরকুমারদের 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' কীভাবে বিশোরীদের সামান্য স্পর্শেই ভেঙে গেল তার কৌতুককর বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। শেষরক্ষা কমেডি হিচাপে বেশি জনপ্রিয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং ছোটো নাটিকাগুলিও হাস্যকৌতুকে পরিপূর্ণ বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য ও উইটের ফুলঝুরিও এখানে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত। বাংলা সাহিত্যে কৌতুক নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের যে এক বিশাল ভূমিকা বর্তমান ছিল তাও অতি সহজভাবেই উপলব্ধ হয়।

'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যনাটক, প্রথম প্রহসন— ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক, দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘটনার পূর্বাময় যথাযথ বিন্যাসে একটি হাস্যকর কৌতুকাবহ নাটকীয় সংস্থান মিলনের চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছেচে। নারীকে নিয়ে যুবক মনের উত্তেজনা ও কৌতূহল, পুরুষকে নিয়ে কিশোরীমনের উৎসাহ ও কল্পনা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অনেক সময় যে কৌতুকাবহ আবর্তের সৃষ্টি করে, লেখক নিঃসন্দেহে সেই আবর্তকে শেষ ব্যঙ্গহীন কৌতুকে রূপান্তরিত করেছেন। 'তাসের দেশ' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ ভার্দ্র মাসে। নাটকটি ব্যঙ্গবহুল, তবু একে ব্যঙ্গনাট্য বলা যায় না, প্রহসনও বলা যায় না। তাসের দেশ জড় সনাতনপন্থী দেশ, যে দেশের মন অলস, অনড়, নির্জীব, পরিবর্তন বিমুখ ও জীর্ণ নিয়ম শৃংঙ্খলে বাঁধা। সেই দেশে হঠাৎ প্রবেশ ঘটে এক রাজপুত্র ও এক সদাগর পুত্রের। তারা আনল মুক্তির গান। একান্ত উদ্দাম চঞ্চলতা, ও নিয়মের অবাধ্যতা। তাসের দেশে ভাঙন ধরল। স্বাধীন ইচ্ছা জাগল ও প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হল। কাজের পাঞ্জা ছক্কা তাসের মানুষ রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ নীতিধর্মী কবি, তাঁর এই গীতধর্মী মানস শুধু যে বিচিত্র কাব্যরূপের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, নাটক ইত্যাদিকে তা প্রকাশিত।

২.২.৩ রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোর কাল কেটেছিল ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য মহলে। তাই পরবর্তীকালেও তাঁর দেখা নাটকগুলিকে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই পরিণত বয়সে কলকাতাতে অবস্থানকালে অভিজাত সমাজের অভিনয়-কলার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন অনেক ধরনের বিভিন্ন রুচির নাটক-নাটিকা। কবির নিজস্ব নানা তত্ত্ববাদ। বিশেষত নিগূঢ় অধ্যাত্ম সাধনাকে কেন্দ্র করে এমন একাগ্রকার নাটক সৃষ্টি হয়েছে, যার দ্বারা তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। এই বিশেষ ধরনের নাটকেই রূপক-সাংকেতিক নাটক বলা হয়। একে তত্ত্বনাটকও বলা যায়। কারণ এই নাটকগুলির ঘটনাক্রম ও চরিত্রগুলিকে কোনো একটি দার্শনিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকথার বাহনরূপে ব্যবহার করা হয়।

রূপক নাটক অর্থে, রসময় করা, স্পষ্টতর করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপারকে বুদ্ধি ও প্রতীতির গোচরীভূত করা, আর সাংকেতিক নাটক সম্পূর্ণভাবে অন্য ধরনের। তা অপরূপ রহস্যে ভরপুর। জগৎ ও জীবনের চারদিকে যে রহস্যময় বাতাবরণ রয়েছে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যার অস্বচ্ছতা ভেদ করতে পারে না, যার স্বরূপ বোঝা কষ্ট, —সংকেতের সাহায্যে তার আভাস-ইঙ্গিত লাভ করার চেষ্টাই হল সাংকেতিক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক বা অন্য কোনো সংকেতবাদী নাট্যকারের কাছ থেকে তাঁর সাংকেতিক নাটকের প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা লাভ করলেও তাঁর লিখিত সাংকেতিক নাটকগুলোতে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কার এবং ব্যক্তিগত চিত্তপ্রবণতা, যা তাঁর কাব্য সাহিত্যের সম্পদ, তার সবটুকু বৈশিষ্ট্য সাংকেতিক নাটকে ধরা পড়েছে। তাঁর লিখিত সাংকেতিক নাটকগুলোর কালানুক্রমিক ধারা এই ধরনের— 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০); এর সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অচলায়তন' (১৯২০)। 'অচলায়তন'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' ১৯১৮ সালে প্রকাশিত, 'ডাকঘর' (১৯১২) 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫) এবং কালের যাত্রা (১৯৩২) —এগুলি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-আশ্রয়ী সাংকেতিক নাটক। 'শারদোৎসব' রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু-প্রশস্তির নাটিকা। শান্তিনিকেতনে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। তারপরও নানাস্থানে এই নাটক অভিনীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবির পরবর্তী নাটকগুলির সংকেত ও প্রতীকরহস্য 'শারদোৎসব' নাটকে

নেই। তাতে আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মানুষ যে উৎসবানন্দ অনুভব করে, উপভোগ করে, তার প্রতি কবিমানসের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। কবি মনে করেন, আনন্দকে সত্যভাবে উপভোগ করা যায় চুটির মধ্যে, অবসরের মুক্তির মধ্যে। আবার ছুটি ও মুক্তি মানুষ লাভ করে কর্মের ভিতর দিয়ে, দুঃখের আখ্যার মধ্য দিয়ে। দুঃখই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে। নাটকের পাত্র উপনন্দ শারদীয় উৎসবের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে প্রভুর ঋণ শোধ করার জন্য নিজের উপর দুঃখের সাধনাকে ডেকে এনেছিল। তার পরবর্তী নাটক 'রাজা' থেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাংকেতিক নাটকের শুরু। 'রাজা' নাটকের কাহিনি বৌদ্ধ 'কুশজাতক' থেকে নেওয়া হয়েছে। কুরূপ রাজা ও সুন্দরী রানির বিড়ম্বিত জীবন কি করে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেল, তা-ই এই জাতকে বলা হয়েছে। এরই উপর ভিত্তি করে রাজা, রানি সুদর্শনা ও পরিচারিকা সুরঙ্গমার এক বিচিত্র কাহিনির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অপরূপ তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চান না, শুধু মাত্র ঠাকুর্দা ও সুরঙ্গমার কাছে তিনি সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে আসেনি অন্ধকার কক্ষের মধ্যে রাজা ও রানির মিলন হয়। কিন্তু রানি সুদর্শনা তাতে সন্তুষ্ট নন, তিনি রাজাকে ইন্দিয়জ রূপ-আসক্তির মধ্য দিয়ে পেতে চান। কিন্তু সেভাবে রাজাকে তিনি না পেয়ে কুরূপ মনে করেন। পরবর্তীকালে রানি জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে নিজেকে সমার্পণ করেন এবং তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি রাজার মধ্যেই অপরূপের সন্ধান পেয়ে ধন্য মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব নাটকীয় মুহূর্ত ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশ ও নিগূঢ় অধ্যাত্মসংকেতের সাহায্যে তা ব্যক্ত করেছেন। আসল তত্ত্বটি হল ভগবানকে রূপের মধ্যে লাভ করা যায় না। 'রাজা' নাটকের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনেরই মর্মকথা। এই নাটকে সাংকেতিকতার চেয়ে রূপকের প্রাধান্যই বেশি। 'অচলায়তন' নাটকে প্রাচীনকালের মহাযান বৌদ্ধধর্মর প্রভাব পড়েছিল। এই নাটকের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের চাপে মানবাত্মার স্বাধীন প্রকাশের বিলোপ এবং তা থেকে মুক্তিলাভের কথা ঘোষিত হয়েছে। আচার-বিচার, জপতপ ও মন্ত্রতন্ত্র যখন অচল অবরোধ সৃষ্টি করে তখনই গুরুর আবির্ভাব হয়, তখন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে ধূলায় মিলে যায়, মানবাত্মার যাবতীয় পীড়নের অবসান হয়। নাটকটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাংলাদেশের উদার পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-মানসের রূপ রূপকের আশ্রয়ে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশের শত শতাব্দীর সঞ্চিত শাস্ত্রপুথি আচার নিয়মের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ সেই সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তখন গুরুর আবির্ভাবে যে অচলায়তন কীভাবে ভেঙে গিয়েছিল, তার কথাই বলা হয়েছে।

তাঁরপর বিশেষ নাটক 'ডাকঘর' এর কথা উল্লেখ করতে হয়। ডাকঘর রচিত হয় ১৩১৮ সালের শেষের দিকে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকেত রহস্যময় গীতধর্মী এই নাকটটি রচিত হয়েছিল তিনদিনে শান্তি নিকেতন আশ্রয়ের পরিবেশের মধ্যে। প্রথম অভিনীত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। "আমি চঞ্চলহে আমি সুদূরের পিয়াসী"— রবীন্দ্রনাথের এই জনপ্রিয় গীতটি ডাকঘর নাটকে

সুদূরের সংকেত, অজানার ইঙ্গিত ও সকরুণ গীতি মাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অমল, সুধা, ঠাকুরদাদা, ডাকহরকরা ও অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করে সুন্দর করুণ দৃশ্যের মাধ্যমে নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে। একটিও গান না থাকা নাটক ডাকঘর। কিন্তু গীত ছাড়াও এমন গীতিধর্মী নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে সমগ্র নাটকটিতেই একটি সুরের রেশ লেগেই আছে। রুগ্‌ণ বালক অমল বিছানায় শুয়ে বাইরের মানুষের চলাফেরা, প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করে। সে ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে বাইরের সীমাহীন জগতে ছড়িয়ে পড়তে চায়। একদিন সে হঠাৎ লক্ষ করল যে, রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়েছে। সে ভাবল তাকেও রাজা চিঠি দিবেন। তার এই অসম্ভব কল্পনাকে অনেকেই পরিহাস করেছিল, কিন্তু ঠাকুর্দা তা বুঝতে পেরেছিলেন। রাজা একদিন তাকে চিঠি পাঠাবেন জেনে সে বাইরে যেতে চায় না। রোগশয্যায় শুয়ে সে এই কথাই ভাবতে থাকে। রোগ যখন প্রবল আকার ধারণ করল, তখন রাজকবিরাজ এসে জানিয়ে দিয়েন যে, গভীর রাতে রাজা তাঁর বালকভক্তের কাছে এসে দেখা দেবেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, দীপ নিতে যায়, অমল ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ মুহূর্তে অমলের সখী দুধা এসে বলে অমলের ঘুম ভাঙলে তাকে যেন বলা হয় সুধা তাকে ভোলেনি। নাটকটিতে আসলে অমল মুমূর্ষু মানবাত্মার প্রতীক। যে জীবন ব্যাধি জর্জর, কিন্তু সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে যে অসীমের বুকে ফিয়ে যেতে চায়। সুদূর ও অসীমকে যখন সীমা থেকে পৃথক করে দেখা হয়, তখন পরম সত্যকে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। সীমা ও অসীমের নিদ্বন্দ্ব সাধনাই রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানসাধনা, সে কথা অমলের প্রতীকের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। অমলের ঘুম হল মর্ত্যজীবন থেকে পরিত্রাণের কাহিনি। মুক্ত মানবাত্মা অসীমের বুকে মিশে গেল— সুধা হল মর্ত্যজীবনের প্রতীক।

পরবর্তী নাটক 'ফাল্গুনী'তে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জরা ও যৌবনের দ্বৈত সত্তার পারস্পারিক সম্পর্কের পটভূমিকায় এক নতুন ঋতুনাট্যের সৃষ্টি করেছেন। একদল তরুণ, চন্দ্রহাস যাদের নেতা— পণ করেছিল গুহার মধ্যে আত্মগোপনকারী জরা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে আসবে। অনেক চেষ্টা করে সেই বৃদ্ধকে গুহার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসা হল, তখন দেখা গেল যে সে বৃদ্ধও নয়, জরাও নয়, শীতও নয় — এ হচ্ছে তাদের সর্দার। সে যৌবনের, বসন্তের ও পূর্ণতার প্রতীক। এটাই এই নাটকের মূল কথা। পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী' একটি অসাধারণ প্রতীক নাটক, বিশেষ শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সমকক্ষ নাটক। এই নাটকে তিনি আধুনিক সমস্যার আর একটি উৎকট দিককে এক অপরূপ প্রতীকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে এই নাটক যক্ষপুরী নামে রচিত হয়েছিল। তারপর পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এর দ্বিতীয় বার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন 'নলিনী'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার সময় নামকরণ হয় রক্তকরবী, মাটির নিচে 'যক্ষপুরী', যেখানে সোনার খনি। সেই অন্ধকার থেকে শ্রমিকের দল তাল তাল সোনা তোলে। অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা তাই তাদের জীবনে আনন্দ নেই, অবকাশ নেই, মুক্ত আকাশ নেই, মুক্ত পৃথিবী নেই। তারা যেন নেশাগ্রস্তের মতো সোনা তুলেই চলে। জালের আড়ালে স্বয়ং যমরাজ আছেন, তার নির্দেশে সবাই চলে। বড়

সর্দার, মেজ সর্দার কোনও প্রতিবাদ উঠলেই তাদের চুপ করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র রঞ্জনকে তারা পরাস্ত করতে পারে না। রঞ্জনকে যেন কোনো বন্ধনেই বাঁধা যায় না। তারপর মাটির বুক থেকে রক্তকরবী পরিহিতা নন্দিনীকে ছিনিয়ে আনা হল। সে রঞ্জনের সখী। সে যক্ষপুরীতে বাইরের পৃথিবীর বাণী নিয়ে এল। তার আগমনে নিয়ম ভেঙ্গে গেল। নন্দিনী ছিল প্রেমের শক্তিতে শক্তিময়ী, তাই রঞ্জন ও নন্দিনীর প্রেমকে সবাই স্বীকার করে নিল, বিশেষ করে রাজা। কিন্তু ইতিমধ্যে রঞ্জনকে যক্ষরাজের কক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সর্দারের দল তাকে বিনাশ করতে চাইল। সেই যৌবন মূর্তিকে অমিত শক্তিধর রাজা না জেনে বিনাশ করলেন। পরে রাজা উপলব্ধি করতে পারলেন যে না জেনে তিনি অজ্ঞাতসারে রঞ্জনকে বিনাশ করেছেন। তিনি এখন তাঁর নিজের জালের আবরণ ছিঁড়ে ফেললেন। পরে তিনি নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চললেন নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে। তখন পৌষমাসের ফসল পেকেছে এবং দূর থেকে ফসল কাটার গান ভেসে আসছে।

নাটকটিকে আধুনিক জীবনের একটি অভিশপ্ত দিকের কথা বলা হয়েছে, তেমনি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার দ্বারা রক্তকরবীর রক্তিমার সাহায্যে অপরাজেয় প্রেম ও প্রাণের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। রঞ্জন এখানে যৌবনের প্রতীক। নন্দিনী ও রঞ্জনের প্রেমের প্রতীক হল রক্তকরবী। নাটকটিতে রূপক প্রতীকের প্রাধান্য থাকলেও ঘটনামুখর নাট্যরস, যক্ষরাজ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি উক্ত নাটকটিতে খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পরবর্তী নাটক মুক্তধারা-য় কবিমানসের অভিনবলোকে উত্তরণের চিহ্ন ফুটে উঠল। এতে সাম্রাজ্যলোভের সঙ্গে বিজ্ঞানের অশুভ মিলনের ফলে মানব নির্যাতন কতদূর প্রচণ্ড ও বর্বর হতে পারে এবং সেই নির্যাতনের কোন রন্ধ্র পথ দিয়ে মুক্তিবাণী আসে তার কথা নাটকীয় ঘটনা সংযোগের দ্বারা বলা হয়েছে। একটি পরিত্যক্ত শিশু যাকে রাজা ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দান করেছিলেন। তার নাম অভিজিৎ। উত্তরকূটের শাসকেরা শিবতরাইয়ের প্রজাদের শাস্তি দেবার জন্য এমন একটি যন্ত্র তৈরে করেছিল যে, শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জলের চাবিকাঠি রইল উত্তরকূটের হাতে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল অভিজিৎ। এর জন্য তাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি জানতেন কী করে ঝারনার জলধারাকে মুক্ত করতে হবে। তিনি ঝরনার জলধারাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন পথে আঘাত করে। তৃষ্ণাতুর প্রজার দল মুক্তি পেল উত্তরকূটের দাম্ভিকতার আঘাত থেকে। কিন্তু এজন্য তাঁকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়, এই কথা তিনি প্রমাণ করলেন।

নাটকটিতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অসহযোগের মধ্য দিয়ে যেন মহাত্মা গান্ধীর কর্মপদ্ধতির পরিচয় লাভ করা যায়। এই নাটকের কোনো কোনো অংশ সাংকেতিক নাটকের পক্ষে কিছু অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে। 'কালের যাত্রা' ক্ষুদ্র নাটিকাতে মহাকালের যাত্রা অর্থাৎ জীবনসত্তার বিকাশধারা অচল হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ জনগণ সমাজে কোনো মর্যাদা লাভ করে না; রাজা, মন্ত্রী বা অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির

হাতে রথ চলে না; রথ চলে তখন, যখন সাধারণ জনগণ রথের রশি ধরে টানে। প্রচণ্ড গতিতে রথ তখন চলে। রাজার রাজপ্রসাদও তখন গুঁড়িয়ে যায়। কবি আধুনিক সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই নাটকের উপস্থাপনা করেছেন।

২.৩ রবীন্দ্র-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র কবিই ছিলেন না, ঔপন্যাসিক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য। উপন্যাসের স্বাদ বৈচিত্র্য, বিষয় বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তি বৈচিত্র্য ফোটাতে তিনি যে বিশেষ শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন, তার ঐশ্বর্য আজও সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই তাঁর স্থান। বাংলা উপন্যাসের মোড়-ফেরাতে, নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে তাঁর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই।

মাত্র ষোড়-সতেরো বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথ কিশোর অবস্থা থেকে যৌবনের দিকে পদার্পণ করেছিলেন, তখন 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮), কিন্তু এতে ততোটা পরিপক্কতা নেই বলে পরে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। একটি কিশোরীর জীবনকথা 'করুণা'র মূল কথাবস্তু। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে লেখা 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস। উপন্যাসটি যেন 'সন্ধ্যা সংগীত' ও 'প্রভাত সংগীত'-এর কবি কল্পনার বাস্তব জীবনের ফ্রেমে আঁটা গদ্য সংস্করণ। যা মূলত কাব্য ছিল তাকে এখানে উপন্যাসোচিত প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবদ্ধতার ও চরিত্র সঙ্গতির মাধ্যমে রূপান্তরের প্রয়াস। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস লেখার পর থেকেই তিনি ক্রমে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও কলারূপের উপর প্রত্যক্ষ অধিকার অর্জন করেন। তারপর আর ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়, 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), এই দুইটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে লেখা। কারণ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যুগ চলেছিল। উপন্যাস দুইটি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত দুইটিরই ঘটনা-বিন্যাস ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিবৃত। উভয় উপন্যাসেই ইতিহাস একটা আশ্রয়মাত্র। আসলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লেখার গোড়ার দিকে ইতিহাসশ্রয়ী রোমাণ্টিক কাহিনির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা উপন্যাস লিখতেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ইতিহাসশ্রয়ী অবাধ কল্পনা। 'বউঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'তে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাসের কাহিনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বউঠাকুরানীর হাট'-এ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পিতৃব্য বসন্তরায়, পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে, যার অধিকাংশই ইতিহাসে নেই। প্রতাপাদিত্যের অমানবিক নির্মমতায় কীভাবে তাঁর পুত্র কন্যার জীবন ধ্বংস হল, পিতৃব্য বসন্তরায় প্রাণ হারালেন, কন্যা বিভার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়েছিল, তার বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটক দুটি এই উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনেই রচিত। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র যদিও ইতিহাসসম্মত, কিন্তু কাহিনির ঘনত্ব চরিত্রের তির্যকতা ও

মানসিক দ্বন্দ্ব অতিশয় প্রাথমিক স্তরের।

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি (১৮৮৭), ত্রিপুরার রাজবংশের একটি কাহিনি অবলম্বন করে রচিত। কল্পনার বৈচিত্র্য যদিও আছে, তথাপি লেখক ইতিহাসকে এখানে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রাজা গোবিন্দমানিক্য, যিনি দেবী মন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির চরম দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় উপন্যাসটি লিখিত হয়েছিল। এটা ইতিহাস সম্মত। তাছাড়া নক্ষত্ররায়ের ষড়মন্ত্র, পুরোহিত, রঘুপতির দম্ভ, পরে তার মনে ব্যাৎসল্য-রসের উদয়। মানবধর্মের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে মানবিক মূল্য এবং স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার আদর্শ চিত্র এতে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপরিউক্ত দুটি উপন্যাস রচনা করার পর তিনি দীর্ঘদিন কোনো উপন্যাস রচনা করেননি। তারপর বাংলা ১৩০৮-১৩০৯ সনে 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে চোখের বালি (১৯০০), উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ষোল বছর পর তাঁর এই যুগান্তকারী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। বাংলা উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্রের যুগান্তকারী উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসর পর বড়ো রকমের পালাবদল ঘটেছিল 'চোখেরবালি' উপন্যাসে। এটা একটি আখ্যানধর্মী উপন্যাস। কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধনার খণ্ডিত অসম্পূর্ণ প্রয়াস থেকেই এখানেই তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার সুস্পষ্ট ও পূর্ণ বিকশিত অভিব্যক্তি। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানা-পোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনীর দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের সমস্যা কীভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থি মোচন হল, বাঙালি সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগ-সঞ্চিত সংস্কারে এখানে কবিগুরু আঘাত হানলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল-বিধবার প্রেম সত্য করতে না পেরে তাকে বিষপান করিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ বালবিধবার প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেননি, আবার সমাজে প্রতিষ্ঠাও করতে পারেননি। মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবচেতন সত্তার নিগূঢ় ইঙ্গিত, সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রকৃতির সংঘাতের ফলে নারীর জীবন কোনো পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, রবীন্দ্রনাথ সে কথা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

'চোখেরবালি'র কয়েক বছর (দুই বছর) পর 'নৌকাডুবি' উপন্যাস রচিত হয় ১৯০৬ সালে। এই উপন্যাসে বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই। ১৩১০-১১ সালের নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। 'চোখেরবালি' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখার পর তিনি এই রোমাণ্টিক ঘটনা নির্ভর উপন্যাস লিখেছিলেন। ঘটনার বিবরণ এই ধরনের— 'রমেশ' নামে এক যুবক নৌকাডুবির পর কোনও ক্রমে রক্ষা পায়। চেতনা ফিরে এলে যে দেখল যে তার পাশে একজন অপরিচিত নববধূ পড়ে আছে। তার নাম কমলা। সদ্য বিবাহিত কমলা তার স্বামীকে আগে দেখেনি। তাই সে রমেশকেই তার স্বামী বলে ভাবল। কিন্তু রমেশ

হেমনলিনী নামে একজন মেয়েকে ভালোবাসত। তাই সে কমলাকে কোনোদিন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। সবসময় তাকে পরস্ত্রী বলেই জানত। কমলার প্রকৃত স্বামীর নাম ছিল নলিনাক্ষ। পরে নানা কাহিনি ঘটার পর কমলাও নলিনাক্ষর মিলন ঘটেছিল। কিন্তু রমেশও হেমনলিনীর মিলন কোন দিনও হয়ে উঠেনি। উপন্যাসটি মধ্যে পরিপক্কতা নেই। যেন রূপকথাই বেশি। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি বিশুদ্ধ ও মনোজ্ঞ গার্হস্থ্য রসের যে পরিবেশন তিনি কয়েছেন, তা অন্য উপন্যাসে উপলব্ধ হয় না। তার পরবর্তী উপন্যাস 'যোগাযোগ' (১৯২৯) 'বিচিত্র' পত্রিকায় (১৩৩৪-১৩৩৫) এটি 'তিনপুরুষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন ও কুমুদিনী বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত, ধনী মধুসূদন, সংস্কৃতিবান শিক্ষিত পরিবারের কন্যা কুমুদিনীকে বিয়ে করেছিল। কুমুদিনী সেই পরিবারে এসে অশান্তি পেয়ে পেয়ে তার জীবন যখন ব্যর্থ বলে মনে হয়েছিল, তখন সে আবিষ্কার করেছিল যে সে সন্তানসম্ভবা। উপন্যাসটি মনস্তত্ব মূলক। এই উপন্যাসটিকে দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস বলা যায়।

'গোরা' (১৩১৪-১৫) ১৯১০ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'গোরা' বাংলা সাহিত্যে একমাত্র উপন্যাস, যে উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ, সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নতুন আদর্শ সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেশ ও চিন্তা-বিপর্যয়, যুক্তি তর্কের উত্তাপ, অনুভূতির উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি— এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী এক শ্রেণির সমগ্র জীবনধারা রূপ গ্রহণ করেছে। একমাত্র এই উপন্যাসেই বৃহত্তর অর্থে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শের সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত সংযোগের অবস্থান নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 'গোরা'র প্রসারিত পটভূমি। সুবিস্তৃত পরিধি বিশাল ও গভীর জাতীয় সত্তার তুলনা আজও বাংলা উপন্যাসে পাওয়া ভার।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি ও ভারতীয় জীবন ধারার সামগ্রিকভাবে উনয়ন ও বিদেশী শাসনশক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পদিন পরে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও স্বাদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, ব্যক্তিগত লোভ ইত্যাদি উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই উগ্র জাতীয়বাদকে সমর্থন করেননি। এই উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর জীবনসমস্যা উদারতাকে মানববোধের পটভূমিকায় উত্থাপিত হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসটি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী উপন্যাস, এটি য়ুরোপের epic novel -এর সঙ্গে তুলনীয়। মহাকাব্যের মতোই বিশালও উপন্যাসের আকৃতি। একটা সমগ্র জাতির বিস্তৃত সঙ্কটের কাহিনি এর মূল বক্তব্য। কৃষ্ণদয়াল বাবুর সন্তান 'গোরা' প্রকৃতপক্ষে আইরিশ ছিল। ম্যুটিনির সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্মের পরই তার মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

কৃষ্ণদয়ালবাবু তাকে সন্তান বলেই সবার কাছে পরিচিতি করান। এই পরিবেশে সে শুধু একটি মাত্র জেনেছিল যে ভারত হিন্দুর দেশ, হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠাভাবে পালন করাই দেশের জন্য কাজ করা। তার চরিত্রের, দৃঢ়তা, প্রচণ্ড পৌরুষতা সকলকে তার প্রতি আকর্ষণ করত। সে হিন্দুই হোক, ব্রহ্মই হোক তার কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত।

এই উপন্যাসে যে বাস্তবনিষ্ঠা লক্ষ করা যায়, তা সমাজ চেতনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। গোরা ও সুচরিতার, বিনয় ও ললিতার বিবাহ ব্যাপার নিয়ে সংস্কারগত আচার-পদ্ধতি এবং স্ত্রী পুরুষের মৌন ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে যে বিরোধ স্বপ্রকাশ তাও বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজচেতনার পরিচায়ক। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) প্রকাশিত হয় সবুজ পত্রে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তারই সঙ্গে দাম্ভিক দেশপ্রেম বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ করে প্রচণ্ড লোভের মধ্যে সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়, তারই পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটি। উপন্যাসটি বৈশাখ থেকে ফাল্গুনের 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির সামাজিক পটভূমিও লক্ষণীয়। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাংলাদেশে যে দেশাত্মবোধ মুক্তিলাভ করেছিল এবং তাকে আশ্রয় করে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অনেক ফাঁকি ছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখে তা বিসদৃশ বলে ধরা পড়েছিল এবং তার তীব্র প্রতিবাদও করেছিলেন। দেশাত্মবোধ তাঁর চিন্তাধারাও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। দেশ সম্পর্কে মানবিক ধর্মে যে বিরোধ তার মনে দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপে রবীন্দ্র-চিত্তে মানবতার ধর্মই জয়ী হল। দেশধর্মের নামে কোনও সংকীর্ণতা, কোনও ক্ষুদ্র চিন্তা, নীচ কর্ম, কোনও মিথ্যাকেই তিনি আমল দিতে রাজী হলেন না। দেশধর্মকে তিনি মানবিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। বিংশ শতকের প্রথম পাদে কলকাতা এবং বাংলার অন্যান্য শহরগুলিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চ- মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল সামজিক আদর্শ। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির এই আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতর প্রকাশের মধ্যে যে বিরোধ বাংলাদেশের নগর-জীবনে একদিন দেখা গিয়েছিল, সেই বিরোধ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির নরনারীর দৈনন্দিন ব্যক্তি-জীবনে যে আবর্ত ঘনিয়ে তুলেছিল, তা-ই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উপজীব্য।

'গোরা' রচনার প্রায় ছয় বৎসর পর, ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন, চারটি গল্প পৃথক পৃথকভাবে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির নাম ছিল— 'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'। পরে চারটি গল্প একই সঙ্গে 'চতুরঙ্গ' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৫)। 'চতুরঙ্গে' শচীশ-দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়নের আবাস ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা শুধু মনোবিজ্ঞানের সাহায্য বিশ্লেষণ করা যায় না। ভারতবর্ষের আউল-বাউল-সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশে মতো মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী আধুনিক যুগের যুবক হলেও দীনানন্দ স্বামীর কাছে রসের দীক্ষা নিল রূপজগৎকে অরূপজগতের অঙ্গীভূত করে নিল। দামিনী আবার শচীশকে পার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে কামনা করে। এই মনোদ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ঘরে বাইরে (১৩২২) ইংরাজি ১৯১৬-তে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তারই সঙ্গে দাম্ভিক দেশপ্রেম, যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ করে প্রচণ্ড লোভের মধ্যে সমস্ত শুভপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়, তারই পটভূমিকায় লিখিত। একদা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, কিন্তু সমস্ত আন্দোলনটি যখন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের গূঢ় কলায় পর্যবসিত হল তখন তিনি সেই তামসিক মত্ততা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ, এই ত্রিভুজের কাহিনি মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাহায্যে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। চলিত ভাষায় প্রথম এই উপন্যাস লেখায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

নিখিলেশের শান্ত সংগত জীবনাদর্শ এবং বিমলার নিরদ্বিগ্ন পাতিব্রত্য হঠাৎ বাধা পেল স্বদেশ সেবী বলে পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, অবিনয়ী আবেগপ্রবণ সন্দীপ দেশসেবকের ছদ্মবেশে বিমলার শান্ত প্রথম মনটিকেও উত্তেজিত করে তুলেছিল। বিমলাও তাঁর আবেগে নিজেকে কিছুটা মিলিয়ে নিয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' বলে তার মন ভোলাতে চাইলেও আসলে সে নারী রূপকেই লালসার দৃষ্টিতে বন্দনা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্বামী নিখিলেশের ধৈর্য ও মহানুভবতায় বিমলা নিজের অবস্থাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করল এবং আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কয়েছিল স্বস্থানে। এই উপন্যাসে একদিকে বিমলার চরিত্রে দুই পুরুষের আকর্ষণ, আর একদিকে উগ্র স্বাদেশিকতার নগ্নমূর্তি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ লোভী স্বাদেশিকতার বীভৎস পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাস, চরিত্রদ্বন্দ্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণাম এবং নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এক যুগের বাঙালি-জীবনের লিপিচিত্র অঙ্কন করেছেন। তার পরবর্তী উপন্যাস 'যোগাযোগ' (১৩৩৪-৩৫)। প্রায় বার বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম এই উপন্যাসর নামকরণ হয়েছিল 'তিনপুরুষ'। বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম এর মুখ্য বিষয়। একদিকে কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজের স্নিগ্ধ মধুর আভিজাত্যমণ্ডিত প্রভাব, আর একদিকে স্থূল রুচির মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন— কুমুদিনীর জীবন যখন প্রায় ব্যর্থ হতে বসেছিল, ঠিক তখনই বিধাতা এক বিচিত্র উপায়ে এই রহস্যের সমাধান করে দিলেন। কুমুদিনী সন্তানসম্ভবা হয়েছিল। তাই উপন্যাসের গতি অন্যদিকে মোড় নিল। উপন্যাসটি পরবর্তীকালের রচনা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দাবী এতে পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি।

তার পরবর্তী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' (১৩৩৫ সাল)। 'শেষের কবিতা'য় বাংলাদেশের নগর সমাজের অবসরপুষ্ট উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির চারটি সুশিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধি সংস্কৃতি পরায়ণ নরনারীর প্রেম ও যৌবনের বিচিত্র লীলা ও রহস্য।

শেষের কবিতা-র গল্পবস্তু গড়ে উঠেছে অমিত ও লাবণ্যের মনের জটিল তন্ত্রজালকে আশ্রয় করে। তাদের সমস্যাই উপন্যাসের সমস্যা। প্রধান নায়ক ও নায়িকা তারাই।

শোভনলাল ও কেতকী মিত্র দুইটি পার্শ্ব চরিত্র। যদিও অমিত ও লাবণ্যর মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু কেতকী মিত্রের সঙ্গে এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িত হয়ে আছে অমিত, আর শোভন- লালের সঙ্গে হৃদয়ের এক কোণে একটি গ্রন্থি জড়িয়ে আছে লাবণ্যর। যে লাবণ্য নিজের অহংকারে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

শিলং-এ মোটরের ধাক্কা খেয়ে উপন্যাসের যেখানে সূত্রপাত, সেই সূত্রপাতের আগের পর্বটির অভিনয় স্থান অক্সফোর্ড সময় সাত বছর আগে। তখন সেখানে একদিন এক জুন মাসের জোৎস্নায় সমস্ত আকাশ কথা বলে উঠল। মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে অমিত রায় তার ভাব বিলাসী চিত্ত এক তরুনীর সুখের দিকে তাকিয়ে ধৈর্য হারাল। তারপর প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে তারা চলেছিল। কিন্তু কেতকী মিত্রের হাতে একদিন অমিত যে আংটি পরিয়েছিল, তা কেতকী মিত্রের কাছে বাস্তব হলেও অমিতের কাছে শুধু মুহূর্ততাই সত্য কিন্তু আংটি পরানো ব্যবসারটা একান্তই সাধারণ ছিল।

পরে অমিত ও লাবণ্যর পরিচয় শিলং পাহাড়ে, পরিচয় ক্রমে জমে উঠল আলাপে। লাবণ্যর হৃদয়ের ধাক্কা লাগল অমিতের মনে ও হৃদয়ে। বরফ গলে ঝরে পড়ল। এক নতুন অভিজ্ঞতায় লাবণ্যও অমিতকে নিজের কাছে টেনে নিল। অমিত নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল এবং যোগমায়া দেবীর কাছে লাবণ্যকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধবার প্রস্তাব উপস্থিত করল। অমিতের আহ্বানে লাবণ্যর মনও জেগে উঠেছিল। কিন্তু নাটকীয়ভাবে অমিত-লাবণ্য মিলন হল না। কারণ কেতকী মিত্র ফিরে এল আবার অমিতের জীবনে। সে অমিতকে ভালোবাসে। আর লাবণ্যও ফিরে গেল শোভনলালের কাছে। যে শোভনলাল একদিন প্রত্যাখিত হয়েছিল, সে সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার ঘুরেও লাবণ্যকে ভুলতে পারেনি। সুদীর্ঘ বছর সে অপেক্ষা করেছিল লাবণ্যর জন্য। লাবণ্যর অন্তরও কেঁদেছিল অমিতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে।

'শেষের কবিতা' বাংলাদেশের একান্ত সাম্প্রতিক-কালের যে-কোনো শ্রেণি বিশেষের নর-নারীর জটিল প্রেমলীলার এক অপূর্ব কাব্য।

তার পরবর্তী উপন্যাস 'দুই বোন' ১৩৩৯ সালের রচনা। বিচিত্রা মাসিপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি সোজাসুজি ত্রিভুজ প্রণয়ের। যে ত্রিভুজ প্রণয় প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত কবি ও লেখকের কল্পনাকে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে। শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা আর তার বোন উর্মি। এই উর্মিকে শশাঙ্ক তার জীবনে যখন কামনা করল, এবং উর্মিও যখন শশাঙ্কের জীবনে স্থান গ্রহণ করল। তখন শর্মিলা বোনের প্রতি হিংসায় নয়, বা নিজের অধিকার হারিয়ে যাবার ভরে নয়, শশাঙ্কের কাজের ক্ষতি যাতে না হয়, সে বিষয়ে ভেবেছিল। তাই সে উর্মিকে ডেকে তিরস্কার করেছিল; কিন্তু যখন যে দেখল সে উর্মি, শশাঙ্কের থেকে দূরে থাকলে শশাঙ্কের কাজের আরও বেশি ক্ষতি হয়, তখন সে উর্মিকে প্রশ্রয় দিতে লাগল। কারণ একদিকে উর্মি তার ছোটো-বোন আর তার স্বামীকে উর্মি অনেক বেশি আনন্দ দিতে পেরেছে। মরবার আগে তাই শর্মিলা বার বার বলেছিল যে সব করতে সে পেরেছে, কিন্তু স্বামীকে সে খুশি করতে পারেনি। কিন্তু উর্মির মধ্যে যে

নিজেকে দেখতে চেয়েছিল, তাও পারল না। শশাঙ্ক কিন্তু রুগ্‌ণ স্ত্রীর প্রতি উদাসীন, শর্মিলা কিন্তু উর্মিকে স্বামীর হাতেই দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে শর্মিলা সুস্থ হয়ে উঠল, উর্মি নিজের ভুল বুঝতে পেরে শর্মিলার সংসার থেকে যেতে চাইল। কিন্তু লোক নিন্দার ভয় কাটিয়ে শর্মিলা উর্মিকেও নিজেদের সঙ্গে রাখতে চেয়েছিল। অন্য কোনো স্থানে হলেও তারা চলে যাবে এই বলে। শশাঙ্ক নিজের স্থানে ফিয়ে এল। শর্মিলা চরিত্র অতি অসাধারণ চরিত্র, নারীত্ব, কল্যাণময়ী, ধৈর্যশীলা— এই হিসাবে অতি সহজেই পাঠকের শ্রদ্ধা ও করুণা লাভ করতে সক্ষম।

'দুই বোন'-এর কয়েক মাস পরই 'মালঞ্চ' রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪০-র চৈত্র মাসে। 'মালঞ্চ'-এর পটভূমিও প্রায় 'দুইবোন'-এর গল্পের মতো। আদিত্যর স্ত্রী নীরজা সন্তানহীন, কঠিন রোগে শয্যাগত। তারই সুযোগে ও আড়ালে স্বামী আদিত্য সরলার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রণয়লীলায় মেতেছিল। সরলা আদিত্যর দূর সম্পর্কের বোন। সরলা বৌদির সেবা করার জন্য আর তার বাগানের পরিচর্যা করতে তাদের সংসারে এসেছিল, কিন্তু সে আদিত্যর সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল নিজেকে। নীরজা সরলাকে ঈর্ষা করেছিল। সে ঈর্ষা স্বাভাবিক। দশ বছর ধরে সে স্বামীকে ভালোবেসেছিল পরবর্তীকালে দূর সম্পর্কীয় দেবর রমেনকে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে নীরজার মনকে শান্ত করবার জন্য। রমেনের উপদেশে নীরজা, সরলাকে গ্রহণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আদিত্য নীরজাকে কখনও বোঝার চেষ্টাই করেনি। সরলা শেষ পর্যন্ত জেলে গিয়েছিল।

তার পরবর্তী উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। অতীন্দ্র ও এলার ব্যর্থতার কথা উপন্যাসে চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর ঘটনা উপন্যাসের মতো পূর্ণ পঠিত নয়, কাহিনি ও উপকাহিনিগুলির মধ্যেও সংযম সংহতির অভাব বর্তমান, সন্ত্রাবাদীদের ষড়যন্ত্র। দেশসেবার নামে যে কোনো অপকর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিকূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। অতীন্দ্র ও এলা তথাকথিত দেশসেবার দেউলে নিজেদের মানবধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল, এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বড়ো আঘাত এসেছিল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও উগ্র জাতীয়তা কোনোটাকেই রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র-সংক্রান্ত চিত্রগুলিও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

২.৩.১ 'চোখের বালি' থেকে 'যোগাযোগ' পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীর অস্তিত্ব ভাবনার বিভিন্ন রূপরেখা

'চোখের বালি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি উপন্যাসের প্রচলিত ধর্ম ও প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। প্রায় পনেরো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'চোখেরবালি' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজ জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক সমস্যানিষ্ঠ

উপন্যাস। তার আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছিল প্রধানত ঘটনা নির্ভর; ঘটনার সুন্দর যথাযথ সমাবেশই ছিল উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 'চোখের বালি' উপন্যাসের আখ্যান ভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। চরিত্রগুলো পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে মনোবিশ্লেষণের দ্বারা। বিনোদিনীর চরিত্রই এই উপন্যাসের লক্ষণীয় নারী চরিত্র। প্রথমে সে বিহারীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। পরে মহেন্দ্রকে পেয়ে বিনাদিনী তার তৃষিত দেহ-মন মহেন্দ্রর হাতে সমর্পণ করেছিল। বিনোদিনী না পাওয়া প্রেমভালোবাসা মহেন্দ্র ও বিহারীর থেকে লাভ করতে চেয়েছিল। বিহারীর সবল একনিষ্ঠ চিত্ত বিনোদিনীকে আকর্ষণ করেছিল। আবার বিহারীর মনের নিভৃততম কোণে আশার প্রতি যে গোপন অনুরাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল তা-ই বিনোদিনীর ঈর্ষান্বিতে নতুন ইন্ধন দিয়ে তাকে আশা ও মহেন্দ্রের সর্বনাশ সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করেছে। এদিকে আশার সরল বিশ্বাস ও স্বভাবসিদ্ধ শিথিলতা মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে অবসর ও সুযোগ প্রদান করে বিপদকে ঘনীভূত করেছে। এইভাবে উপন্যাসটিতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'— এই উপন্যাসে দৈব বিপর্যয়ে রমেশ ও কমলা পরস্পরের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য প্রন্থি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাকে প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে ফেলা যায় না। আবার নলিনাক্ষ ও কমলার পুনর্মিলনের মধ্যেও দৈবের অঙ্গুলি সংকেত একটু বেশি রকম সুস্পষ্ট। হেমনলিনীর স্থানই এই উপন্যাসে সর্বোচ্চ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে যে জাতীয় নায়িকার সঙ্গে পরিচয় হয়, যেন নলিনীই সেই সপরিচিত type এর প্রথম উদাহরণ।

কমলা চরিত্রও খুব জীবন্ত। তার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ রমেশের দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহজনক ব্যবহারে প্রতিহত হয়ে স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির আকারে রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রণালীতে প্রবাহিত হয়েছে।

চতুরঙ্গ—চতুরঙ্গ উপন্যাসে মূল নারী চরিত্র দামিনী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বস্তুঘনিষ্ঠ মানব-সংসারের সুবিস্তীর্ণ প্রসারতা নেই, তার উত্থানপতন, শান্তি সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব আলোড়নের বিচিত্র ও বহুমুখী পরিচয় নেই, মানবজীবনের একটি প্রধান চিত্তবৃত্তি প্রেম, একটি বিশেষ কালের একটি বিশেষ জীবনাদর্শের বিশেষ কয়েকটি আবেষ্টনের বিচিত্র বিরোধী সংস্থানের মধ্যে সেই প্রেমের রূপ ও লীলা কত গূঢ় কত বিচিত্র বর্ণময়, কত রহস্যময় হতে পারে, তিনটি মানুষের কর্মকৃতির মধ্যে কত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, তারই মনন-কল্পনা নিয়ে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস।

ঘরে বাইরে— 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হল সন্দীপ ও বিমলার পরস্পর আকর্ষণ। এই ব্যাপারটি গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। সন্দীপের চরিত্রে লেখক শেষ পর্যন্ত একটা মহত্ব ও গভীরের সুর সুপ্ত হতে দেননি। সে নিখিলেশের সম্মুখে বিমলাকে প্রণয়নীরূপে আহ্বান করেছে, কোনো সংকচ তার নির্ভীক স্পষ্টবাদীত্বের ও অরাজকতামূলক মনোবৃত্তি কুণ্ঠাবোধ করেনি। বিমলার প্রেমকে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটা স্তরে সে অনুভব করে হৃদয়ের চিরন্তন

অধিকার রূপে গ্রহণ করেছে।

বিমলার মনোবিকারের চিত্রও খুব স্বাভাবিকভাবে বিবৃত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতিজ্ঞানের সঙ্গে সন্দীপের জ্বালাময় প্রচণ্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির তুলনা করে সে তার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষোচিত দুর্বলতা বলে ভ্রম করেছে। তারপর ক্রমশ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে তার মোহাবেশ ঘনিয়ে তুলেছে, একটা দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী যে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ নৈতিক মাপকাঠির অধীন নয়, তার বৃহৎ প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন নৈতিক আদর্শ খাড়া করতে তবে, শাস্ত্রের অনুশাসন ও স্বামিপ্রেম যে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না— ইত্যাদিরূপ যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে বিমলার উপর নিজ প্রভাব বদ্ধমূল করে নিয়েছে। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন সে সন্দীপের উদ্দীপ্ত কামনার অনলে নিজেকে পতঙ্গবৎ আহুতি দিতে উন্মুখ হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্দীপেরও মনে হিতাহিত জ্ঞানের বিষ প্রবেশ করেছে। এই নবজাত ধর্মজ্ঞানের প্রভাবে তার প্রণয়াভিযান দ্বিধা-দুর্বল ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত হয়েছে। সে বিমলাকে একেবারে চরম অধিকারের অন্তঃপুরে না এনে ভাবাবেশ লীলার অশোকবনে, চরিতার্থতার মধ্যপথে রেখে দিয়েছে। আসলে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নারী মনের যে মনস্তত্ব সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিমলার মনের টানাপোড়েনে। বিমলার একদিকে স্বামী নিখিলেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যদিকে সন্দীপের প্রতি প্রেমের তীব্রতা তাকে মানসিকভাবে পীড়িত করছিল। পরে ধীরে ধীরে সেই মোহমুক্ত হয়।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সমৃদ্ধ চরিত্র হচ্ছে সন্দীপ ও বিমলা। বিমলা সর্বাপেক্ষ জীবন্ত চরিত্র। সে যে পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে সেখানে দাম্পত্য-রাজ্যে স্বামীই একমাত্র পুরুষ। নিখিলেশ তাকে যে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে পেতে চেয়েছিল তার কোনও প্রয়োজনীয়তা বিমলার ছিল না, স্বামীর সেই আদর্শ সে বুজতে পেরেছিল কিনা তাতেও সন্দেহ করা চলে। স্বামীর যে অজস্র ভালোবাসা সে পেয়েছিল তার জন্য তাকে কোনও মূল্য দিতে হয়নি। কিন্তু নিখিলেশের বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন অন্দরমহলে এসে পৌঁছল, তখন সেই ঢেউয়ে বিমলা একেবারে ঘরের বাইরে সন্দীপের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সন্দীপ তখন দেশমাতৃকার সেবক। সেই সেবকের কাছে কী করে ধীরে ধীরে সে নিজেকে ধরা দিল, কী করে সে নিজের স্বামীকে সন্দীপের সঙ্গে তুলনায় দুর্বল মনে করল, কী করে সন্দীপের প্রতি মোহ-বিহ্বলতায় ধীরে ধীরে নিখিলেশ থেকে দূরে সরে গেল, এবং অবশেষে সন্দীপের কামনার মধ্যে ধরা দিতে উদ্যত হল এই সমস্ত গল্পের স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

যোগাযোগ — যোগাযোগ উপন্যাসে মুকুন্দলাল ও তার স্ত্রীর ট্র্যাজিক সম্বন্ধ স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গল্প, সেই গল্পটি এই দীর্ঘায়ত ভূমিকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর স্নেহপ্রীতি মধুর সম্বন্ধের বুনিয়াদটুকু এই ভূমিকার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু

তা এখানে এতোটা বিস্তৃত না হলেও তাদের সম্বন্ধে সত্য পরিচয় কঠিন হতো না। তাছাড়া কুমুদিনী মধুসূদনের ঘর ছাড়িয়ে পিতৃগৃহে চলে আসার পর সুদীর্ঘ পৃষ্ঠা জুড়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্ত্রীর অধিকার নিয়ে যে তর্কজাল বিস্তৃত হয় তাও গল্পবস্তুর দিক হতে কতকটা অবান্তর। তৃতীয়ত, কুমুদিনী যখন অন্তঃসত্বা অবস্থায় ফিরে এলো তখনও মধুসূদন শ্যামার স্থূল দেহমাংসের পঙ্কিলতার মুখে নিমজ্জিত। মধুসূদন কুমুদিনীকে ডেকে এনেছে যেহেতু সে গর্ভে ধারণ করে আছে ভাবী বংশধর এবং কুমুদিনীকেও তা স্বীকার করে আসতে হয়েছে।

২.৩.২ 'গোরা' পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয় এবং শিল্পমূল্য

'গোরা' রচনার প্রায় ছয় বৎসর পর ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন, এই চার মাসে চারটি গল্প পৃথক পৃথকভাবে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির নাম ছিল— 'জ্যাটামশায়', 'শচীন', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'। পরবর্তীকালে একসঙ্গে গল্পগুলি 'চতুরঙ্গ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। ঘরে বাইরে, যোগাযোগ (১৩৩৪-৩৫), শেষের কবিতা, দুইবোন (১৩৩৯), মালঞ্চ (১৩৪০), চার অধ্যায় (১৩৪১) (পূর্বে আলোচিত) চতুরঙ্গ আর শেষের কবিতা জাতীয় উপন্যাসগুলি প্রধানত বুদ্ধিপ্রধান, এদের রসোপলব্ধি যুদ্ধিসাধ্য। সহজ সংস্কার থেকে অথবা ভাবাবেগ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসারিত হয়, সে আনন্দ আহরণ এই উপন্যাসগুলি থেকে আশা করা অন্যায়। বস্তুত, কবি কল্পনার ঐশ্বর্যই এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে সাহিত্যমূল্য দান করেছে। ভাব-কল্পনায় ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে, বিষয় বিন্যাসে, সর্বোপরি, জীবন সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে একেবারেই পৃথক।

আসলে 'গোরা'র পরে রবীন্দ্র-উপন্যাস এক নতুন বাঁক নিয়েছিল। 'গোরা'র নিটোল গঠন সৌষ্ঠবও সর্বাঙ্গীন জীবনসমীক্ষা আর রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতময় সৃষ্টি-ধর্মের নিকট রুচিকর মনে হল না। তিনি উপন্যাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তখন তিনি তাঁর কবিস্বভাবের নির্দেশে জীবনকাহিনির ব্যঞ্জনাগর্ভ। রূপকাশ্রয়ী তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে মনোনিবেশ করলেন। সমতল আখ্যান অপেক্ষা বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিশেষ অর্থবহ খণ্ডাংশ সমূহের সমাবেশে জীবনের যে তির্যক রূপটি ফুটে ওঠে, তাই তাঁর কাছে গূরুতর তাৎপর্যদ্যোতনার আধাররূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সাধারণত উপন্যাসে যে বিষয় বর্ণিত হয়, তার মধ্যে এক অখণ্ড সম্পূর্ণতার আভাস থাকে। একটি পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি পাঠকের মনে গভীর পরিচয়ের ভাবমুদ্রিত করে দেয়। জীবনের খণ্ডাংশ উপন্যাসের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্য দিয়ে সমগ্রভাবে পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু 'গোরা' পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে সেই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হয়েছে তা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নয়, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত

বিদ্যুৎদীপ্তিতে। শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের অনির্দিষ্ট সম্পর্কটি বিমলা-সন্দীপের মোহবিবল আকর্ষণ, অমিত লাবণ্যের দূর দিগন্তের নীলমায়াস্পৃষ্ট, রহস্যময়, চির-অতৃপ্ত প্রেম, মধুসূদন-কুমুদিনীর বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব— এদের সবার মধ্যেই ঘন তথ্য সন্নিবেশ ও মন্থরগতি বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঈষৎ প্রকাশিত সম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত আছে।

'গোরা' পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে চরিত্র বিকাশ পাঠকের বোধ ও বুদ্ধির গোচর হয় বিস্তারিত ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে এই দুই-ই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তথ্য সন্নিবেশ বিরল এবং যতটুকু আছে তার অসম্পূর্ণ, মনোবিশ্লেষণও দীর্ঘায়ত নয়, এবং তার বিভিন্ন স্তর সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়নি। ঘটনা অথবা মনোবিশ্লেষণের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা আপাতদৃষ্টিতে ধরাও পড়ে না। তার আবিষ্কার নির্ভর করে পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনার উপর। অনেক ঘটনার গ্রন্থি আপাতদৃষ্টিতে শিথিল ও আকস্মিক। যেমন দামিনী ও কিটীর সব কথা উপন্যাসে বলা হয়নি, কিন্তু একটি স্থানে স্বল্প কথায় চকিত ঘটনার উপর যে ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বিদ্যুৎমকের মতো দীপ্তিমান, সে ইঙ্গিত যার চোখ এড়িয়ে যাবে সে কিছুতেই দামিনী অথবা কিটীকে বুঝবে না। সেজন্য, অল্প সংকেত, ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতই এই পর্বের উপন্যাসগুলির ধর্ম।

কবিকল্পনার ঐশ্বর্যই এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে তাদের সাহিত্যমূল্য দান করেছে। এই পর্বের উপন্যাসগুলি বুদ্ধিপ্রধান। এগুলির রস ও রহস্য প্রধানত বুদ্ধিগম্য। তথ্য সন্নিবেশই হোক আর চরিত্রই হোক সমস্তই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। এই উপন্যাসগুলির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২.৪ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা সাহিত্য সর্বপ্রথম শিল্প-সার্থক ছোটোগল্পের সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই কথাটি সর্বজন বিদিত। ছোটোগল্প যদিও বাংলাতে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্য প্রকৃত ছোটোগল্পকার হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকেই বুঝি।

ছোটোগল্পের জন্ম হয়েছিল অন্যান্য সাহিত্যের বিভাগের মতো বিদেশে। "It is a peculira product of 19th century." ছোটোগল্প আর পাঁচটা গল্পের মতো শুধু আখ্যান সর্বস্ব ব্যাপার নয়। সংহত পরিধিতে বাহুল্য বর্জিত ভাবে মানুষের জীবন সম্বন্ধে কোনো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাপারের ওপর আলোক নিক্ষেপ করা। এটাই ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষণ। তাই ছোটোগল্পে নাটকীয়তা, গীতমূর্চ্ছনা, আকস্মিকতা, ও ব্যঞ্জনা বর্তমান।

বাংলাদেশে অনেক গল্প-আখ্যান প্রচলিত ছিল, যদিও রবীন্দ্রনাথই যথার্থ ছোটোগল্পের জীবনদান করেছিলেন। তাঁর আগে সঞ্জীবচন্দ্রের দুই-একটি গল্পে ছোটোগল্পের লক্ষণ ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য লেখকেরা ছোটোগল্প সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

যখন তিনি 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাহিত্য-সম্পাদকরূপে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রতিসংখ্যায় একটি করে ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। পদ্মাতীরে জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার অবকাশে তিনি বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে পরিচিত হলেন, বাস্তব মানুষের বাস্তব সুখ-দুঃখের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। দ্বন্দ্ব কলহ, মামলা-মোকদ্দমা, ত্যাগ-ভোগ, নীচতা-স্বার্থপরতা, স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতির সংমিশ্রণে পল্লী-বাংলায় যে জীবন গড়ে উঠেছে তাকেই তিনি গল্পে ফোটাতে উৎসাহী হলেন। তিনি একটি কবিতায় ছোটোগল্পের সংজ্ঞা সম্পর্কে অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

" ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু' চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

এই মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তিনি বহু ছোটোগল্প রচনা করেন। যার অনেকগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পসমূহ তাঁর 'গল্পগুচ্ছের' তিনটি খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। ছোটোগল্পগুলি শিল্পলক্ষণ বিচারে যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি বাঙালির গ্রামীন ও নাগরিক চিত্র হিসাবেও তার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র বাঙালি-জীবনে তাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালি-জীবনের আধারে এর মধ্যে চিরকালের মানুষের সুখ-দুঃখ স্থান পেয়েছে, তাই বিদেশে এর অনেক সমাদর আছে।

তাঁর ছোটোগল্পে মানুষ, প্রকৃতি এবং রহস্যলোকের অতিপ্রাকৃত ভাবের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের নানা দাবি, একাত্মবর্তী পরিবারের ভাঙনধরা দশা, পারিবারিক বিরোধ, স্নেহ-প্রেমের সংঘাত ও সঙ্কট, নানাধরনের ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ, পরিশেষে ছোটো-বড়ো কাহিনির মধ্য দিয়ে তিনি গোটা বাঙালি-জীবনেকে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও পারিবারিক গল্পগুলিতে সমাজ ও জীবনের যে বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত প্রায় প্রত্যেকটি ছোটোগল্পে। যে কয়েকটি প্রেমের গল্প তিনি লিখিছেন তার মধ্যে প্রেম, সৌন্দর্য ও কল্পনার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। যেমন — একরাত্রি, দুরাশা, শেষের রাত্রি, মধ্যবর্তনী প্রভৃতি। দৌনন্দিন জীবনকে

কেন্দ্র করে রচিত তাঁর গল্পগুলি তাঁর উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গৃহীত হয়েছে। পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, রাসমণির ছেলে, ছুটি, দিদি, ঠাকুরদা প্রভৃতি গল্পে স্নেহপ্রেমের পারিবারিক রূপ ফুটে উঠেছে। নষ্টনীড়ে চারু ও অমলের বিচিত্র সম্পর্ক এবং তার পরিণামটি লেখক নিপুণ বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর লেখা কয়েকটি গল্পে শহরে ও গল্পগ্রামের উভয়ই সামাজিক কু-প্রথার প্রতি প্রতিবাদ। এই উদ্দেশ্যপ্রধান গল্পগুলি আর্টের দিক থেকে তেমন উন্নত নয়। 'দেনাপাওনা' (১২৯৮) ও 'ত্যাগ' (১২৯৯) এরপর সমাজ-সমালোচনার দৃষ্টান্ত।

তাঁর কয়েকটি গল্পে গীতিকবিতা ও রহস্য-রসের সমন্বয়ে জড়প্রকৃতির একটি চমৎকার মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় যোগাযোগও অপূর্ব ব্যঞ্জনার আকারে নির্দিষ্ট হয়েছে।

'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পে উদার বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কাহিনিগুলি নিটোল গীতিকবিতার আকারেই ফুটে উঠেছে। অতিপ্রাকৃত গল্প ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা ইত্যাদি গল্প সাধারণ ভৌতিক সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলি ঠিক ভূতের গল্প নয়। ভৌতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের অপার রহস্য, জীবনের অশরীরী ব্যঞ্জনা প্রভৃতি এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, এতে প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের ভেদ যুক্ত হয়ে যায়। বিশ্বের উৎকৃষ্ট অতি প্রাকৃত গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পগুলি স্থান করতে সক্ষম হয়েছে।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত গল্পে আধুনিক জীবনের সমস্যার অবতাড়না করেছেন — যেমন রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি। এই গল্পগুলিকে আধুনিক জীবনের নানা ব্যক্তিগত সমস্যার অবতারণা করে, বর্তমান সমাজ সংসারের প্রতি সজীব কৌতূহলেই পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটোগল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে টলস্টয়, মোপাসাঁ, চেকভের সমকক্ষ বলেই মানা হয়। অবশ্য টলস্টয়ের কোনো কোনো গল্পে অনাবশ্যক খ্রিস্টানী নীতিতত্ত্বের বাড়াবাড়ি রয়েছে। মোপাসা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পকার হলেও আদিরসের উল্লাসের দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে তাঁর ছোটোগল্প সেরকম উৎসর্গ হয়ে উঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে টলস্টয়সুলভ কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের ইঙ্গিত ছিল না, তাছাড়া মোপাসাঁর মতো মানুষকে তিনি শুধু একটা দেহধারী জন্তু ভাবতে পারেননি। মানুষের গভীর সত্ত্বার স্বরূপ তাঁর লেখার মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বিদেশী সাহিত্যের ছোটোগল্পকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক এক ভাবধারায় লিখেছিলেন ছোটোগল্প। তাই তাঁর লেখা ছোটোগল্প শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

২.৪.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ছোটো গল্পকার। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর লেখা দুই-একটি ছোটোগল্পে হাস্যরসের প্রাচুর্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জ্ঞান-গভীর কথা, সূক্ষ্ম পরিবর্তন রহস্যময় শূত্রগুলিরই আলোচনা হয়েছে।

সামাজিক জীবনের বদ্ধ গলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বইয়ে দিয়েছেন তা সহজ এবং ফলপ্রদ বা তাঁর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রধানত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণ দীপ্তি এনে দিয়েছেন। (১) প্রেম (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্ক বৈচিত্র্য (৩) প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ, (৪) অতি প্রাকৃতের স্পর্শ। উপরিউক্ত বিষয়গুলির বিষয়ে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রেমই মানব জাতির জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রেমেই সাধারণ জীবনে একটা বিপুল শক্তিকে, প্রবল, ধ্বংসকারী ও দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সঞ্চার করে তাকে রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করে তোলে। তুচ্ছতম জীবনের ওপরে একটা বৃহৎ ব্যাখ্যা ও বিস্তার এনে দেয়। প্রেমের উন্মাদনা জীবনকে তার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে টেনে এনে বাইরের বিশ্বজগতের সঙ্গে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করে, হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল আবেগকে, সুপ্ত কল্পনাগুলিকে মুক্তি দিয়ে মানব-মনের অলক্ষিতে পরিবর্তন করে এক অনির্বচনীয় রমনীয়তার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, তাই প্রেমের এই দুর্বার শক্তিকে কবি ও উপন্যাসিক দুই এর দৃষ্টি দিয়েই তাঁর ছোটোগল্পগুলিকে প্রেমের বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করে তুলেছেন।

যে সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান কতগুলি বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে— 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক ও শেষের রাত্রি।

এগুলির মধ্যে কতগুলি প্রধানত কবিত্বময় গীতিকাব্যের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। মনবিশ্লেষণ গল্পকারের প্রধান কর্তব্য, কিন্তু এগুলিতে তার পরিচয় নেই। 'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, তা কেবল প্রলয়-দুর্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটিয়ে তুলেছে। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতে গিরিবালার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য ও তার অতৃপ্ত যৌবন-চঞ্চল রক্তলহরীর উপর রঙ্গমঞ্চের যাদুময় প্রভাব বর্ণনাতে— তাঁর গল্পের বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। 'দুরাশা' গল্পটিতে সামান্য একটু মনস্তত্বের স্পর্শ ও ঘটনা-বৈচিত্র্য থাকলেও, আসলে এটা প্রেমের কাহিনি 'অধ্যাপক' গল্পটির অনেকগুলি দিকের মধ্যে একটি দিক হল ব্যঙ্গ বিদ্রুপর দিক। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতের মধ্যে যে বিদ্রুপ রসটি আছে তা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু এর

প্রধান বাণীটি প্রেমের বাণী।

কতগুলি গল্পের মধ্যে কবির সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের আশ্চর্য মিলন সাধিত হয়েছে। 'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত বন্য মৃন্ময়ীর অভাবনীয় আমূল পরিবর্তন ও অদৃশ্য প্রভাবে তার বালসুলভ চঞ্চলতা নিমেষমধ্যে রমণী প্রকৃতির স্নিগ্ধ সজল গাম্ভীর্যে পরিণত হয়েছে, তার চিত্রটি কবিত্বপূর্ণ ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও সার্থক। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম সৌরভের ন্যায় নারী হৃদয়ের অনুপম সংযত মাধুর্যে পরিপূর্ণ রমণীর কোমলতা যেন স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মতো সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিস্ফোরণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কী করে তিনটি নিতান্ত সাধারণ, যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্চেদ্য জটিলতা এনে দিয়েছে, তারই কাহিনি এর বিষয়। জীবনের নিতান্ত বাঁধা-ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছে।

সমাপ্তি, দৃষ্টিদান ও মধ্যবর্তিনী-র সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত সম্পূর্ণতা তাদের নেই। কিন্তু এগুলিতেও, কোথাও বা একটু চরিত্র-সৃষ্টি, কোথাও বা একটু অপরূপ প্রকৃতি বর্ণনা কোথাও বা মানব জীবন সম্বন্ধে একটু গভীর মন্তব্য তাদের উপর একটি অনন্য-সাধারণ বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজঃপূর্ণ চরিত্রটি, অবগুণ্ঠের অন্তরালে, সুদূর রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই চরিত্রটি কেবল সাধারণ বর্ণনার দ্বারাই অঙ্কিত হয়েছে, কার্যে বা ব্যবহারে পরিস্ফুট করে তোলা হয় নাই।

'মাল্যদান' গল্পটিতে হরিণ শিশুর ন্যায় উদার, সরল লৌকিক বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জা-কুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে লেখক বেদনা রহস্যমণ্ডিত মানব হৃদয়ের সঙ্গে স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ নির্ঝরস্নাত ইতর প্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ তুলনা করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে মানবজীবন অত্যন্ত যন্ত্রবদ্ধ সামাজিক-জীবন, সেখানে সবারই একটি বিশেষ সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, যেখানে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ সেখানে মাঝে মাঝে একটি বিচিত্র অপ্রত্যাশিত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে রোমাঞ্চের সূত্রপাত করে; পারিবারিক জীবনে সাধারণত যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তার ব্যতিক্রম ঘটলেই সেখানে ক্ষুদ্র বিপর্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতে নির্জন পল্লী-জীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারাপাতের মধ্যে প্রবাসী পোস্টমাস্টারের সঙ্গে অযথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহ-সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, পারিবারিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাকে ধরে রাখবার উপায় ছিল না বলে তার এত করুণ আবেদন চোখে পড়ে।

'ব্যবধান' গল্পটিতে বনমালী-হিমাংশুমালীর মধ্যে ভালোবাসাটি পারিবারিক

বিরোধও প্রতিকূলতার প্রতিবেশে একটি শীর্ণ-কুণ্ঠিত বেদনার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

'কাবুলিওয়ালা'তে এই স্নেহ-বন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙঘন করে এক রুক্ষদর্শন, পুরুষমূর্তি বিদেশীর সঙ্গে বাঙালি ঘরের একটি ছোটো মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করেছে।

'দান প্রতিদান'-এ শশিভূষণ-রাধাকুন্দের নিঃসম্পর্ক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে একটা নীরব অনুযোগ ও রুদ্ধ পরিমানের স্পর্শ একটা ক্ষুদ্র চূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে যা সহোদর ভ্রাতার সহজ সম্পর্ক প্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না।

'মাস্টার মশায়' গল্পটিতে মাস্টার হরলাল এ ছাত্র বেণুগোপালের মধ্যে একটা নিবিড় স্নেহবন্ধনীই হরলালের জীবনটিকে ট্রাজেডিতে পরিণত করেছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণের সঙ্গে গিরিবালার সম্পর্কটিও এই মধুর অনিশ্চয়ের ম্লান ছায়া মণ্ডিত।

'কর্মফল' গল্পটিকে একদিকে পিতার কঠোর শাসন ও অন্যদিকে মাসির অস্বাভাবিক ও স্থায়ী স্নেহাতিশয্য সতীশের জীবনের সমস্ত দুর্দৈব সৃষ্টি করেছে।

এই পর্যায়রে গল্পের মধ্যে 'দিদি' গল্পটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ছোটো ভাইকে নিয়ে শশিমুখীর স্বামীর সঙ্গে যে নীরব দ্বন্দ্বের গোপন ঘাত-প্রতিঘাত চলছে তা ঘটনাচক্রে একেবারে বিরোধের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছিল।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পটিতে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। কতকগুলি গল্পে সমাজের কলঙ্ক, বিবাহের পর অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন— দেনাপাওনা, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, হৈমন্ত ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক রোমাঞ্চসৃষ্টির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি ঔপন্যাসিকের সহায়ক বিধানে অগ্রসর হয়েছে।

'সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সঙ্গে মৌন বিরাট প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয়ে আগাগোড়া পরিপূর্ণ।

'অতিথি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। 'তারাপদ' লেখকের এক অদ্ভুত ও অনন্য সৃষ্টি। এই প্রবহমান, চিরচঞ্চল পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে তার এক আশ্চর্য সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা আছে। মানুষের এই অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নেই বলেই তার ভালোবাসার মধ্যে এখন একটা প্রবল মোহ ও সংকীর্ণ আসক্তি দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তারাপদর চরিত্রে প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না, সর্বসাধারণের স্বাধীন অনুভূতিই

তার রসোপলব্ধি ধরতে পারে।

তারাপদর সঙ্গে 'আপদ' গল্পের নীলকণ্ঠের অবস্থাগত কতগুলি সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তারাপদ চরিত্রের গূঢ় মাধুর্য ও পবিত্রতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চতুর্থ পর্যায়ের গল্পগুলিতে সাধারণ বাঙালি জীবনের সঙ্গে অতি প্রাকৃতের সংযোগসাধন একদিক দিয়ে বিশেষ সহজ, অন্যদিকে বিশেষ আয়াসসাধ্য। আমাদের মধ্যে এখনও কতগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীবভাবে বর্তমান আছে, যাদের অতি-প্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্যদিকে আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-বিরল যে এর মধ্যে মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ের দ্বারা অতি-প্রাকৃতের অবতারণা নিতান্তই দুরূহ। সম্পত্তি সমর্পণ, গুপ্তধন প্রভৃতি কয়েকটি গল্প মানুষের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কলাকুশলতার পরিচয় নেই। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পের যে প্রতিবন্ধকতা তিনি আশ্চর্য কল্পনা সমৃদ্ধির সহায়তায় অতিক্রম করেছেন। নিশীথে, ক্ষুধিতপাষাণ ও মনিহারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। 'নিশীথে' গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত প্রথম স্ত্রীর প্রতি অপরাধ হেতু যে গুরুভাবগ্রস্ত স্বামীর সাময়িক মনোবিকার থেকে উদ্ভুত। 'মণিহারা' সদ্য পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনি।

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বাদশাহী যুগের সমস্ত ঐশ্বর্য দীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তর সঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস তাদের ইন্দ্রজাল বর্ষণ করিছে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি বর্তমানের নারীর অধিকার ঘটিত আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তিস্থল। লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর যে বিদ্রোহিনী রূপ ও বাণী রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়ে ফুটিয়েছেন।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটিও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ, কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁজের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তা স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের কাপুরুষোচিত আস্ফালন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মন্তব্যগুলি ভাব-গভীরতার অভাব পূরণ করে— যেখানে তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেন না, সেখানেও তাঁর বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতায় চমৎকৃত করে থাকেন।

'পয়লা নম্বর' প্রধানত অদ্বৈতাচরণের individiality বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি— তাঁর নিশ্চিন্ত ও একাগ্র জ্ঞানানুশীলনের পশ্চাতে যে একটি ক্ষুব্ধ নারী-হৃদয় নীরব বিদ্রোহে প্রধূমিত হয়েছিল, তিনি সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ ও উদাসীন। অনিলা বরাবরই অন্তরালে রয়ে গেছে— তার পক্ষের কথা ভাল করে বোঝানো হয়নি। অদ্বৈতাচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি সিতাংশুমৌলির; সে নিজ সহজ ক্ষমতা-বলে পরকে নিজের কাছে টানতে পারে। ঐশ্বর্যপ্রাচুর্যই তার একমাত্র আকর্ষণ নয়। এই সহজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের বলে সে অনিলারও চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছে। অনিলার নিকট কোনো সাড়া পায়নি, কিন্তু তার নিশ্চল শান্তিকে বিচলিত করে তাকে গৃহছাড়া

করেছে। এই গল্পটিতে দাম্পত্য-সম্পর্কের বিশ্লেষণ-চেষ্টা থাকলেও মোটের উপর তা বিপরীতপ্রকৃতি ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্রচিত্রণ।

'নামঞ্জুর' গল্পে 'ঘরে বাইরে'র ন্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদের ফাঁকা দিক্‌টা দেখানো হয়েছে; বিশেষত স্ত্রীজাতির পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার মধ্যে যে খ্যাতির লোভ প্রচ্ছন্ন আছে, তা তাদের সাংসারিক ছোটোখাটো স্নেহযত্নমণ্ডিত কাজের প্রতি বিমনা করে তাদের স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও মাধর্যের হানি করে থাকে। মিটিং করে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ও গৃহে রুগ্‌ণ ভ্রাতার সেবায় অবহেলা—এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট ফাঁকির ব্যবধান আছে তাহা আমাদের সাধারণ আন্দোলনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

এই শেষের কয়েকটি গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লেখা 'তিন সঙ্গী' গ্রন্থে (১৯৪০) তিনটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে, রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরী অতি আধুনিক যুগের জীবন পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিভাগে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেছি। প্রথমে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের নিয়মানুগ নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। তারপর আমরা আলোচনা করেছি রবীন্দ্র-উপন্যাসের সাধারণ পরিচয় ও নারীর অস্তিত্ব-ভাবনার রূপরেখা। সবশেষে রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে।

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। রবীন্দ্রনাথের নিয়মানুগ নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৩। রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারাবাহিক পরিচয় ও তার বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৪। রবীন্দ্র-উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার করুন।

৫। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারীর অস্তিত্ব ভাবনার বিভিন্ন রূপরেখা আলোচনা করুন।

৬। রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের ধারা ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

২.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়

২। রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা : বারিদবরণ ঘোষ

৩। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৪। রবীন্দ্র-উপন্যাস পরিক্রমা : অর্চনা মজুমদার

৫। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : প্রথমনাথ বিশী

* * *

বিভাগ-৩

বলাকা

বলকা : সাধারণ পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)
৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৩.২ রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকা'
৩.৩ 'বলাকা' রচনার প্রেক্ষাপট
৩.৪ বলাকা : গ্রন্থ-পরিচয়
৩.৫ বলাকা : নামকরণ ও বিষয়ভাবনা
৩.৬ 'বলাকা' ও যুদ্ধের বার্তা
৩.৭ বলাকা : ঈশ্বর-চেতনা ও মানব-চেতনা
৩.৮ 'বলাকা' কাব্যের ছন্দ
৩.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৩.১১ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

'বলাকা' পর্বে তাঁর কাব্যধারা এক বিশেষ অধ্যায়ে উপনীত। 'বলাকা'- পূর্ববর্তী সময়ে কবি যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এখানে তা থেকে মুক্তি ঠিক নয়, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে ঈশ্বর এক নূতন মাত্রায় ব্যক্ত। একইসঙ্গে এই পর্বে এসেছে ইউরোপীয় জীবনের সংঘাত ও যুদ্ধ, যৌবন-বন্দনা, এসেছে গতিচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা, দর্শনচেতনা। একই বক্তব্য একাধিক কবিতায় যেমন ঘুরেফিরে এসেছে তেমনি একই কবিতায় একাধিক ভাব-বৈচিত্র্যও প্রকাশ পেয়েছে। সবদিক থেকে 'বলাকা' কাব্য বক্তব্য ও আঙ্গিকগত দিক থেকে অ-পূর্ব অভিনবত্বের প্রকাশক। সেই অভিনবত্ব কীভাবে বিভিন্ন কবিতায় ধরা পড়েছে পরবর্তী আলোচনায় তা তুলে ধরা হল। দেখা যাবে এখানে কবির যুগসচেতনতা, রাষ্ট্রসচেতনতা ও সমাজচেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ভারতীয় সমাজের অতীতের মধ্যে আত্মগোপন-ঈপ্সাকে স্বীকার করতে পারেননি, আবার ইউরোপের রাষ্ট্রবাদ তাঁর মনে গভীর অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি যৌবনের জয়গান গেয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন এক নূতন সকাল আসবে। তাই এগিয়ে চলাই হয়েছে 'বলাকা' পর্বের মূলমন্ত্র। প্রাচ্যের উপনিষদিক চিন্তা আর পাশ্চাত্যের গতির ধারণা কবিচেতনায় একাকার হয়ে গেছে।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় তাঁর কবি-জীবনের দিক্-পরিবর্তনের ইঙ্গিতও সহজেই ধরা পড়ে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্বে কবি বহির্বিশ্বকে আপন হৃদয়ে প্রতিফলিত করেছেন। 'মানসী' থেকে 'চিত্রা' ক্রমে তাঁর মনে স্থান করে নিয়েছে বাস্তব-চেতনা। এরপর থেকে কবি কখনও তত্ত্বকথা, কখনও স্বদেশী চিন্তা, কখনও ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ করেছেন পরবর্তী কাব্য গ্রন্থসমূহে। এই ধারা চলেছে 'চৈতালি' থেকে 'উৎসর্গ' পর্যন্ত। 'খেয়া' থেকে 'গীতালি' কবি এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যসত্তার সঙ্গে যেন লীলায় মেতেছেন। এরপরেই 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের ধরণ কিছু বদ্‌লে দিয়েছে। কীভাবে সেই পালাবদল ঘটে যায়, এখানে কোন্ তত্ত্ব কাজ করেছে, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনই বা কীরূপে ধরা পড়েছে, ভাব ও ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থের যে স্বাতন্ত্র্য নির্মিত হয়েছে সেসব উপলব্ধি করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.২ রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকা'

রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙালির কবি নন, তিনি ভারতবর্ষের কবি। সমগ্র দেশের সর্বকালের সৎ ও আনন্দ চিন্তা তাঁর বাণীতে প্রকাশিত। তাই তিনি "কবীনাং কবিতমঃ"। এহেন কবির কাব্যভাবনা তাঁর কবিমানসের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সেই ধারায় বেশ কয়েকটি বাঁক চোখে পড়ে— এই বাঁকগুলিকে সময়সীমা দিয়ে ধরতে চাইলে প্রথম পর্যায়ে ধরা যায় ১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ কবির ১৭ থেকে ২১ বৎসর বয়সে লিখিত কাব্যধারা। এই পর্বে কবিমানস তখনও অস্ফুট, অপরিণত। কিন্তু ইতিমধ্যেই কবির হিমালয় যাত্রা (১৮৭৩) ও বিলাত ভ্রমণ (১৮৭৮-৮০) সাঙ্গ হয়েছে, যা তাঁর শিক্ষা ও মনোগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইসঙ্গে তিনি পেয়েছেন তাঁর পরিবারে জাতীয়তার আবহাওয়া। এই পর্যায়ে রচিত হয়েছে 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী', 'অপ্সরা-প্রেম', 'ভগ্নতরী' প্রভৃতি কাব্য-কবিতা। তবে এইসব প্রকাশিত রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমমূলক কিছু কবিতা এবং 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামক একখানি কাব্যরচনা করেছিলেন, এই কাব্যটি পরবর্তীকালে লুপ্ত হলেও এর নবকলেবর পাওয়া যায় কবির এই পর্যায়ে রচিত 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্যে। বিলাতে থাকাকালীন লেখা শুরু করে দেশে ফিরে শেষ করেন সংলাপের আকারে লেখা 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল ধরা যায় ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে কবিহৃদয় ক্রমে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকেন। প্রকৃতিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনুভব করেন। একইসঙ্গে কাব্যের ভাবগত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে স্বীয় ক্ষমতা আবিষ্কার করে কৈশোর-জীবনের উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে কাব্যে ভাবাবিষ্ট হলেন। এই পর্বে রচিত হয় 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত' নামক কবিতা-সংকলনের কবিতাগুলি। পূর্ব পর্যায়ে রচিত ছোটো ছোটো গাথা, কবিতাগুচ্ছ এই পর্বে

'শৈশব-সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া এই পর্বের বিখ্যাত প্রকাশন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। 'ছবি ও গান'ও এই পর্বের ফসল। ঠিক এর পরেই কবি-জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-পত্নীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে। এই শোকের আঘাত কবিদৃষ্টির আত্মকেন্দ্রিকতাকে দূরীভূত করে সংসারের চলমানতায় নিবিষ্ট করল। ফলে 'ছবি ও গান'-এর জগত দূর হয়ে এল 'কড়ি ও কোমল', যেখানে কবিধর্ম আপন পথ খুঁজে পেল, ভাষা সমর্থ হল, সবদিক থেকেই বাংলা কাব্যে অভিনবত্ব প্রকাশ পেল।

তৃতীয় পর্বের সময়কাল ধরা যায় ১৮৮৬ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। এর আগের পর্ব যদি হয় কবির আপনাকে আবিষ্কারের পর্ব তাহলে এই পর্ব কবির জগৎকে খুঁজে পাওয়ার পর্ব। এখানে কবি জগৎ ও জীবনের সত্য অন্বেষণ করে তাকে লাভ করেছেন সেইসঙ্গে কাব্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই পর্বে তিনি অনুসন্ধান ও অনুভব করেছেন— সত্য, সুন্দর, প্রেম, মৃত্যু, জীবনের উদ্দেশ্য, মানুষের স্বরূপ, বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মানুষের স্থান, দেহ ও আত্মার সম্পর্ক। নির্ণয় করেছেন প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ সেইসঙ্গে মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্কের নানা মাত্রা উপলব্ধির চেষ্টাও করেছেন। এইভাবে তিনি সীমার নামে অসীমকে এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে অনুভব করে সেই অনুভূতির শিল্প-সৌন্দর্য সমন্বিত রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর এই বিশেষ পর্বের কাব্যফসল। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'স্মরণ', 'শিশু' সেই ঐশ্বর্যপর্বের কাব্য। ভাবে, কল্পনায়, অলঙ্কার-রচনা ও রূপচিত্রণে, ভাষায়, ছন্দের বৈচিত্র্যে তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ স্বমহিমায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বেই কবি পারিবারিক জমিদারির ভার নিয়ে সাজাদপুর-পতিসর-শিলাইদহ অঞ্চল জুড়ে পদ্মা ও তার শাখানদীর উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। নদী এখানে কবিচিত্তকে বেষ্টন করে প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাল। মানব-জীবনস্রোতে অবগাহনের আভাস রচিত হয়েছিল 'মানসী'-র কিছু কবিতায়, এখানে তার সার্থকতা। কবি অনুভব করলেন জীবনের নাড়ীর স্পন্দন, নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো দুঃখ-সুখ, ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ আশা-নিরাশা মহৎ তাৎপর্য নিয়ে ধরা দিল কবিমানসে, তৈরি হল 'সোনার তরী', 'চিত্রা'। জমিদারি ভাগ হয়ে যাওয়ায় সাজাদপুরের বাস গোটাতে হবে, অন্যত্র আশ্রয়ের চিন্তা, সেই সময়ের ফসল 'চৈতালি'। সাজাদপুর থেকে গেলেন শিলাইদহ। রচিত হল 'কণিকা', 'কথা' ও 'কাহিনী' এরপর 'কল্পনা'-য় এসেছে নূতন বাক্‌রীতি ও ছন্দ-ব্যবহার। এখানে কিছু কবিতায় কবি কালিদাসের যুগে প্রবেশ করেছেন, কোথাও কোথাও স্বদেশী আন্দোলনের তৎকালীন হাওয়াও ঢুকে পড়েছিল। 'ক্ষণিকা'-য় নিরাবরণ, নিরাভরণ, ঋজু ভাব-ভাষার সহজ-সরল প্রবাহ প্রকাশিত। বিশ শতকের সূচনা লগ্নে দেশে স্বদেশী-আন্দোলনের ঢেউ, বিদেশে বুয়র যুদ্ধের ঘনঘটা। সারা বিশ্ব এই বুয়র যুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ করল ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থপর হিংস্র রূপ। কবিরও প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ল 'নৈবেদ্য'-র কবিতায়। 'কল্পনা'-য় কবি ব্রহ্মাণ্ডে অনবচ্ছিন্ন-আমিকে অনুভব করেছিলেন, 'নৈবেদ্য'-তে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন অন্তরের অনির্বাণ-আমির পরিচয় নিতে। কোনো প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বা মত নয়, নিজের মতো করে ঈশ্বর বলতে যে সর্বভূ সত্তা বা শক্তিকে তিনি বিশ্বাস করতেন সেই ঈশ্বরভক্তির

রসেই ভরপুর 'নৈবেদ্য'-র কবিতাগুলি। কবি-পত্নীর মৃত্যুতে (১৯০১) শোক-বেদনা 'স্মরণ'-এর কবিতায় স্থান পেয়েছে। 'শিশু' কাব্যে কবি বিশ্বব্যাপ্তির মধ্যে শিশুরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। একাধারে পত্নীবিয়োগ, মাতৃহীন শিশুপুত্রের বেদনা, বালিকা কন্যার মরণান্তিক পীড়া— কবিচিত্তে নূতনতর বাৎসল্য-অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই সময়ের ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা, ক্লান্তির মধ্যে থেকে আগামী পূর্ণ-জীবনের জন্য ধ্যানস্তব্ধ আত্মমুখী প্রতীক্ষা স্থান পেয়েছে 'খেয়া' কাব্যে। এই সময় থেকেই কবিতার ধারা আর গানের ধারা পৃথক পথ নিতে শুরু করে। কনিষ্ঠ-পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু (১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি) কবি-জীবনের পরবর্তী ধারার সূচনা করে, সেই শোকবেদনা যে অভিনব ভক্তির আমদানি করে তার প্রকাশ ঘটে মুখ্যত 'গীতাঞ্জলি'-র রচনায় যা গানও বটে কবিতাও বটে। 'গীতিমাল্য'-এ কবিতায়-গানে ভক্তিরসকে সরিয়ে জীবনরস ভরে উঠল। 'গীতালি'-র কিছু কিছু রচনাও কবিতা হিসেবে বিবেচিত। এই পর্ব চলেছে ১৯১৩ পর্যন্ত।

এর পরবর্তী পর্যায় ধরা যায় ১৯১৩-২৫। পূর্ববর্তী পর্যায়ে কবি মানুষকে পাশ কাটিয়ে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই পর্যায়ে কবি সেই ঈশ্বর-অনুভূতির জগৎ থেকে সরে এলেন না বটে, কিন্তু নূতন প্রাবল্য ও বিপুল জীবনস্ফূর্তি নিয়ে মানব ও প্রকৃতির প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করলেন। পূর্বে যে স্থিতির প্রশান্তিতে আত্মনিমজ্জিত হতে চেয়েছিলেন এখানে তা সরিয়ে রেখে চলমান, আন্দোলিত, বিক্ষুব্ধ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। বিশ্বের মনুষ্য ও মনুষ্যত্বগ্রাসী রাষ্ট্রতন্ত্র, দেশগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ, সংগ্রামরত সাধারণ মানুষের বিপুল আন্দোলন, দেশে দেশে নবযৌবনউদ্দীপ্ত মানুষের সবল পদসঞ্চার, বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার, এ সবই কবিচিত্তে সুতীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে। তারই ফলে নূতন গতিস্পন্দিত জীবনচেতনায় কবি সবেগে উত্তীর্ণ হলেন, জীবনকে নূতনভাবে দেখলেন, রচিত হল 'বলাকা' কাব্য (১৯১৬)। এখানে জীবন-দর্শন, জীবন-অনুভূতি প্রকাশিত যত না আবেগের দৃষ্টিতে তার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধির দীপ্তিতে, বৈজ্ঞানিক চেতনায়। সামগ্রিক বিশ্বচেতনার নিরিখে, জাগ্রত জীবনবোধের উজ্জ্বল আলোয়, গতিময় ছন্দে মুক্তির দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়েছে এই কবিতাগুলি। বুদ্ধিদীপ্ত ভাব প্রকাশ পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে। 'বলাকা'-রই উপসংহার 'পলাতকা'। 'শিশু ভোলানাথ'-এ কবি যেন এই জগত থেকে মুক্তি পেয়ে দ্বিতীয় শৈশবের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ছুটি পেয়েছেন। এই পর্বের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'।

কবির পরবর্তী কাব্যরচনাসমূহকে আরও কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যথা— ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ ('মহুয়া', 'বন-বাণী'), ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ ('পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'বিচিত্রতা', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি') এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ ('প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'অতঃপর')।

৩.৩ 'বলাকা' রচনার প্রেক্ষাপট

'গীতাঞ্জলি'— পর্বের পর 'বলাকা'-পর্বের আবির্ভাবের মূলে রয়েছে কবিমানসে কিছু প্রেরণার অভিঘাত। যা কবিকে উজ্জীবিত করেছিল জীবন ও জগৎকে নবতর উৎসাহ ও আলোকে অনুভব করতে। সেই প্রেরণা-তালিকায় রয়েছে কবির ইউরোপ ভ্রমণ, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

এই ইউরোপ ভ্রমণের পূর্বে আরও দুইবার কবি ইউরোপ ভ্রমণ করলেও এবারের (১১ ই মে, ১৯১২) ভ্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই ভ্রমণের অভিঘাত তীব্রভাবে কবির ওপর পড়ে। প্রথমবার ভ্রমণকালে (১৮৭৮) কবি স্বদেশের সমাজজীবনের অলসগতির তুলনায় ইংলন্ডের ত্বরিতগতির জীবন ও নারীস্বাধীনতা কর্ত্তৃক বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যজীবনের সেই গতি ও মুক্তি তাঁর মনে যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল তার নিদর্শন মেলে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ। দ্বিতীয়বার (১৮৯০) মাত্র সাড়ে তিনমাসের জন্য ভ্রমণে যান যখন বাইরের অভিঘাত কবিচিত্তে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে পরিচয় বিশেষ মেলে না। ১৯১২-র যাত্রা, পূর্ববর্তী যাত্রা অপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক। এই সময় একাধারে স্বদেশে ও বিদেশে কবির প্রতিভা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে স্টপফোর্ড ব্রুক্, এইচ্. জি. ওয়েলস্, ইয়েট্স্ প্রমুখের সঙ্গে। রোদেনস্টাইনের সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় ঘটেছিল। ইয়েট্স্ কবিকে বৃহৎ বিদ্বৎসমাজের সম্মুখীন করায় কবিপ্রতিভা বিশ্বমানবের চেতনাকেও স্পর্শ করল। প্রাজ্ঞ মনীষীদের কাছে তাঁর প্রতিভা বিপুল স্বীকৃতি পেল। ১২ই জুলাই, ১৯১২ কবিকে ইয়েটস্-এর সভাপতিত্বে একটি সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এইসময় কবিকৃত 'গীতাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপির খাতাটি ইয়েট্স্ নেন। ইংলন্ডে চারমাস থেকে কবি যাত্রা করেন আমেরিকায়, সেখানে মনীষী, সাধারণ মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইউরোপ ও আমেরিকার নবজীবনপ্রবাহ, প্রাণশক্তি, আত্মিক শক্তি সেইসঙ্গে আমেরিকার বিজ্ঞান-রাষ্ট্র সমাজচিন্তা কবির চিত্ত ও চেতনায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই প্রাণস্ফূর্তি কবির জীবনদৃষ্টিকেই বদ্‌লে দিল। তিনি ইউরোপে প্রত্যক্ষ করেন বহমান মানবতার প্রবলতম ধারা, শুধু প্রত্যক্ষ করেন না, সেই প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁর সমস্ত শিরা-উপশিরায় বাহিত হতে থাকে। এই প্রেরণাই পরবর্তীকালে 'বলাকা' রচনায় তাঁকে উদ্দীপিত করবে।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর কবির নোবেলপ্রাপ্তির সংবাদ পায় শান্তিনিকেতন। প্রাচ্য জীবনচেতনা বিশ্বসভায় আদৃত হচ্ছে এই উপলব্ধি কবিকে নব প্রাণশক্তিতে উদ্বোধিত করে। এই স্বীকৃতি সারা জগতের কাছে প্রেরিত ভারত আত্মার চিরন্তন বাণীর স্বীকৃতি। তাই পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার কেন্দ্রে থাকা যে আত্মা প্রাচ্যকে এখন গভীর মহিমায় অনুভব করতে পারে, তাকে আবিষ্কারের গূঢ় আকাঙ্ক্ষাও কবিকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ মানবজীবনকে সমগ্রভাবে দেখা যে কত বিরাট এবং তার দাবি যে কত প্রচণ্ড তা কবির হৃদয়ঙ্গম হয়।

এরই সঙ্গে আর এক প্রবল পরিস্থিতি কবিকে নাড়া দিয়ে যায়, তা হল সমকালীন

বিশ্বপরিস্থিতি ও তৎপ্রসূত প্রথম মহাযুদ্ধ (২৮ শে জুলাই ১৯১৪ — ১১ নভেম্বর ১৯১৮)। এই সময় কবির আগাম এক অনুভূতি তৈরি হয়, যেখানে তাঁর মনে হয় তিনি মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসে উপনীত হয়েছেন, এক অতীত রাত্রি শেষ হয়ে মৃত্যু, দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে যেন বৃহৎ নবযুগের সূর্যোদয় আসন্ন। যেন কবিহৃদয় এইভাবে আগাম বার্তা পেয়েছিলেন আসন্ন প্রলয়ের। কেন-না, এই যুদ্ধ শুরুর আগেই তিনি 'বলাকা'-র কবিতা লেখা শুরু করেছেন। আসলে ওই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও সমকালীন যে বিশ্বপরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছিল, সেখান থেকেই যেন কবি ওই পরিস্থিতির অবসানে এক নূতন সকালের আলোর রেখা মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই বার্তাই লিপিবদ্ধ করেন কবিতার আকারে। যুদ্ধ চলাকালীন কবির রচনা শেষ হয়। কিছু কবিতায় সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও ধরা পড়ে, যেমন— ৫, ১১, ৩৭ ও ৪৫ নং কবিতা।

৩.৪ বলাকা : গ্রন্থ-পরিচয়

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি গ্রথিত হয়েছে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি:) এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কবি তাঁর বন্ধু উইলি পিয়র্‌সন্ সাহেবকে। এই কবিতাগুলি কবি প্রথমে প্রমথ চৌধুরির 'সবুজপত্র'-এর তাগিদে লিখতে শুরু করেন। পরে কয়েকটি কবিতা রামগড়ে থাকার সময় লেখেন। ওই সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। কবিপ্রাণে যেমন অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তেমনি নূতনের আহ্বানও ধ্বনিত হয়েছিল কবিচিত্তে। আত্মজীবনের বাইরে বিশ্বজীবনের দিকে ঝোঁক পড়েছিল তাঁর। এখানে তিনি পথিক, যাত্রা করেছেন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। লক্ষ্য কোন্ এক বৃহত্তর ধ্রুবলোক। কবির চেতনায়— "এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক্ থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।" [বিশ্বভারতীর সাহিত্য ক্লাসে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপনার সময় শ্রী প্রদ্যোতকুমার সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯—মাঘ ১৩৩০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।] এই গ্রন্থের ৪৫টি কবিতার অধিকাংশই 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত। কয়েকটি কবিতা 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণ (১৯১৬, ১৯২১)-এ কবিতাগুলি ১—৪৫ সংখ্যাচিহ্নিত থাকলেও পত্রিকা প্রকাশকালে ৩ এবং ৪১ সংখ্যা চিহ্নিত কবিতাদ্বয় ব্যতীত প্রতিটি শিরোনামযুক্ত ছিল। গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে (১৩৩৩) প্রথম ৮টি কবিতায় যথাক্রমে 'সবুজের অভিযান', 'সর্বনেশে', 'আহ্বান', 'শঙ্খ', 'পাড়ি', 'ছবি', 'শাজাহান' (পত্রিকা-প্রকাশকালে এর নাম ছিল 'তাজমহল') ও 'চঞ্চলা' শিরোনাম ছিল। পরবর্তী সংস্করণ (১৩৩৯) থেকে বর্তমানকাল অবধি এই ৪৫টি কবিতার কোথাও শিরোনাম নেই।

এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছে শান্তিনিকেতন, সুরুল, রাজগড়, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পদ্মা ও শিলাইদহে বোটে, পদ্মাতীর ও রেলগাড়িতে (শান্তি নিকেতন থেকে কলিকাতা)।

৩.৫ বলাকা: নামকরণ ও বিষয়ভাবনা

কবিগুরু বহুবার উল্লেখ করেছেন এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে তাঁর মানসলোক থেকে একটার পর একটা আসছিল। এই উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত, তাঁর জীবৎকালেই কবিতাগুলিকে শিরোনাম বর্হিত রূপে গ্রন্থভুক্ত করা হয়। 'বলাকা' শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন যৌথ বন্ধনের আভাস প্রতিভাত, অপরদিকে তাদের একস্থান থেকে আরেকস্থানে নিরন্তর গতায়াতের একটা ছবিও ধরা পড়ে। এই কবিতাগুলিও আপাতদৃষ্টিতে বিষয়ভাবনার দিক থেকে পৃথক মনে হলেও এদের মূলসুর একটিই। তা ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে, স্থবিরতার ধ্যানভঙ্গের কথা বলে। সে অর্থেই কবিতাগুলিকে যৌথ বন্ধন ছিন্ন করে পৃথক পৃথক নামকরণের প্রয়োজন হয় না।

'বলাকা'-য় একদিকে আছে গতিবাদের পরিচয়। মুখ্যত ৮নং কবিতাটি গতিবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যার পক্ষে সহায়ক হলেও অন্যান্য প্রধান কবিতাতেও এই তত্ত্বের সঞ্চার কমবেশি আছে। এরই পাশাপাশি এসেছে যৌবন-বন্দনা, মহাযুদ্ধচেতনা ও সেইসংক্রান্ত মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব। বিষয়গত দিকটি আলোচনার জন্য এখানে নির্দিষ্ট কিছু কবিতা-কেন্দ্রিক পাঠ প্রস্তুত করা হল।

'বলাকা' শব্দের অর্থ উড্ডীয়মান বক বা হংসশ্রেণি। অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই চিত্র আভাসিত। উড্ডীয়মান শ্রেণির প্রতিটি পাখি একক বিচ্ছিন্ন আবার এক-একটি শ্রেণিও একক। এর সঙ্গে জুড়ে আছে এদের সম্মুখবর্তী দীর্ঘগতির ইঙ্গিত। কোনো এক 'বেগের আবেগে' তারা অনির্দেশ্য সামনের দিকে উড়ে চলে। সুবিস্তৃত ব্যাপ্ত আকাশের পটে পক্ষবিস্তার করে বলাকার উড়ে যাওয়া এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের দ্যোতক।

'বলাকা' কাব্যেও প্রতিটি কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করায় তারা একক, সৌন্দর্যে ভিন্ন। কোথাও নূতনের আহ্বান, কোথাও যুদ্ধের বার্তা ধ্বনিত, কোথাও গতির বন্দনা কোথাও ঈশ্বরের প্রতি মানবের প্রেম ইত্যাদি। কিন্তু এই এক-একটি বিচ্ছিন্ন বক্তব্যকে ধারণ করেও এরা সামগ্রিকভাবে একটি বক্তব্য ধারণ করে আছে— সেই কেন্দ্রীয় বাণী— গতি। বলাকার উড়ে চলার মধ্যে সেই গতির বাণীই অভিব্যক্ত।

কবির কাছে এই বলাকার পাখার শব্দ অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে সমগ্র বিশ্বের বাণী জাগিয়ে দিয়েছিল, সেই বাণীই নানাভাবে এই কাব্যে ব্যক্ত। কবি 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' (১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ)-য় লিখছেন— "সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি না। আকাশে

তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে! কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— এখানে নয়, এখানে নয়।"

বুনো হাঁসের দল যখন বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে ছানা ফুটিয়েছে, সংসার পেতেছে তখন তারা আবার কীসের আবেগে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোথায় উড়ে চলে। তাদের চলার মধ্যে যে গতির বাণী সেই বাণীই এই কবিতাগুলিতে ধ্বনিত। প্রথমে ছিল অকারণ অবারণ গন্তব্যহীন গতির কথা— "চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী" (৮নং) অথবা, "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে" (৩৬ নং)। কারণ ঝিলমের তীরে যে বুনোহাঁসের দল কবিকে গতির আবেগে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের যাত্রা পথ কোথায় পৌঁছবে তা তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। তাঁর মনে হয়েছিল সবকিছুর কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তার কোনো ঠিক নেই। সুতরাং, গতি অনির্দেশ্য, গন্তব্যহীন।

শেষ পর্যন্ত কবি উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন এই গতির বাণী অতিক্রম করে উপনিষদিক ধারায় উপলব্ধি করেন সব গতিই স্থির শান্ত কল্যাণময় সত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে পৌঁছয়। "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" বলাকার গতি যেমন আকাশের বিস্তৃত পটে ব্যক্ত তেমনই এই বিশ্বের যাবতীয় গতি সত্যের প্রেক্ষাপটে ব্যক্ত। কবির উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত এই ধারণায় উপনীত— "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"— গতিশীল এই জগতের গতিময় যা কিছু সব ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। (ঈশোপনিষৎ)।

উদীয়মান বলাকা গতির বাণীর সঙ্গে সৌন্দর্যও ব্যক্ত করে। 'বলাকা'-র কবিতাগুলিতেও এক অপূর্ব কাব্যিক সৌন্দর্য, আনন্দময় উপলব্ধি বিরাজমান। উড়ন্ত হাঁসের দল তাদের পক্ষসঞ্চালনের মধ্যে যে সৌন্দর্য বর্তমান তাও কবির মনে মুদ্রিত করে দিয়েছিল। তাই সেই পক্ষসঞ্চালন "রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ" হয়ে ধরা পড়েছিল কবির মানসপটে। এই আনন্দ, সৌন্দর্য, বিস্ময়ও 'বলাকা'-র কবিতাগুলির অমূল্য সম্পদ। কেবল গতির তাত্ত্বিক চেতনা নয়, সেইসঙ্গে কাব্যসৌন্দর্যও সমগ্র কাব্যে অভিব্যঞ্জিত। সেই গতি, গতির মধ্যে ব্যক্ত সৌন্দর্যের ধারক হিসেবে 'বলাকা' নামকরণ ও তাৎপর্যময়, যথার্থ ও সার্থক।

৩.৬ 'বলাকা' ও যুদ্ধের বার্তা

'বলাকা' কাব্যের গতিচেতনা সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমির পরিণাম। ইউরোপের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের নির্লজ্জ প্রয়াস কবিকে তীব্র আঘাত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ওই রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি যদি স্থায়ী হয়, সারা

পৃথিবীতে ইউরোপের অপশাসন আর শোষণ যদি অব্যাহত থাকে, একইসঙ্গে মানুষের মনে বহুদিনের সংস্কার, সংকীর্ণতা, জীর্ণতা, কলুষতা নিয়ে সামাজিক স্থিতাবস্থাও অপরিবর্তিত থাকে তাহলে তা সমগ্র পৃথিবীর মানবসভ্যতার পক্ষে বড় দুর্দিন। তাই এমন এক কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকামিলা করার জন্য কবি গতিময়তার আকাঙ্ক্ষা করেন যা পুরাতন সংস্কারাবদ্ধ অত্যাচারলাঞ্ছিত মানবসভ্যতাকে সর্বপীড়নমুক্ত নূতন যুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। আর এই অন্যায় অত্যাচার শোষণের দুর্দান্ত তাণ্ডবের থেকে মুক্তিলাভ কোনো ধীর পন্থায় যে সম্ভব নয় তা কবি বুঝেছিলেন। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক বিপ্লবের, যা আলস্যের জড়তা থেকে আঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে নূতন আলোকিত পৃথিবীতে উত্তীর্ণ করবে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর আগেই কবি তাঁর ৪ নং কবিতায় লিখছেন, সেই নূতন সকালের জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন তার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করবে বিধাতার আহ্বান- শঙ্খ। সেই যুদ্ধ হবে অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। ৫নং কবিতায় কবি কোনো এক কাণ্ডারীর কল্পনা করছেন যিনি ডাক দেবেন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নূতন যুগে যাত্রা করার জন্য তাঁর সঙ্গী হতে। কারণ কবির উপলব্ধি বহুদিনের অতি পুরাতন পাপের জগদ্দল পাথর থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন বিপ্লব। তাই এই বিপ্লবে অকুতোভয়ে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান এসেছে ৩৭নং কবিতায়। ৪নং কবিতা লেখার সময় যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি আর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ শেষ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলেছে। কবি বুঝেছিলেন যে বিপ্লব নূতন সকাল আনবে তার সামনে অনেক বাধা। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বহু মৃত্যু, ধ্বংস ও বিচ্ছেদবেদনা অতিক্রম করে সেই সকালে পৌঁছনো যাবে। এর জন্য মানবজাতিকে আরাম সুখ বিসর্জন দিতে হবে। এভাবেই কবি 'অকারণ অবারণ' গন্তব্যহীন গতি থেকে পৌঁছে যান কল্যাণময় পরিসমাপ্তিতে। যুদ্ধে বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেখানে পৌঁছনো যাবে সেখানে আছে শাশ্বত কল্যাণ ও মঙ্গল। কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবই পৌঁছে দেবে সেই সত্যে।

সভ্যতা চায় নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে সার্থক হতে। যুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সভ্যতা এক রূপ থেকে নূতন রূপে যাওয়ার ভূমিকা করে। মানুষ সহজে পুরাতন রূপ থেকে নূতন রূপের ভূমিকা তৈরি করতে পারে না, যুদ্ধই ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেই বার্তাই প্রকাশিত ১৬নং কবিতায়। যুদ্ধ-পরবর্তী সভ্যতার নূতন রূপ এখনো অধরা, কিন্তু তার প্রস্তুতির যজ্ঞভূমি প্রস্তুত বর্তমানের যুদ্ধক্ষেত্রে।

কবি তাঁর 'বলাকা' রচনার পূর্বে ইউরোপ ভ্রমণকালে যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং একইসঙ্গে স্বদেশে যে সামাজিক স্থিতাবস্থা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেছিল— সেসব থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ তাঁর মনে হয়েছিল বিপুল আঘাতের মধ্য দিয়ে ধ্বংসের পথে পুরাতনকে সরিয়ে আগামীকে আহ্বান। তাই এক আসন্ন বিপ্লবের বার্তা কবির অন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল, তিনি অপেক্ষা করছিলেন এক মহাপ্রলয়ের। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়িত হয় প্রথম মহাযুদ্ধরূপে।

৩.৭ বলাকা : ঈশ্বর-চেতনা ও মানব-চেতনা

রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনা সারাজীবন ধরেই মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রীতির সমন্বয়ের ফল। জীবনের প্রথম থেকে ঔপনিষদিক ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে তিনি আত্মস্থ। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভক্তি-চেতনা, প্রেম-চেতনা ও গভীর আত্মিক উপলব্ধি। তাঁর কাছে ঈশ্বর যেমন—

"পূর্ণমদ ঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"

আবার, কখনও—"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।।"

(বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী)

কখনও তাঁর উপলব্ধি—

"হে মোর দেবতা, ...
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।"

(গীতাঞ্জলি)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একদিকে ঈশ্বরের অনুভবের প্রকাশ, অন্যদিকে সীমাময় জগতের মধ্যে অসীম উপলব্ধির ব্যঞ্জনা। 'বলাকা' কাব্যেও সেই অনুভূতি প্রকাশিত। এখানে আর একটি বিশিষ্ট মাত্রা যোগ হয়েছে— সচেতন বুদ্ধিদীপ্তিময় মানুষের উপলব্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তা অনুধাবনই এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্য। কোনো ভাবের ঘোর বা ভক্তির আচ্ছন্নতা নয়, সম্পূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষিত। এই কাব্যে ঈশ্বর ও মানুষ একই সঙ্গে ওতপ্রোত। এখানে ধরা পড়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের নানা ভাব ও নানা মাত্রার সম্পর্ক। কখনও মানুষের অহমিকা যথাযথ ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মানস-চাহিদার অনুবর্তী হয়ে মানুষ ঈশ্বরের নিকট ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা-পূরণের দাবি করে। কখনও ঈশ্বরের বিচারবোধের অসঙ্গতি অনুভব করি আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ কখনও নিজের নির্বাচিত দানের দ্বারা তৃপ্ত করতে চায় ঈশ্বরকে, কিন্তু সে দান শ্রেষ্ঠ দান নাও হতে পারে। কারণ—

"আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।" (১০নং)

মানুষ নিজেই বোঝে না কখন কোথা থেকে সেই ধন প্রকাশিত হবে—

"সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।"

(ওই)

ঈশ্বরের প্রজ্ঞাতেই ধরা পড়ে মানুষের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত সেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, যা স্বয়ং ঈশ্বরদত্ত। ঈশ্বরের পূজায় সেই হবে শ্রেষ্ঠ ধন।

"বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।"

(ওই)

এর মধ্য দিয়ে কবির সুগভীর ঈশ্বরপ্রেম ধরা পড়েছে।

ঈশ্বরের কাছে মানুষের অবিরাম প্রার্থনা কিছু পাওয়ার, যত পায় তত প্রত্যাশা বাড়ে। এই দানের ভারে মানুষ চাপা পড়ে, তবুও চাওয়ার শেষ নেই। কবির কাছে শেষ পর্যন্ত এই দানের ভার দুঃসহ বোধ হয়। তিনি দান নয়, মুক্তি প্রার্থনা করেন। কারণ, তাঁর মনে হয় অবারিত মুক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশেই মানুষের সার্থকতা। তাই ঈশ্বরের কাছে কবির প্রার্থনা কবে তিনি কবিকে গ্রহণ করবেন তাঁর প্রেমের মধ্যে, অসীমের মাঝে—

"লবে মোরে, লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।"

(১২নং কবিতা)

কবি অনুভব করেন ঈশ্বরের ভালোবাসা যখন বিচ্ছুরিত হয় তখন তার ছোঁয়ায় ক্ষণমুহূর্তও চিরন্তন হয়ে ওঠে—

"এমনি ক'রেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।"

(৩২নং কবিতা)

অথবা,

"দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধ'রে
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।"

(৩৪নং কবিতা)

আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম। তিনি বারে বারে আমাদের দ্বারে এসে দাঁড়ান, আমরা চিনতে ভুল করি। তবুও তিনি বারবার নিজেকে প্রকাশ করেন ফুলের গন্ধে, তারার আলোয়, প্রেয়সীর চোখে, সন্তানের ভালোবাসায়—

"যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাত্রে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।"

(৪২নং কবিতা)

ঈশ্বর প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রীতিও কবির সামগ্রিক সাহিত্যে বিচিত্ররূপে বিকশিত। 'বলাকা' কাব্যেও মানব-চেতনা উদ্ভাসিত। তিনি যেমন যুগ-যুগ ধরে লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, আবার মানুষকে সর্বগুণে ভূষিত করে ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসেবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। প্রাক্-বলাকা পর্বে কবির মানবপ্রেম মুখ্যত আবেগ-নির্ভর। বলাকা বা বলাকা-পরবর্তী পর্বে আবেগ বর্জিত না হলেও মানবচেতনা মুখ্যত বুদ্ধিদীপ্ত। তাই কিছু কবিতায় যেমন দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তিকামনা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে তেমনি বিবর্তনের ধারায় মানুষের আগমনকে অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে গ্রহণ করেছেন। কবির সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিতে এই চেতনা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তিনি দেখেছেন একদিকে প্রবলের অন্যায় ও লোভ, অন্যদিকে দুর্বলের নিপীড়ন, ভীরুতা ও বঞ্চনা— এই বৈপরীত্যের সংঘর্ষে পৃথিবীর মানব-সভ্যতা ধ্বংসের পথে আগুয়ান। এর থেকে মানবের মুক্তির বাণীই সোচ্চারে ধ্বনিত করেছেন ৪, ৩৭, ৪৫ নং কবিতায়।

"ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,

জাতি-অভিমান,

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—

.....

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,

নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।

শুধু একমনে হও পার

এ প্রলয়-পারাবার

নূতন সৃষ্টির উপকূলে

নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।"

(৩৭নং কবিতা)

কবির মানবচেতনার মূল ভিত্তি অত্যাচারিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি আর অত্যাচারিতের প্রতি প্রবল ধিক্কারে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অত্যাচার থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন—

"দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন—

.....

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি

ডাকিছে কাণ্ডারী,

এসেছে আদেশ—

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

নূতন সমুদ্রতীর-পানে

দিতে হবে পাড়ি।" (ওই)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী চিত্রের মাঝেই আভাসিত হচ্ছে মানবজাতির নবজীবনের সম্ভাবনা— এমনটাও শোনা যায় কবির বাণীতে—

"ঝড়ের গর্জন-মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;

ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'

উঠেছে আদেশ—

‘বন্দরের কাল হল শেষ।” (ওই)

এই আশার বাণীর মূলে রয়েছে কবির দৃঢ় বিশ্বাস—

“রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?” (ওই)

আসলে এই বিশ্বাসের মূলেও রয়েছে তাঁর গভীর ঈশ্বর-প্রীতি—

“নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?” (ওই)

আসলে এ কবির প্রশ্ন নয়, দৃঢ় বিশ্বাসের ঘোষণা।

বিবর্তনের ধারায় শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত মানুষ প্রাণী জগতে তার প্রজ্ঞা ও প্রেমানুভূতিতে সর্বোত্তম। যে ক্ষমতা কবির উপলব্ধিতে একমাত্র ঈশ্বরের সম্ভব। যে কারণ মানুষ সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব বস্তু সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। তাই জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরের মতো সেও নতুন কিছু সৃষ্টি করে। তাই কবির উচ্চারণ—

“পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,

তার বেশি করে না সে দান।

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,

আমি গাই গান।”

(২৮নং কবিতা)

মানুষ তার অনুভূতির দ্বারা এই বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছে, প্রেমানুভূতিতে বিশ্বকে ভালোবেসেছে, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে। এর দ্বারাই এই জগৎ তার জীব ও জড়বস্তুসমূহ নিয়ে মানুষে কাছে উপলব্ধ হয়েছে, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি থেকে আনন্দ উপভোগ করেছেন। মানুষ এবং তার প্রেমানুভূতি আছে বলেই এই বিপুল বিশ্বের সবকিছু এত সুন্দর।

‘হে ভুবন,

আমি যতক্ষণ

তোমারে না বেসেছিনু ভালো

ততক্ষণ তব আলো

খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

.....

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;

কী যে হল কানাকানি,

দিল যে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।'

(১৭নং কবিতা)

এই একই অনুভূতি বারে বারে ফিরে এসেছে ২৪, ৩১, ৩৩, ৩৫নং কবিতায়।

'আমার গানে স্বর্গ আজি

ওঠে বাজি,

আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,

আকাশ-ভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।'

(২৪নং)

কবির মানব ও ঈশ্বর-চেতনার প্রকাশক ১৯ ও ২২ নং কবিতাদুটি পরে বিশদ আলোচিত হল।

৩.৮ 'বলাকা' কাব্যের ছন্দ

১৩২৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতীর ক্লাসে কবিগুরু ছন্দ সম্পর্কে নানা সময় তাঁর মত ব্যক্ত করেন। এরকমই একবার তিনি বলেন—"ছাঁদনের বাঁধন খোলবার চেষ্টা আমার চিরকালের। সন্ধ্যা-সংগীতে আমি বুঝতে পারলাম যে বাংলা ছন্দেও নতুন পথ মিলতে পারে। ইচ্ছে করে নয়, স্বভাবতই এটা ঘটে গেল। ...প্রভাত-সংগীতে, ছবি ও গানে, শৈশব-সংগীতে এই চেষ্টা সমানভাবে চলেছে। মানসীর যুগে আমি যেন এই পথে আরও নতুন আলোক পেলাম। বলাকার ছন্দের পূর্বরূপ দেখতে পাবেন মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়। এখানে সাবেক ছন্দকে ভেঙে নতুন করে ছন্দকে পেলাম।"

তবে 'মানসী'-র পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ছন্দোমুক্তির সাধনা বইয়ে দিয়েছিলেন সঙ্গীতের জগতে। অতঃপর প্রমথ চৌধুরী যখন 'সবুজপত্র' প্রকাশ করলেন তখন কবিতায় সেই পুরোনো মুক্তির সাধনা তিনি নতুন করে শুরু করেন। কবির মতে সেই যাত্রা— 'মুক্ত পথের যাত্রা— তার জন্য যে ডাক তার মধ্যেও ছন্দ হওয়া চাই মুক্ত।'

'বলাকা' কাব্যের গতিময়তা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে ওঠে এই 'মুক্ত' ছন্দ। কারণ বস্তুর বস্তুত্ব ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য বা ব্যক্তিত্বই হল তার ছন্দ।

কবির মন্তব্য, "বলাকাতে আমার দুই মাত্রারই ছন্দ। দৈবাৎ একটা তিন মাত্রার করেছিলাম। কিন্তু সবুজপত্রে তা দেইনি, তাকে কেউ কেউ বলেন verse libre, যদিও তা নয়।"

একটু দেখে নেওয়া যাক 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবির ছন্দোচিন্তা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১নং থেকে ৫নং কবিতা ৪ মাত্রার দলবৃত্ত ছন্দোরীতিতে রচিত। একেবারেই প্রথামাফিক

গঠনকৌশল মান্য। যেমন—

'ওরে নবীন, | ওরে আমার | কাঁচা,
ওরে সবুজ, | ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের | ঘা মেরে তুই | বাঁচা
রক্ত আলোর | মদে মাতাল | ভোরে
আজকে যে যা | বলে বলুক | তোরে' (১নং কবিতা)

আবার ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৪ সংখ্যক কবিতাও দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। অবশিষ্ট সকল কবিতা মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত হলেও এক অভিনব ছন্দোবদ্ধ ধরা পড়ল এখানে। পয়ারের ঠাট ভেঙে মধুসূদন দত্ত এনেছিলেন অমিত্রাক্ষরের উদাত্ত প্রবহমানতা, তা ছিল বাংলা ছন্দের বন্ধনমুক্তির প্রথমধাপ, যা ক্রমে পূর্ণ ছন্দোমুক্তির দিকে পৌঁছে দিয়েছে বাংলা কবিতাকে। এই যাত্রাপথে দ্বিতীয় প্রয়াস গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৪ মাত্রার পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে স্বাধীন মাত্রা বিন্যাসের পত্তন। বহুকাল পরে এরই সঙ্গে স্মরণে আসবে রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক স্বাধীন মাত্রার পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের প্রয়াস। এই 'গৈরিশ বন্ধ'-ই নাটকের বাইরে রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হল। সে পরিচিত হল 'মুক্তক' বা 'মুক্তবন্ধ' নামে। 'গৈরিশ বন্ধে' ধ্বনিমিত্রতা মান্যতা পায়নি, রবীন্দ্রনাথে এসে তা অসম পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রান্তিক ধ্বনিসমতা পেল।

৮+৬ ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
৮+৬ ঝংকার মুখরা এই ভুবন মেখলা,
৮+১০ অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
৮+১০ নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
১০ বক্ষ তোর উঠে রণরণি,
৬ নাহি জানে কেউ—
৮+৬ রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
৮+৪ কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
১০ মনে আজি পড়ে সেইকথা—
১০ যুগে যুগে এগেছি চলিয়া
৬ স্খলিয়া স্খলিয়া
৪ চুপে চুপে
৬ রূপ হতে রূপে
৬ প্রাণ হতে প্রাণে;
৬ নিশীথে প্রভাতে

৮ যা-কিছু পেয়েছি হাতে

৮+৬ এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,

৬ গান হতে গানে। (৮নং কবিতা)

এখানে পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস বলাকার পাখার মতোই যেন নির্ভার স্বাধীন। ছন্দের গতিভঙ্গে স্বাধীনতা আনলেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দোরীতির আন্তর্বৈশিষ্ট্য অমান্য করেনি। সেই অর্থে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এই বিন্যাস ছন্দোবন্ধের মুক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-এর মতে, 'মধুসূদন পয়ারের যতিবিধানগত রীতি লঙঘন করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি তার রূপটা রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের সে রূপটাও দিলেন ভেঙে। ফলে তাঁর ছন্দ ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র রূপ নিয়ে, নানা পর্যায়ের যতির সীমারেখা ধরে, কূলভাঙা নদীর স্রোতের মতো। (ছন্দ পরিক্রমা)

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ|

রুধিল না সমুদ্র পর্বত |

আজি তার রথ ||

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে |

নক্ষত্রের গানে |

প্রভাতের সিংহদ্বারে পানে |

তাই

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ||

ভারমুক্ত সে এখানে নাই | (৭নং কবিতা)

এভাবে পয়ারকে ভেঙে ফেলার প্রবণতাকে কেউ কেউ বলেছেন 'বেড়াভাঙা পয়ার'। যার সঙ্গে অনেকেই free verse বা verse libre-র মিল খুঁজে পান।

Free verse সম্পর্কে 'Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetries' -এ পাওয়া যাচ্ছে— 'verse is based not of recurrence of strees accent in a regular, strictly measurable pattern, but rather on the irregular rhythmic cadence of the recurrence, with variations of significant phrases.' অর্থাৎ, free verse কবিতাপঙ্‌ক্তি ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের মুক্ত ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঐ গ্রন্থেই verse libre প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'Though rhyme may persist, the traditional regulations ... are ignored. Consecutive lines may very greatly in 'Or may not, and only unity generally maintained is one of sense or syntax.' অর্থাৎ, এখানে অন্ত্যমিল থাকলেও পদ্যের প্রথা লঙঘন করা হয়, পঙ্‌ক্তিগুলির আকারবৈচিত্র্য থাকে, কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই সজ্জাবিন্যাসে। সেদিক থেকে 'বলাকা'-র ছন্দোবদ্ধকে verse libre-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলা যেতে পারে।

৩.৯ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে আমরা 'বলাকা' কাব্যের সাধারণ পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলে ধরেছি। প্রথমে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যধারায় 'বলাকা' কাব্যের স্থান। তারপর তুলে ধরা হয়েছে 'বলাকা' রচনার প্রেক্ষাপট ও গ্রন্থ-পরিচয়। এরপর 'বলাকা' কাব্যের নামকরণ ও তার সার্থকতা এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া 'বলাকা' কাব্য ও যুদ্ধের বার্তা, 'বলাকা' কাব্যের ঈশ্বর-চেতনা ও মানব-চেতনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে 'বলাকা' কাব্যের ছন্দ আলোচনা করে এই বিভাগের প্রাসঙ্গিক আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) রবীন্দ্র-কাব্যধারায় 'বলাকা'-এর স্থান নির্দিষ্ট করুন।

(২) 'বলাকা' কাব্যের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

(৩) 'বলাকা' কাব্যে কীভাবে যুদ্ধের বার্তা প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

(৪) 'বলাকা' কাব্যের ঈশ্বর-চেতনা ও মানব-চেতনা কীভাবে ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা তুলে ধরুন।

(৫) 'বলাকা' কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করুন।

৩.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

চতুর্থ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৪

বলাকা

বলাকা : নির্বাচিত কবিতার আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ বলাকা : নূতনের আহ্বান ও আসন্ন সংঘর্ষের স্বীকৃতি

৪.২.১ ১ নং কবিতার আলোচনা

৪.২.২ ৪ নং কবিতার আলোচনা

৪.৩ মানব-চেতনা, মৃত্যু-চেতনা ও শিল্প-চেতনা প্রসঙ্গে বলাকা-র ৭ নং কবিতার আলোচনা

৪.৪ বলাকা-র গতিবাদ ও ৮ নং কবিতা

৪.৪.১ ৮ নং কবিতার আলোচনা

৪.৫ 'বলাকা' নাম-কবিতার আলোচনা (৩৬ নং)

৪.৬ মানব-চেতনা ও মৃত্যু-চেতনা প্রসঙ্গে ১৯ নং কবিতার আলোচনা

৪.৭ ঈশ্বর-চেতনা প্রসঙ্গে ২২ নং কবিতার আলোচনা

৪.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় তাঁর কবি-জীবনের দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত সহজেই ধরা পড়ে। 'বলাকা'-পর্বে তাঁর কাব্যধারা এক বিশেষ অধ্যায়ে উপনীত। 'বলাকা'-পূর্ববর্তী সময়ে কবি যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এখানে তা থেকে মুক্তি ঠিক নয়, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে ঈশ্বর এক নূতন মাত্রায় ব্যক্ত। একইসঙ্গে এই পর্বে এসেছে ইউরোপীয় জীবনের সংঘাত ও যুদ্ধ, যৌবন-বন্দনা, এসেছে গতিচেতনা, বিজ্ঞান-চেতনা, দর্শনচেতনা। একই বক্তব্য একাধিক কবিতায় যেমন ঘুরেফিরে এসেছে, তেমনি একই কবিতায় একাধিক ভাব-বৈচিত্র্যও প্রকাশ পেয়েছে। সবদিক থেকে 'বলাকা' কাব্য বক্তব্য ও আঙ্গিকগত দিক থেকে অ-পূর্ব অভিনবত্বের প্রকাশক। সেই অভিনবত্ব

কীভাবে বিভিন্ন কবিতায় ধরা পড়েছে বর্তমান বিভাগের আলোচনায় তা তুলে ধরা হল।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় তাঁর কবি-জীবনের দিক্-পরিবর্তনের ইঙ্গিতও সহজেই ধরা পড়ে। এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের ধরণ কিছু বদ্‌লে দিয়েছে। কীভাবে সেই পালাবদল ঘটে যায়, এখানে কোন তত্ত্ব কাজ করেছে, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনই বা কীরূপ ধরা পড়েছে, ভাব ও ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থের যে স্বাতন্ত্র্য নির্মিত হয়েছে, নির্বাচিত কবিতাগুলির আলোচনার মাধম্যে তা উপলব্ধি করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৪.২ বলাকা : নূতনের আহ্বান ও আসন্ন সংঘর্ষের স্বীকৃতি

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের বেশকিছু কবিতাকে এই পর্যায়ে রাখা যায়। যেখানে এসেছে যৌবনবন্দনা, মহাযুদ্ধের চেতনা, মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্বও। কাব্যগ্রন্থের ১ ('সবুজের অভিযান'), ২ (সর্বনেশে), ৩ (আহ্বান), ৪ (শঙ্খ), ৫ (পাড়ি), ১১ (বিচার), ১৩ (যৌবনের পত্র), ১৮ (যাত্রা), ২২ (মুক্তি), ৩৭ (ঝড়ের খেয়া), ৪৪ (যৌবন) ও ৪৫ (নববর্ষের আশীর্বাদ) সংখ্যক কবিতাগুলি এই পর্যায়ভুক্ত বলা যায়।

এই অংশে আলোচিত হল ১ ও ৪ সংখ্যক কবিতা দুটি। রবীন্দ্রনাথ মনন ও চিন্তনে ছিলেন চিরযৌবনের পূজারী। তিনি বিশ্বাস করতেন জাগ্রত যৌবন দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথ নির্মাণ করতে পারে। তাঁর মনে চিরকাল যে-ভাবনা দানা বেঁধেছিল, তারই প্রকাশ ঘটে তিপান্ন বৎসরের প্রৌঢ় কবির লেখায়।

৪.২.১ ১নং কবিতার আলোচনা

১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে লেখা এই কবিতাটি 'সবুজের অভিযান' শিরোনামে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩২১) প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই— যৌবনের ধর্ম যে সবকিছু পরখ করে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে চায়। শাস্ত্রবাক্য আপ্তবাক্য তার জন্য নয়। কবিতাটির শুরু থেকে শেষ সেই যৌবনের বন্দনাই প্রকাশ পেয়েছে। নবীন ও প্রবীণের অনিবার্য সংঘাত প্রকাশ করেই কবি যৌবন সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ অভিব্যক্তি— তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রবীণরা চান যেকোন কাজে বাধাবিঘ্ন এড়ানোর জন্য অন্যের অভিজ্ঞতা গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর বিধিনিষেধের বোঝা অর্পণ। কারণ তাঁরা মনে করেন বাঁধা বুলি না মেনে যদি প্রত্যেকের দ্বারা সবকিছু অনুভব করতে চাই তাহলে সেখানে বেদনা আছে,

আছে বিপদ। কারণ সেখানে নেই অন্যের অভিজ্ঞতার আশ্রয়, নেই চেনা পথের নির্বিঘ্নতা। কিন্তু যৌবন তো নিয়মবাঁধা পথের পথিক হতে চায় না। সে চায় জরা মুছে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা ওড়াতে। তাই কবির মতে, "যৌবনই বিশ্বের ধর্ম, জরাটা মিথ্যা।" তাই কবির আহ্বান,

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

জীবন গতিময়, জীবন চলমান। সেখানে প্রবীণ প্রাজ্ঞরা গড়ে তোলেন সামাজিক বিধিনিষেধের কঠিন বন্ধন আর জীবনটা অতিবাহিত করতে চান সেই ঘেরাটোপের আড়ালে। চলমান, পরিবর্তনশীল বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্বিঘ্নে থাকার একান্ত প্রয়াস তাঁদের আচরণে—

"ঐ-যে প্রবীণ, ঐ-যে পরম পাকা—
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।"

রক্ষণশীল সনাতনী বৃদ্ধদের লক্ষ করে বিদ্রূপ করলেন এই প্রৌঢ় কবি। এমন পরিস্থিতিতে কবির আকুতি, "আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

বাইরের পৃথিবীতে যখন প্রাণের স্পন্দন ঢেউ তুলেছে তখন তথাকথিত প্রবীণরা নিজেদের অচলায়তনে সুরক্ষিত। কবি এই অচলায়তন নাড়িয়ে দিতে ডাক দিয়েছেন 'অশান্ত'দের। যদিও তিনি জানেন সাবধানী-প্রাজ্ঞরা এই নবীনদের বাধা দেবেন, ক্রুদ্ধ হয় পথ আটকাবেন তবুও কবি 'প্রচণ্ড'দের আহ্বান করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কারণ কবির আকাঙ্ক্ষা— অনিবার্য। তিনি জানেন, চিরকাল এই সুপ্তি থাকবে না, অচলায়তনের অর্গল ভেঙে কালের নিয়মে আগামিকে আহ্বান জানানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। সেই কাজ করবে এই নবীন 'প্রমত্ত'রা। তারা নিয়ে যাবে অজানালোকে, বন্ধন কেটে আনবে মুক্তির আশ্বাস। কিন্তু সেই পথ যে সুগম নয় তাও কবি জানেন, "আপদ আছে, জানি আঘাত আছে", আর আছে বলেই তো "বক্ষে পরাণ নাচে", কারণ বিধিবদ্ধ পথে যে অজানিতের সন্ধান সম্ভব নয় সে কথা নবীনদের থেকে আর কে বেশি বোঝে। তারাই জরাজীর্ণ সমাজটার পরতে পরতে অফুরন্ত প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটাতে পারগ। সেই অর্থেই নবীনরা কবির চোখে 'অমর'। পুরাতনের অর্থহীন বন্ধন ভাঙাই তাদের কাজ। কবির বিশ্বাস তারা পারবে। কারণ দেহের ধর্ম স্থিতি আর আত্মা নিত্য-সচল। তাই স্থিতিশীলেরা প্রকৃতির দোহাই দেন আর গতিশীলেরা করেন আত্মার জয়-ঘোষণা। আচারের অতি বন্ধনে মানব-সমাজ যখন আপন সার্থকতার প্রকাশ হারিয়ে ফেলে তখন কবিরাই তাকে

আঘাত করে জাগ্রত করে তোলেন। যেমনটি করেছিলেন বৈদিক ঋষিরাও। এখানেও কবি সেই ভূমিকাই পালন করতে চেয়েছেন। আর তাই অচলায়তন সমাজের পুথিপত্র ও অনুশাসনের বন্ধন ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়ে কবি লিখছেন—

"শিকলদেবীর ঐ-যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
.....
ঘুচিয়ে দে, ভাই, পুঁথিপোড়ের কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

উল্লেখ্য, সবুজপত্রের ওই বৈশাখ সংখ্যাতেই 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' নামক একটি প্রবন্ধ কবি লেখেন, যেখানে তিনি দেশের যুবশক্তিকে বাঁধভাঙার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, "পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। ...যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত, একথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া, কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। ..."

এর পরই কবির বক্তব্য,

"আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। ... মানা, মানা, মানা— শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরস্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। ... আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। ...প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে?"

কিন্তু কবি আশাবাদী। তিনি জানেন চিরযৌবনের চিরনবীনের জয় হবেই। তাই তো ওই প্রবন্ধের শেষে এসে কবি বলেন— "যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাকিয়াছিলেন

তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। ...কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুল, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঙ্গল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক; তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক।"

(বিবেচনা ও অবিবেচনা, কালান্তর, বিশ্বভারতী, পৃ: ২৪-২৭)

কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কবি 'প্রবীণ' ও 'পরম পাকা' নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে হুঁসিয়ারি দিয়েছেন। যাত্রার আহ্বান ও জয়ধ্বনি করেছেন নবীন ও তরুণদের।

১৯১২ তে কবি তৃতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করেন। এইসময় তিনি সেদেশে একটা অস্থিরতা অনুভব করেছিলেন। একটা লড়াই আসন্ন যা দেশটাকে নতুন যুগে পৌঁছে দেবে। একদল মানুষ ভাবীকালকে তাদের মানসলোকে দেখতে পাচ্ছিল, যে-কাল 'সর্বজাতির লোকের'। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সাহিত্যভাবনা এক নতুন মোড় নিল। পৃথিবীর এই সন্ধিক্ষণে তিনি ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ ভাবতে পারেননি। তাই সেই লড়াইতে নবীনরা যাতে অগ্রণী হয়ে গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তার আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতাটিতে। জীবনের ধর্মই গতি, আর নবীনরা সেই জীবনের ধ্বজাবাহক। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে রামগড় যাত্রা করেন ১৯১৪-র মে মাসে। এখানে বসে কবি পরপর তিনটি কবিতা লেখেন— গ্রন্থের ২ ('সর্বনেশে'), ৩ ('আহ্বান') ও ৪ ('শঙ্খ') সংখ্যক কবিতা যথাক্রমে ৫ই, ৬ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 'সর্বনেশে' সম্পর্কে কবির মত,

"...আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল...।"

(গ্রন্থ পরিচয়— রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১২শ খণ্ড, পৃ: ৫৯৭)

'আহ্বান' কবিতায় পাই 'সবুজের অভিযান'- এরই সুর। আর 'শঙ্খ' কবিতায় কবি যেন স্বয়ং যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হতে চাইলেন।

৪.২.২ ৪নং কবিতার আলোচনা

গ্রন্থভুক্ত ৪ সংখ্যক কবিতাটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার 'সবুজপত্র'-এ 'শঙ্খ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি যখন রচিত হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তখনও মাস দুই-এক বাকি। এই সময় কবির অন্তরে একটি দাবি ওঠে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো-গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় আহ্বান জানাতে হবে, আর তার জন্য শঙ্খ বাজাতে হবে। তাঁর মতে— "বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা

করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।"

(গ্রন্থ পরিচয়— রবীন্দ্র-রচনাবলী। বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১২শ খণ্ড, পৃ: ৫৯৩)

উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে পুনর্বিভাগ ও পুনর্বণ্টনের জন্য ১৯১৪ সালের জুলাইয়ের শেষ ও আগস্টের প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। বস্তুতপক্ষে এর অনেক আগে থেকেই তারা মহাযুদ্ধের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল। জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই এর জন্য দায়ী ছিল। তারা এই যুদ্ধের প্রস্তুতি জনসাধারণের নিকট গোপন রেখেছিল। ফলে যুদ্ধ শুরু হলে তারা প্রত্যেকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তারাই আক্রান্ত! সুতরাং, এই অবস্থায় নিজ নিজ দেশ রক্ষার জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর এই যুদ্ধে যোগদান অবশ্য কর্তব্য।

রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ কয়েকজন চিন্তানায়ক ও শিল্পী এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন যার জন্য তাঁরা চরম লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতও হলেন। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে সমগ্র ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ-উন্মাদনায় মেতে উঠলেন। সমগ্র ইউরোপের বুকে নেমে এল বিভীষিকার অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখছেন, তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। কিন্তু এই কবির মনে কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। যে ভাবের প্রেরণায় তিনি অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই কবিতাটি যেন সেই যাত্রাপথেরই একটি ধ্বজাস্বরূপ। জগতের যত কিছু অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য শঙ্খ হাতে তিনি অবতীর্ণ হতে চাইলেন। সেই যুদ্ধই পৌঁছে দেবে নতুন যুগে।

কবির জীবনে একটা সময় এসেছিল যখন তাঁর মনে হয়েছিল জীবনে এখন অন্য কোন কাজের দাবি নেই, বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি পেতে শান্তি খুঁজতে চেয়েছিলেন পূজার্চনার মধ্যে। কিন্তু তখনই নীরব শঙ্খ যেন তাঁকে ইঙ্গিত করে মানুষকে এক বিরাট যজ্ঞে সামিল করতে হবে। সর্বজাতিক সেই যজ্ঞে সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে। এক ভাবীকালের উদয় হবে যে কাল হবে সর্বজাতির লোকের। এই মহান কবি-প্রতিভা যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শঙ্খ ধ্বনিত হওয়ার পূর্বেই অনুভব করেছিলেন এক মহাসত্য— এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়, মানসলোকে দেখতে পাচ্ছিলেন সেই ভাবীকাল যা নবযুগকে ঘোষণা করবে। আর তার জন্য বিশ্ববিধাতার আহ্বান শঙ্খধ্বনির মাধ্যম সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাই এই শঙ্খ অবহেলায় ধুলায় ফেলে না রেখে তাকে ধ্বনিত করতে হবে। মানবতাকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানাতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তিস্নান ঘটবে, অমঙ্গলের বিচূর্ণীকরণ ও মঙ্গলের উত্থান

ঘটবে। কিন্তু তার জন্য পৃথিবীর মানুষকে দীর্ঘরাত অতন্দ্র প্রহরীর বেশে জাগতে হবে—

"লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।"

আজ আর অমঙ্গলকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, শুভবোধের সৈনিক হিসেবে যোদ্ধৃবেশে এগিয়ে আসতে হবে, বরণ করতে হবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে।

'শঙ্খ' রচনার পূর্বে কবি গীতাঞ্জলি পর্বের মধ্য দিয়ে আসার সময় তাঁর চারিদিকে রচনা করেছিলেন পূজা পরিবেশ— জীবনের বিচ্ছেদ বেদনা ভুলে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের জন্য। কিন্তু অকস্মাৎ ধেয়ে এল মহাযুদ্ধের অশনি সংকেত, কালের দেবতার হাতের মহাশঙ্খ ডাক পাঠাল। হৃদয়ের বৈকল্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে হবে, অশান্তি ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রহস্য শেখাতে হবে মানুষকে—

"আরতিদীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথব রক্তজবার মালা?
হায় রজনীগন্ধ!"

আজ পূজার সময় নয়, রক্তজবার মালা গেঁথে যুদ্ধযাত্রায় যেতে হবে। যে শঙ্খে বিশ্বমানবের কাছে যুগের আহ্বান পাঠাতে হবে সেই শঙ্খকে পূজার উপকরণ করে রাখা চলে না। সংকীর্ণ জাতীয়তায় আট্‌কে না থেকে সর্ব-মানবের কল্যাণ-ধারাকে চালনা করার জন্য এই শঙ্খধ্বনি প্রয়োজন। মানব-ইতিহাসের নায়ক কবিকে এই পাঞ্চজন্য অর্থাৎ সর্বজনের শঙ্খের ভার দিয়েছেন, বিধাতা পুরুষের আহ্বান প্রতীক্ষা করছে ওই শঙ্খের মধ্যে। এই যাত্রা সহজসাধ্য নয়, চারিদিকে হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, দুঃস্বপ্নের মাঝেই মহোল্লাসে বাজবে মহাশঙ্খ।

১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামগড়ে থাকাকালীন কবির মনে দারুণ বেদনা অনুভূত হয়। তাঁর মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলছে। তখনই মানসলোক থেকে এই কবিতাটি কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করে। তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খবর ইউরোপ থেকে এদেশে পৌঁছয়নি, তবুও কি এক অব্যক্ত কারণে কবি-মনের বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মহাশঙ্খের আহ্বানে যৌবনমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যাত্রার মধ্যে এসেছে যৌবনের জয়গান ও গতিবেগের ভাবনা। 'বলাকা' রচনার যুগে ইউরোপের যে দম্ভ ও লোভ সর্বজাতির কল্যাণযাত্রার পথকে রুদ্ধ করে জগদ্দল পাথরের মতো সবার বুকের ওপর চেপে বসে থেকেছে— এ কখনও বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না। এতে যেমন ইউরোপের কল্যাণ

নেই, তেমনি সারা জগতের অন্তরাত্মাও প্রপীড়িত। তাই সর্বজাতির জন্য যে মুক্তি প্রয়োজন তা ইউরোপের জন্যও চাই। নয়তো সমূহ বিপদ। তাই কবি চান ভাবীকালে সবারই কল্যাণ হোক। বিধাতা কবিকে সেই মৈত্রী ও কল্যাণবার্তা বহনের ভারই দিয়েছেন। তাই ঘরে বসে থাকবার যো নেই। এই কবিতায় সেই বার্তারই প্রকাশ। নবজীবনের ধ্বজা বহন করে এগিয়ে চলার তাগিদ তিনি অমান্য করতে পারেননি। তাইতো উচ্চারিত হয়—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
.....
অভয় তব শঙ্খ।"

৪.৩ মানব-চেতনা, মৃত্যু-চেতনা ও শিল্প-চেতনা প্রসঙ্গে বলাকা-র ৭নং কবিতার আলোচনা

কবিতাটি ১৩২১ সালের কার্তিকে লেখা ও সবুজপত্রে ওই বছর অগ্রহায়ণে 'তাজমহল' শিরোনামে প্রকাশিত হলেও 'বলাকা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩-এ শিরোনাম বদ্‌লে হয় 'শাজাহান।' 'বলাকা'-য় কতকগুলি কবিতা কোন stanza-য় ভাগ না করে কবি অন্তরের কথা একবারে একস্রোতে প্রকাশ করেছেন মাঝে হয়তো একবার অল্প থেমেছেন। এটি সেই শ্রেণির কবিতা।

এর পূর্বের ৬নং কবিতাটিতে কবি নিজ-মনের বেদনা প্রকাশ করেছেন, আর এখানে শা-জাহানের বেদনার প্রতি কবি-মনের যে দরদ (sympathy) তাই প্রকাশ করেছেন। শা-জাহান জানতেন জীবন-যৌবন-ধন-মান সবই মিথ্যে, কালের স্রোতে সবই ভেসে যায়। অথচ তিনি জানতেন তাঁর অন্তরের প্রেমটিই সত্য, তাই সেই প্রেম-জাত বেদনাও সত্য। সেই অন্তর-বেদনাকেই সম্রাট চিরন্তন করে রাখতে চাইলেন, চাইলেন প্রেমকে কালজয়ী করে রাখতে। তিনি চাইলে রাজশক্তিকেও চিরস্থায়ী করে রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই শক্তি অপেক্ষা প্রেমকেই শা-জাহান চিরন্তন ও মহনীয় বলে জেনেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি লোকে যতই বজ্র-কঠিন মনে করুক, তিনি জানতেন সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতোই তা অবাস্তব। তাই ওই রাজশক্তি কালের স্রোতে ভেসে গেলেও তাঁর মৃত্যুহীন প্রেম-বেদনার দীর্ঘশ্বাসটুকু যাতে মূর্তিমান হয়ে থাকতে পারে, এটুকুই ছিল ভারত-ঈশ্বর শা-জাহানের ব্যাকুল কামনা। 'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা' একদিন থাকবে না— কারণ সে

সবই যেন মায়া। তাই প্রিয়তমা বেগম মমতাজের স্মরণে সম্রাটের একবিন্দু নয়নের জলকে কালপটে সমুজ্জ্বল করে রাখতে নির্মাণ করলেন তাজমহল। যা মায়া নয়, মূলে রয়েছে প্রেম।

কালস্রোতে মানুষ নিরুপায় হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য। প্রেম চায় প্রিয়জনের দিকে ফিরে তাকাতে, কিন্তু সেই অবকাশটুকুও নেই—

'কারো পানে ফিরে চাহিদার
নাই যে সময়,
নাই নাই।'

জীবনের খরস্রোতে কেবল এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে যাওয়া।

'এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।'

পৃথিবীর বুকেও কোনকিছুই স্থায়ী নয়, চলে মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায়ের পালা। ইংরেজ কবি শেলী-ও তাঁর কবিতা 'Hymn to Intellectual Beauty'-তে প্রশ্ন করেছিলেন, পৃথিবীতে সৌন্দর্য কেন মুহূর্তে চলে যায়, কেন বিচ্ছেদ পদে পদে ভয় দেখায়। এখানেও যেন ধ্বনিত হয় একই সুর— 'নাই নাই, নাই যে সময়।' তাই শা-জাহান চেয়েছিলেন সৌন্দর্য দিয়ে কালের হৃদয় ভোলাতে, তাজমহলের সৌন্দর্য-মালা গলায় দিয়ে মহাকালকে বরণ করে নিত্য করে রাখতে। বিলাপ করবারও তো সময় নেই। তাই সম্রাট তাঁর অশান্ত ক্রন্দনকে সৌন্দর্যের নীরবতা দিয়ে নিত্য করে বাঁধলেন। মৃত্যুহীন সৌন্দর্য দিয়ে বরণ করলেন রূপহীন মরণকে। প্রেমের যে গোপন নামে নিভৃত মন্দিরে প্রেয়সীকে তিনি ডাকতেন কানে কানে; সেই নামটি রেখে গেলেন অনন্তের কানে। সম্রাটের প্রেমের যে কোমলতা, তা তাজমহলের কঠিন পাষাণেও নিত্য হয়ে ফুটল। বিরহী যক্ষের মেঘদূতের মতো এই প্রেম-মন্দিরের বাণীও অপূর্ব ছন্দ ও গানে মেঘের পথে যাত্রা করেছে সম্রাটের বিরহিণী প্রিয়ার কাছে কোন্ অলক্ষ্যের পানে। ঊষা-সন্ধ্যা-নিশীথ-পূর্ণিমা বা খণ্ড-চন্দ্র কিরণে নব নব শোভায় শোভিত তাজমহল সম্রাটের প্রেমের বার্তাবহ— 'ভুলি নাই; ভুলি নাই, ভুতি নাই প্রিয়া!' এই বার্তা নিত্যকাল সৌন্দর্যদূত কর্ত্তৃক বাহিত হয়ে চলেছে। সে যেন 'নব মেঘদূত'।

আজ শা-জাহান নেই, নেই সাম্রাজ্য, সিংহাসন, সৈন্যদল, নীরব হয়ে গেছে বন্দীদের গান, পুরসুন্দরীদের নূপুরনিক্কণ। ঐশ্বর্য ও ভোগের সহায়, যা কিছু সে সবই বিদায় নিয়েছে, শুধু রয়ে গেছে পবিত্র সৌন্দর্য। অম্লান শ্রান্তিহীন সেই সৌন্দর্যদূত সম্রাটের প্রেমবার্তা বহন করে আজও অক্লান্ত যাত্রী। 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

কবিতাটির পরবর্তী অংশে ভাবান্তর ঘটালেন কবি। সত্যিই কি সম্রাট কিছু ভোলেননি? তিনি কি অতীতের অন্ধকারে আবদ্ধ আছেন? মুক্ত পথের পথিক তিনি। স্মৃতির পিঞ্জর খুলে তাঁর হৃদয় কি বিস্মৃতির পথে বের হয়ে যায়নি? কারণ তাজমহল তো সমাধি-মন্দির মাত্র, সেখানে মৃত্যুকেই স্মৃতির আবরণে যত্নে ঢেকে রাখা হয়। সেখানে

কি জীবনকে বেঁধে রাখা যায়? এই বিশ্বজগতে আত্মাকে কি কেউ কখনও বেঁধে রাখতে পারে? তাই স্মৃতির বন্ধন তাকে ছিন্ন করতেই হবে। না হলে বিশ্বপথে জীবন তার মুক্তি পাবে কী করে?

শা-জাহান মানব-জীবনেরই একজন প্রতিনিধি। তাঁর মানবত্ব, সম্রাটত্বের চেয়েও মহত্তর। সেই মানবত্বকে কে বাঁধবে? পৃথিবীর উৎসব শেষ হয়ে গেলে সব কীর্তিকে পেছনে ফেলে জীবনের রথ সামনে এগিয়ে চলে, কারণ 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' যে প্রেম অচল থাকে ও অচল করে রাখে সে চেয়েছিল ভারত-সম্রাটকে ধরে রাখতে, কিন্তু তিনি সেই বাঁধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তিনি সর্বভারমুক্ত পথিক; চিরযাত্রী তিনি। তাই তাঁর কীর্তি বলে—

'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

প্রিয়ার প্রেম তাঁকে বদ্ধ করতে পারল না, শক্তি ও গৌরব তাঁকে বাঁধতে গিয়ে হার মানল, সমুদ্র- পর্বত তাঁর পথরোধ করতে অক্ষম হল। তিনি এগিয়ে চললেন অসীম আহ্বানে অজানার অন্ধকারে নক্ষত্রের গানে নতুন সূর্যের প্রতীক্ষায়। একদা যে মহান গতিবীজ সম্রাটের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে তাজমহলকে বাস্তবায়িত করেছিল, সেই গতিবীজ মহীরুহ হয়ে শিল্পীর শিল্প-অতিক্রমী নিরাসক্ত জয়যাত্রার জয়বার্তা ঘোষণা করেছে। তাই এখানে আর্টের থেকে শিল্পী বড় হয়ে উঠেছেন। যে শিল্পী বন্ধনহারা স্মৃতিভারমুক্ত— প্রাণের মহাপ্রবাহ বা গতির সঙ্গে যুক্ত। তাই—

'যত দূর চাই
নাই নাই, সে পথিক নাই।'

সত্য বিরাট বলেই যে তার চিরন্তন গতি পথে অসংখ্য স্থানগত ও কালগত সব স্বরূপকে ত্যাগ করে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। কোন এক বিশেষ-বিগ্রহতে বদ্ধ থেকে গেলে বিরাটত্বের কোন অর্থই থাকত না।

'বলাকা' কাব্যের গতির সুর এই কবিতাতেও ধরা পড়েছে। অখণ্ড অনন্ত কালপ্রবাহ, তাতে ভেসে চলেছে এই জীবন। পূর্ণতা থেকে রিক্ততা জীবন-প্রবাহে কোন ছেদ নেই। পথের সব সঞ্চয় ফেলে যেতে হয়। এই তীব্র গতির মধ্যে শা-জাহানের জীবনও গতিবান। তাই তাঁর প্রেমের বিশেষ অনুভূতি তাজমহলের মধ্যে ধরে রাখলেও শা-জাহানের মানবত্ব ভেসে যায় মহাকালের স্রোতে, সে লোক-লোকান্তরের যাত্রী। তাকে না তাজমহলে, না ভারত সাম্রাজ্যে, না শাজাহান নামধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে কোনো একখানে ধরে রাখা যায়।

১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'উত্তর প্রত্যুত্তর' নামক তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'রুদ্ধগৃহ'-এ কবি লিখছেন— "এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। ...জীবন যেমন আসে জীবন

তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন!" আবার 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে মত্ ব্যক্ত করছেন— "প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত।" অন্যদিকে 'উত্তর প্রত্যুত্তর'-এ লিখছেন— "প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর এক দিতেছে। ...বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্যপথ দেখি না।" বুঝতে অসুবিধা হয় না 'শাজাহান' কবিতার সুর যেন বাঁধা হয়ে গিয়েছিল এইসব প্রবন্ধেই। যে-সুর বাঁধতে কবিকে সাহায্য করেছিল প্রাচ্য গতিবাদের ধারণা। যে ধারণা হয়তো বেদ-উপনিষদের পূর্ব থেকেই চলে আসছে। দীনতম মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সম্রাট পর্যন্ত সবাই সেই বিশ্বপ্রবাহে যাত্রা করেছেন।

৪.৪ বলাকা-র গতিবাদ ও ৮নং কবিতা

'বলাকা'-র পূর্বে 'ক্ষণিকা' (শ্রাবণ, ১৩০৭)-তে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পথিক, তবে নিরুদ্দেশের। পথই চরম, কোন শেষ নেই। 'বলাকা'-তেও কবি পথিক, তবে পথের শেষ আছে। কবির এই স্বভাবজ পথিকসত্তা 'বলাকা' কাব্যে যে গতিবাদ নিয়ে এলো প্রথমে আমরা তার স্বরূপ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাচ্যের সন্তান রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই গতির উপাসক। এদেশে গতির ইঙ্গিত সর্বত্র। ঔপনিষদ ধর্ম কবির সংস্কারের মর্মমূলে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঋগ্বেদে আছে—

"উরৌ দেৱা অনিবাধে স্যাম্।" (ঋগ্বেদ ৫/৪২/১৭)

যার অর্থ, 'হে দেবগণ আমরা যেন সেই বৈপুল্যে থাকতে পারি যার গভীরে নেই চলার বাধা।

আসলে পরম সত্য একইসঙ্গে চলছেন আবার চলছেন না, তাই উপনিষৎ বলছেন—

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।" (ঈশোপনিষৎ-৪)

তিনি (সেই আত্মতত্ত্ব) অচল এক এবং মন থেকেও বেগবান। ইনি স্থির থেকেও দ্রুতগামী অপর সবাইকে অতিক্রম করে যান।

আবার কঠোপনিষৎ বলছেন—

"সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" (কঠোপনিষৎ- ১/৩/১১)

অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরম গতি।

জীবাত্মা সংসারে আসে অনাসক্তরূপে, যায়ও অনাসক্তরূপেই। ঠিক যেমন হংসশ্রেণি কোন্ সুদূর থেকে আসে আবার সময় হলেই সেখানে ফিরে যায়, নদীর চরে থাকে কিন্তু কখনো বাসা বাঁধে না। হংসের এই গতিময় জীবনের সঙ্গে আত্মার তুলনা চলে। উপনিষদেও বলা হচ্ছে—

'একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে।' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

— (অবিদ্যাঘাতী) পরম আত্মা একা এই মহাভুবন মাঝে বিরাজ করেন। বা, 'এষ খলু আত্মা হংসঃ।' (মৈত্রী উপনিষৎ-৬/১) বস্তুত, গতির কথাই সর্বত্র। ঋগ্বেদে পাই—

জল দাঁড়ালেই হয় বদ্ধজল, চললেই হয় নদী—

'চরন্তি যন্নদ্যস্তসথুরাপঃ।' (ঋগ্বেদ-৫/৪৭/৫)

এই একই সুর যেন ধ্বনিত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও—

'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি

চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন

তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি।'

—চলাই অমৃত, চলাই অমৃত ফল। সূর্য সদা সচল বলেই তার আলোক-সম্পদ সদাই অফুরন্ত। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

এমন অপূর্ব চলার তাগিদ জগৎ সাহিত্যে দুর্লভ। ঠিক যেমন কঠোপনিষৎ বলছেন—

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং

প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' (কঠোপনিষৎ-২/৩/২)

—চিরচঞ্চল এই বিশ্বের বস্তুপুঞ্জধারা তাঁর থেকে নিঃসৃত। তাঁরই মাঝে চিরকাল ধরে অসীম সুখে কম্পিত অর্থাৎ ধাবিত।

ঈশোপনিষদও বলেন—

'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।' (ঈশোপনিষৎ-৫)

—সচল ও অচল, দূর ও নিকট অর্থাৎ গতি ও স্থিতি পরস্পর অচ্ছেদ্য।

কিন্তু কেবল বেদ বা উপনিষৎ নয়, ভারতীয় অন্যান্য ধর্মেও এই গতির তাগিদ রয়েছে। মধ্যযুগের সাধকদের গতিতেই সাধনা, গতিতেই তাঁদের সিদ্ধি। তাই সাধক কবীর বলেন—

"বহতা পানী নির্মলা

বন্ধা গংধিলা হোয়।"

—বহলা জলধারাই নির্মল, বদ্ধ জলই দূষিত।

কিংবা, দাদূ বলেন— "পীছৈ হেলা যিনি করৈ

আগৈ হেলা আর।"

—পিছে ফিরলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে।

রবিদাস বলেন, বিশ্বচরাচরের গতি যদি এক পলের জন্য বন্ধ হয় তবে চন্দ্রসূর্য সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—

"পল এক গতি বংধ জৈ

রেজ রেজ চন্দভান।"

অর্থাৎ, ভারতবাসীর রক্তের মধ্যেই গতির এক তাগিদ আছে। জৈনদের 'ঊর্ধ্বগমন'-ও সেই কথাই বলে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদেও স্থির সত্য বলে কিছু দাঁড়ায় না, সবকিছুই প্রতিক্ষণে হচ্ছে ও বিনাশ পাচ্ছে।

কবির জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই চলার ব্যাকুলতা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় আরও শক্তিলাভ করে। ইংরেজ কবি শেলী তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Ode To The West Wind'-এ লিখেছেন—

'Drive my dead thoughts over the universe

Like withered leaves, to quicken a new birth.'

—পশ্চিমী ঝড়, আমার মৃত চিন্তাকে ঝরাপাতার মতো পৃথিবীর বুকের উপর থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাও, এভাবেই ত্বরান্বিত করো নতুন জন্ম।

পাশ্চাত্যে গতিচিন্তার প্রসঙ্গে উঠে আসে ফরাসী দার্শনিক Henri-Louis Bergson (১৮৫৯-১৯৪১)-র লেখা 'L' Evolution creatrice' (১৯০৭) (ইংরেজি অনুবাদ Creative Evolution, ১৯১০) বইটির কথা। যেখানে তিনি গতির ব্যাখ্যায় 'Elan vital' শব্দটি প্রয়োগ করেন। যার ইংরেজি তর্জমা দাঁড়ায় 'vital impetus' বা 'vital force', যা ব্যাখ্যা করে— 'evolution in a less mechanical and more lively manner, as well as accounting for the creative impulse of mankind.'

এই বইতে Bergson, Darwin-এর অভিব্যক্তিবাদের এক পরিবর্ত ব্যাখ্যা আনেন। তিনি বলেন অভিব্যক্তি আসে এক vital impetus থেকে, যাকে বোঝা যায় মানবতার স্বাভাবিক creative impulse হিসেবেও। Bergson আরও বলেন, কালের অভিজ্ঞতা 'duration' ভালো বোঝা যায় 'creative intuition' দ্বারা, 'intellect' দ্বারা নয়।

অর্থাৎ, এই দার্শনিক, বুদ্ধি বা 'intellect'-এর থেকে বোধি বা 'intuition'-এর উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন, ঠিক যেমন রোমাণ্টিকেরা যুক্তির চেয়ে কল্পনা (imagination) ও বোধির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

Bergson-এর মতে, 'The truth is that we change without ceasing and that the state itself is nothing but change'—আমরা অবিরাম পরিবর্তিত হই এবং পরিবর্তনই হচ্ছে অস্তিত্ব। 'Duration is the continuous progress of the past which grows into the future and which swell as it advances'—কালবোধ হচ্ছে অতীতের ক্রমাগত অগ্রগতি যা ভবিষ্যতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যতই সামনে এগিয়ে যায় ততই পরিস্ফীত হয়। 'Thus our personality shoots, grows and ripens without ceasing. Each of its moments is something new added to what was before'—আমাদের ব্যক্তিত্ব না থেমে অবিরাম বিকশিত হয়। এতে প্রতি মুহূর্তে সংযোজিত হয় নব নব উপাদান। 'for a conscious being, to exibit is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly'—চেতন প্রাণীর পক্ষে থাকার অর্থ পরিবর্তন, আর পরিবর্তনের অর্থ পরিণত হওয়া, পরিণত হওয়ার অর্থ নিজেকে অশেষভাবে সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, 'vital impetus passing through matter'—বস্তুর ভিতর দিয়ে ভ্রমণরত অপরিহার্য প্রাণবেগ, যা মানুষ পশুপাখী গাছপালা শক্তিকে ক্রমপুঞ্জিত করে বা জাগিয়ে তোলে, তাকে নমনীয় প্রবাহপথে পরিচালিত হতে দেয়, এভাবেই সে অসীম বিচিত্র কর্ম সম্পন্ন করে।

তাঁর মতে, 'Life as a whole, from the initial impulsion that thrust it into the world, will appear as a wave which rises, and which is opposed by the descending movement of the matter. On the greater part of its surface, at different heights. the current is converted into a vortex. At one point alone it passes freely. dragging. with it the obstacle which will weigh on its progress but will no stop it. At this point is humanity.'

—এই বিশ্বে জীবন এক ঢেউয়ের মতো, যাকে বাধা দেয় বস্তুর অবরোহী গতি। সেই বস্তু ও জীবনের ঢেউ সংঘাত এক ঘূণাবর্তের জন্ম দেয়। একটা বিন্দুতে জীবনের ঢেউ মুক্তভাবে বয়ে যায়, একে বাধা দিয়েও পারে না, বরং ঢেউ বস্তুকেই তার সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়। এই বিন্দুতেই মানবতার অবস্থান। অর্থাৎ, প্রাণবেগ শক্তির ক্রিয়ার বশে মানুষের অবিরাম যাত্রার দিকটিই এই দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। অস্তিত্বের অর্থই পরিবর্তন—'to exist to change' আর তিনি যখন বলেন আমাদের মধ্যে এই প্রাণবেগকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধি দিয়ে অনুভব করি, সেখানেই দার্শনিকের সঙ্গে রোমাণ্টিক কবির সাযুজ্য ঘটে যায়। 'বলাকা' রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে Bergson-এর গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঔপনিষদিক ও দেশীয় ঐতিহ্য থেকে যে নির্যাস আহরণ করেছিলেন

তার সঙ্গে কোথাও এই পাশ্চাত্য দর্শনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ইউরোপে উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা ঘটেছিল, সেইসূত্রে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবির ধারণা গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। বলা চলে এই দার্শনিক তত্ত্ব কোথাও কবির গতি সম্পর্কিত ধারণাকে আরও প্রভাবিত করেছিল।

৪.৪.১ ৮ নং কবিতার আলোচনা

এলাহাবাদে থাকাকালীন ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ রাত্রিতে কবি এই কবিতাটি রচনা করেন। 'সবুজ পত্র'-এ ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'চঞ্চলা' শিরোনামে। বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবিন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির কথা জানান— এলাহাবাদে পৌষ মাসে খুব শীত। আকাশ পরিস্কার। তিনি ছাদে বসে আছেন সূর্যাস্তের পর যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো, আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ তারা ফুটে উঠল। এ সময় সহসা তাঁর 'আকাশব্যাপী অন্ধকারকে মনে হল যেন অদৃশ্য সৃষ্টিধারা, যার বেগ অবোধ্য। এই দৃশ্য নক্ষত্রতারার পুঞ্জগুলি মনে হল সেই বিরাট সৃষ্টিধারার উপরকার ফেনপুঞ্জ।' (গ্রন্থ ভূমিকা, বলাকা কাব্য-পরিক্রমা, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, পৃ: ৭২)

ঠিক এমনই উপলব্ধি হয়েছিল কবির, যখন তিনি পদ্মার ক্রমাগত চলমান অবোধ্য বারিবেগ ও সেই বেগসৃষ্ট ফেনা দেখেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছিল এই বিশ্বে সর্ব চরাচর ভরে যে অদৃশ্য গতি চলছে তার সবটুকু দেখা যায় না, কেবল একটুখানি ওই ফেনার মতো ভেসে থাকে। তার তলায় যে অগাধ অসীম গতি আছে তা শুধু ধ্যানযোগে উপলব্ধি করতে হয়।

এলাহাবাদে সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে বিরাট অন্ধকার তিনি দেখেছিলেন তা কবির 'মনে হচ্ছিল ... যেন ...অদৃশ্য অতল অপার বিরাট্ বিশ্ব-নদী। জলে একটা ঢেলা ফেললে প্রথম একটি তরঙ্গ-চক্র হয়। সেই তরঙ্গ-চক্র আরু একটি বৃহত্তর তরঙ্গ-চক্রকে উৎপন্ন করে, এমনি করে চক্রমালা বেড়েই চলে। ...পৃথিবী ঘুরচে সূর্যের চারদিকে, সৌরজগৎ ঘুরচে আর কোনো তারাকে, আবার সেই তারমণ্ডল ঘুরচে আর কোনো কিছুর চারদিকে, কোথাও কি তার শেষ আছে? এই ভ্রাম্যমাণ চক্রমালার কোথায় অবসান? সেটাও আমাদের শুধু ধ্যানগম্য সত্য, প্রত্যক্ষ তার নাগাল পায় না।' মনে পড়বে Bergson-এর 'intellect' অপেক্ষা 'intuition'-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা। কবি যেন তাঁর এই উপলব্ধিকেই সেই রাতে রূপ দিলেন ৮নং কবিতার ছত্রে ছত্রে। তিনি লিখলেন—

'হে বিরাট নদী;
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল

চলে নিরবধি।

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে

পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;

.....

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে

স্তরে স্তরে

সূর্যচন্দ্রতারা যত

বুদ্‌বুদের মতো।'

এই নদী 'ভৈরবী' 'বৈরাগিণী'-র মতো নিরাসক্ত হয়ে নিরন্তর ছুটে চলেছে। সেই গতি-সঙ্গীতের সুর শব্দহীন, কবির প্রশ্ন—

'অন্তহীন দূর

তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?'

তার ডাকেই পত্র-মুকুল-ফুল-ফল-বীজ সব ছড়িয়ে সর্বচরাচর ছুটে চলেছে—

'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও

উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও,'

আর এই চলার আনন্দে সব উড়িয়ে লুটিয়ে দেওয়ার জন্য কোন শোক বা ভয় কাজ করে না—

'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।' রিক্ততাতেই এই যাত্রার পূর্ণতা। কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাই কিছুই বিকৃত হয় না। তাই যে অনাসক্ত হয়ে নিরন্তর চলতে পারে সে সদাই শুদ্ধ, পবিত্র।

'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,

তুমি তাই

পবিত্র সদাই।'

চলার পথে এই যে ক্ষয় তা নবজীবনের ঐশ্বর্যে ক্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গতির বেগে মৃত্যুও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই গতি যে মুহূর্তে থম্‌কে দাঁড়াবে সেই মুহূর্তে সচল বিশ্ব অচল হয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর কঠিন পর্বতসম রুদ্ধ প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। সেই অচলের সঞ্চয়ে বিকার ঘটবে, ক্রমে তা পৃথিবীর উপরিস্থিত শূন্য অন্তরীক্ষে আঘাত হানবে, ফলে বিশ্বজগতে

শূলবেদনা তৈরি হবে। সদা চলমান বলেই নিখিল প্রবাহ এত ভারহীন সহজ সুন্দর। যে মুহূর্তে তা অচল হয়ে পড়বে অচলের বিকৃতিতে তার সহজতা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে কলুষিত হয়ে পড়বে। ভীষণ শূলের বেদনায় বিদ্ধ হয়ে ক্ষতবিক্ষত হবে।

তাই এই চলাতেই বিশ্বের সৌন্দর্য। চলার ছন্দে বিশ্বজগত পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠে। শূন্য অন্তরীক্ষও তাই নির্মল নীল। কবির মনেও সেই 'অকারণ অবারণ চলা'-র দোলা লেগেছে। তাই কবির মনও উতলা। বক্ষস্পন্দে, নাড়ীতে নাড়ীতে যে ঢেউ উঠেছে তা একান্ত কবিরই অনুভূতিতে জাগরুক। আর সেই ক্ষণে কবির স্মৃতিতে কোন্ অনাদি কালের রহস্য জেগে ওঠে— যুগে যুগে রূপ থেকে রূপে প্রাণ থেকে প্রাণে তিনি ধাবিত হয়ে চলেছেন। আজ যেখানে এসে পৌঁছেছেন Bergson ঠিক যাকে বলেছিলেন 'One point' যেখানে মানবতার অবস্থান, সেখানে কবি অবস্থান করছেন, পথে যা কিছু সঞ্চয়, যত গান সব বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। আজ আবার সম্মুখে যাত্রার সময় এসেছে, সে যাত্রা 'অকূল আলোতে।' অতীতের সঞ্চয় ফেলে সম্মুখের মহাস্রোতে।

এখানে ধ্বনিত হয়েছে কবির 'সর্বানুভূতি'-র কথা— সবার মধ্যে আমি-র অনুভূতি। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৭০ সংখ্যক পত্রে কবি লিখছেন— "...এক সময়ে আমি যখন এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো গড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যাম রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত... তাই যেন মনে পড়ে।"

কখনও লিখছেন, "...আমি বেশ মনে করতে পারি বহু পূর্ব যুগে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। ...তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি।" (ছিন্নপত্রাবলী : পত্র ৭৪)

এই যে যুগে যুগে বহমান নিজ প্রাণঅস্তিত্বের কথা কবি লিখছেন একই কথা পাচ্ছি 'চঞ্চলা' কবিতাতেও—

'মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।'

এই জীবনদর্শনের সঙ্গে চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution)-এরও যোগ আছে। মানুষ যে বিবর্তনের পথে এসেছে অতীতের প্রাণ-প্রবাহের

সঙ্গে তার যেমন যোগ আছে, ভবিষ্যতের প্রাণ প্রবাহের সঙ্গেও তার তেমনি যোগ থাকবে। কবিও বললেন— 'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া' বা 'সম্মুখের বাণী/নিক তোরে টানি/মহাস্রোতে?

এভাবেই চিরচঞ্চল চিরপথিক কবি আসক্তির সঞ্চয়কে ত্যাগ করে 'অকূল আলো'র ভুবনে যাত্রা করেন।

৪.৫ 'বলাকা' নাম-কবিতার আলোচনা (৩৬ নং)

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক কবিতাটি 'সবুজ পত্র'-এ ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি শ্রীনগরে ওই সময়ই কবিতাটি লেখেন। পত্রিকা-প্রকাশে কবিতাটির শিরোনাম 'বলাকা'।

এই কবিতা রচনার সময় কবি কাশ্মীরে শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে বোটে থাকতেন। একদিন চারিদিক সব স্তব্ধ, হঠাৎ কবির মাথার উপর দিয়ে একদল বলাকা উড়ে যায়। কবির মনে হয় এই বলাকার মধ্যে একটি মর্মকথা (idea) আছে— নদীর চরে এরা বাসা বাঁধল, ডিম পাড়ল, সব ঠিক করে বসল— তখন আবার কোথা থেকে কিসের আবেগ এল যে এক অজ্ঞাত বাসার দিকে সে উড়ে চলল। সর্বত্রই এই চলবার লীলা। কেনই বা এই ব্যাকুলতা। বলাকার এই যে সার বেঁধে চলা এই তো বিশ্বসঙ্গীতের স্বর-পঙ্‌ক্তি। একই বিশ্বসঙ্গীত— 'চঞ্চলা'-য় তার একরকম রূপ, 'বলাকা'-য় তা ভিন্নভাবে বলা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন সবই স্থির মনে হয় তখন এই বুনো হাঁসের দলের পাখার শব্দ বেগের খবর দিয়ে যায়। তিনি জানাচ্ছেন যেখানে বোটে থাকতেন সেখানে ঝিলম নদীটি খুব বেঁকে গেছে। সন্ধ্যার আলোয় এতক্ষণ ওই বাঁকা নদী তলোয়ারের মতো ঝলমল্ করছিল, ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হতেই যেন ওই উজ্জ্বল তলোয়ার কালো খাপে প্রবেশ করল। ক্রমশ কালো অন্ধকারে কেবল তারার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। পর্বতের তলদেশে দেবদারু শ্রেণিও ঢাকা পড়েছে জমাট অন্ধকারে। দেখে মনে হয়, সৃষ্টি যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু এই গাঢ় জমাট অন্ধকারে সেই অব্যক্ত ধ্বনি প্রকাশের অভাবে গুমরে গুমরে উঠছে। ঠিক তখনই হংস-বলাকা 'রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসি' তুলে সমস্ত স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে চলে গেল। শিহরিত হল আঁধারমগ্ন গিরিশ্রেণি, দেবদারুসারি।

সহসা এই পাখার বাণী সান্ধ্য স্তব্ধতার অন্তরে অন্তরে যেন বেগের আবেগ জাগিয়ে দিল। অচল পর্বত চাইলো বৈশাখী ঝোড়ো মেঘের মতো উধাও হতে, স্থাবর তরুশ্রেণি 'মাটির বন্ধন ফেলি' চায় দিশাহারা হয়ে উড়ে যেতে। এভাবেই সন্ধ্যার বোবা স্বপ্ন টুটে গিয়ে কোন্ 'সুদূরের লাগি' 'বেদনার ঢেউ' জেগে উঠল। বলাকার পাখা তাদের বিবাগী সুর শুনিয়ে নিখিলের প্রাণে এই বাণীই বাজিয়ে দিয়ে গেল—

'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'

এভাবে সেই রাত্রে কবির কাছেও যেন বলাকাশ্রেণি স্তব্ধতার আবরণ খুলে ফেলে, যাতে তিনি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে একইরূপ পাখার 'উদ্দাম চঞ্চল' শব্দ শুনতে পান। শুনতে পান তৃণদল মাটির বুকে ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে, মাটির নীচের অঙ্কুরের পাখা মেলছে লক্ষ লক্ষ বীজ, গিরিরাজি, বন উন্মুক্ত ডানা মেলে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে চলেছে, নক্ষত্ররাজির পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকিত হয়ে উঠছে।

একইভাবে মানবজগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা যুগ হতে যুগান্তরে ক্রমাগত উড়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পানে। কবি অনুভব করছেন তাঁর আপন অন্তরের আশা-আকাঙক্ষাও সেইসব নিরন্তর বয়ে চলা তাবৎ আশা-আকাঙক্ষার সঙ্গে উধাও হয়ে চলেছে 'কোন্ পার হতে কোন্ পারে!' অতঃপর কবির উপলব্ধিতে জাগছে, সমগ্র বিশ্বে একটিই বাণী ধ্বনিত হয়ে চলেছে—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

একই কথা কবি 'নৈবেদ্য'-তে বলেছেন—

"ঘরের ঠিকানা হোলো না গো,

মন করে তবু যাই যাই..."

এই যাওয়া অবিরাম, অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে 'অজানা হইতে অজানায়'। এ-চলা Bergson-র 'অকারণ-অবারণ' চলা নয়, এই চলা অতীতের সঞ্চয়ের বিকার সরিয়ে ভবিষ্যতের প্রাণ-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়ার চলা, আলোকের দিকে চলা।

এভাবে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা হিসেবে এই কবিতাটি সমগ্র কাব্যের মূলসুরটি ধারণ করে আছে। তাই 'হেথা নয়, অন্য কোথা' এই ভাবনার মৃত্যু ঘটে না, নিয়ত স্পন্দিত হয় সমগ্র বিশ্বের অন্তরে অন্তরে।

৪.৬ মানব-চেতনা ও মৃত্যু-চেতনা প্রসঙ্গে ১৯ নং কবিতার আলোচনা

অনুভূতি ক্ষমতা, অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য-অনুভব, প্রেমচেতনা সর্বোপরি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে এই বিশ্বের সার্থক সৃষ্টি মানুষ। মানুষ তার শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়েই এই মরণশীল জগতে তার অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে যেতে চায়। একদিকে এই বিশ্বের যা-কিছু সবের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অন্যদিকে মৃত্যুর অলঙঘ্য অনস্বীকার্য অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণ— এই দুই সত্যের সংঘাতে কবিচেতনার বিকাশ— জীবন সত্য, মৃত্যুও সত্য কিন্তু এরা বিপরীত নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। জীবনের গতি-প্রবাহে ক্রমশ একের উদ্ভব অপরের লয় প্রাপ্তি— এভাবেই পূর্ববর্তীর বিনাশের মধ্য দিয়ে পরবর্তীর আগমন। পূর্ববর্তীর আপাত ব্যহ্যিক বিনাশ ঘটলেও আসলে পরবর্তীর মধ্যেই তার সত্তা গোপন থাকে। এভাবেই জীবন ও মৃত্যুর ধারণার মধ্যে একাকার হয়ে যায় গতির ধারণা। বহু

পূর্বেই এই অনুভূতি কবি-হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছিল—

'দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়—
আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন।'

(চিরনবীনতা/কণিকা)

জীবন ও জগতের প্রতি ভালোবাসাই এই অনুভূতির জন্মদাত্রী। তাই শেষ পর্যন্ত কবির জীবন ও জগৎ একাত্ম হয়ে যায়, কোন ভেদ থাকে না।

'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এর;
.....
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।'

এই ভালোবাসা কবির কাছে একান্ত সত্য, কিন্তু আরও এক অমোঘ সত্য আছে, তা হল মৃত্যু।

'তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।'

আর সেই মৃত্যু যেন সব ভালোবাসার বিরোধী, সব সৃষ্টির শেষ কথা। কবি অজস্র কথা দিয়ে অবিরাম এই জীবনকে প্রকাশ করে যান, কিন্তু মৃত্যু এলে কবি জানেন—

'মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।'

একদিকে জীবন সত্য, অন্যদিকে মৃত্যুও সত্য— কীভাবে এমনটা সম্ভব।

'এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।'

কবির বিশ্বাস— এ দুইয়ের মাঝে নিশ্চয় কোন মিল আছে, নচেৎ জগতের সঙ্গে

মানুষের এমন সম্পর্ক প্রবঞ্চনা হতো, সবকিছু সৌন্দর্য হারাত। কিন্তু কবি এই জগৎকে নিত্য নতুন সৌন্দর্যে সজ্জিত দেখেন, সুতরাং মৃত্যুই চরম সত্য নয়, হলে বিশ্ব তার সৌন্দর্য নিয়ে এভাবে হাজির হতো না। আসলে মৃত্যু জীর্ণ-জীবনকে নবীন করে তোলে। 'বলাকা'-র সমসাময়িক 'ফাল্গুনী'-তেও এই চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। মৃত্যু রূপ (form)-কে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়, জীবন তখন অসীমের মধ্যে ব্যক্ত হয়। নাহলে জীবনের প্রসারণশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডিতে বদ্ধ হয়ে মনের প্রসারণশীলতা নষ্ট করে ফেলে তখনই একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। সীমার বেড়াকে ভেঙে এভাবেই মৃত্যু জীবন-প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

জীবনের বৃত্ত পরিণত হলেই তাকে দ্বার ভেঙে এগিয়ে যেতে হয় বৃহত্তর মুক্তির জন্য। তখন পূর্বজীবনের স্মৃতি ফেলে, সামনে এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য। এইভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধাপের সঙ্গে জীবন যুক্ত হয়ে এগিয়ে চলে। সব ধর্মের মূল কথা যা দেখছি তার চেয়ে যা অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশি মূল্যবান। তাই যা প্রত্যক্ষ তাকে মানুষ আঘাত করছে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, তখনই মানুষ তার গণ্ডি অতিক্রম করে সত্যকে লাভ করল। 'ভূমৈব সুখম্' এই বিশ্বাসের প্রেরণা থেকে মানুষ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে আঘাত করে ক্রমে অমৃত লাভ করে। প্রত্যেক বস্তুরই কিছুটা প্রকাশিত আর কিছুটা আচ্ছন্ন অংশ থাকে। যা আচ্ছন্ন তাকে বিরুদ্ধ শক্তি আঘাত না করলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যুই সেই প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান করে। এতেই বস্তুর নূতন নূতন প্রকাশ হয়।

৪.৭ ঈশ্বর-চেতনা প্রসঙ্গে ২২ নং কবিতার আলোচনা

কবির বিশেষ অধ্যাত্ম চেতনার পরিচায়ক এই কবিতা। কবি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকেই এখানে তাঁর চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। মানুষ যতক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে সত্তায় একাত্ম হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে ঈশ্বরকে অনুভবের বিষয়রূপে পায় না। ততক্ষণ তার শৃঙ্খলিত দশা এবং—

"রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে

পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,"

পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করার জন্য উভয়ের মাঝে মানস-মুক্তি প্রয়োজন, সেই মুক্তির অবকাশেই মানুষ ঈশ্বরকে অনুভব করবে। তাই একাকার হয়ে নয়, বিচ্ছেদের মধ্যেই সম্ভব সেই অনুভূতি। উপনিষদে আছে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'— সত্যের মধ্যে সকল জীব জড়ের সঙ্গে মানুষও এক হয়ে বাস করে, পরে জ্ঞানের ছোঁয়ায় মানুষ সেখান থেকে স্বতন্ত্র হয়, আবার সত্যের অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে জ্ঞান তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। মানুষ প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির অধীন— তখন সে সুখ চায়, শান্তি চায়; এরপর মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে তার মনে দ্বিধা আসে— সে সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ দুই বিরোধের সমাধান

খোঁজে, এদের মধ্য থেকেই সে শ্রেয়কে খোঁজে। এরপর আসে সুখ-দুঃখ, ভোগ-ত্যাগ, জীবন-মৃত্যুর অদ্বৈত অবস্থা— যেখানে দুঃখের মধ্য দিয়েই সুখে উন্নীত হওয়া যায়। এভাবেই জীবন থেকে মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা চলে। মানুষ এই পথে চলে অমৃত লাভ করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে দুঃখ বা মৃত্যুকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই। তাকে পেরিয়ে যেতে হবে, এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ বিচ্ছেদই চেতনা আনে। যেমন করে গর্ভস্থ শিশু মায়ের উপস্থিতি অনুভব করে না— ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মাকে চেনে, তেমনি বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরকে অনুভব করে। ক্ষুদ্র সীমার গণ্ডি কেটে বৃহতের পথে যাত্রা মানুষকে মুক্তি দেয়, অমৃতে আনন্দে উত্তীর্ণ করে। মাঝে থাকে দুর্গম পথ— যা পেরিয়ে চলে আনন্দের পথে অবিরাম যাত্রা। তাই মানুষের প্রার্থনা— 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।'

৪.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'বলাকা'-র প্রথম কবিতার রচনাকাল ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস আর শেষ কবিতার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ। দুই বৎসর ধরে এই কাব্যগ্রন্থের রচনা চলেছে। অতঃপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯১৬) জ্যৈষ্ঠ মাসের পর 'বলাকা' মুদ্রিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র কাব্য জুড়ে বারবার এসেছে স্তব্ধতার স্থবিরতা ঘুচিয়ে গতির সুরের কথা— সে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মঙ্গলের উত্থান ঘটানোর মধ্য দিয়ে অথবা যৌবন ধর্মকে আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে কখনো অতীতের সঞ্চয় সরিয়ে ফেলে ভবিষ্যতের পানে নিরন্তর পথ চলার মধ্য দিয়ে। কবি এখানে উপলব্ধি করেছেন গতিই জীবন, থেমে যাওয়াই মৃত্যু। ঔপনিষদিক চিন্তাধারায় স্নাত কবি তাই বারবার পথ চলার গান শোনান। আর সেই গানকে আপনবেগে চলা নদীর মতো বাঁধনহারা ছন্দে সাজিয়ে তোলেন। বিষয় ও ছন্দের যুগলবন্দিতে 'বলাকা' কাব্য তার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে। উল্লিখিত এই কথাগুলি বর্তমান বিভাগে নির্বাচিত কবিতাগুলির আলোচনায় সাবলীলভাবে উঠে এসেছে।

৪.৯ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Summing Up)

(১) 'বলাকা' কাব্যের কোন্ দুটি কবিতায় নতুনের আহ্বান ও আসন্ন সংঘর্ষের স্বীকৃতি রূপ-লাভ করেছে? কবিতা দু-টি আলোচনা করুন।

(২) 'বলাকা' কাব্যের ৭ নং কবিতার আলোচনার মাধ্যমে মানব-চেতনা, মৃত্যু-চেতনা ও শিল্প-চেতনার মূল্যায়ন করুন।

(৩) 'বলাকা' কাব্যের ৮ নং কবিতায় কীভাবে গতিবাদের তত্ত্ব রূপ-লাভ করেছে আলোচনা করুন।

(৪) 'বলাকা' নাম-কবিতার সার্থকতা বিচার করুন।

(৫) 'বলাকা' কাব্যের ১৯নং কবিতায় মানব-চেতনা ও মৃত্যু-চেতনা কতটুকু ফুটে উঠেছে আলোচনা করুন।

(৬) 'বলাকা' কাব্যের ২২নং কবিতা অবলম্বনে ঈশ্বর-চেতনার স্বরূপ আলোচনা করুন।

৪.৯ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলাকা— বিশ্বভারতী সংস্করণ।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্ররচনাবলী— পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১, ২, ৩।

৩। ক্ষিতিমোহন সেন— বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা।

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন— ছন্দ পরিক্রমা।

৫। নেপাল মজুমদার— ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১ম খন্ড)।

৬। জগদীশ ভট্টাচার্য— রবীন্দ্র কবিতাশতক, তিন দশক।

৭। Henry Bergson, Creative Evolution – The Modern Library, New York.

* * *

বিভাগ-৫
রক্তকরবী
রক্তকরবী : কাহিনিবৃত্ত

বিষয় বিন্যাস

৫.০ ভূমিকা (Introduction)
৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৫.২ নাটকের আখ্যানভাগ
৫.৩ আখ্যান বিশ্লেষণ
৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৫.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

প্রযুক্তিনির্ভর প্রাচুর্যলালসায় মত্ত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণিগত নিষ্পেষণের নির্মম বাস্তব চেহারা 'রক্তকরবী' নাটকে ফুটে উঠেছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনিক-নিয়ন্ত্রিত সমাজ-কাঠামো শ্রমিকদের উপরে যে দুঃখ নিষ্পেষণ চলিয়ে যায়, তার এক অত্যন্ত বাস্তব বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে এই নাটকে। 'রক্তকরবী' নাটকে কবি দেখাতে চেয়েছেন পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতা, জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার মানুষকে কীভাবে পশুস্তরে নিয়ে যাচ্ছে। যান্ত্রিক ধনতন্ত্র ও সর্বগ্রাসী বস্তুশক্তির আবর্তে পড়ে প্রাণের স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাবিহার লুপ্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রসারতার দানবীয় শক্তি মানবতাকে আচ্ছন্ন করে ব্যক্তিমানুষকে শ্রেণিমানুষে পরিণত করেছে। জড়সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের জীবন থেকে প্রেম সৌন্দর্য ছন্দ, তার রূপ-রঙ-রস সবই হরণ করছে। জীবনের সহজ-স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করে অর্থগৃধ্নু মানুষে অস্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে বিষবৃক্ষের মতো বাড়িয়ে তুলেছে।

'শারদোৎসব' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের যে নতুন নাট্যধারার সূচনা হয় তার প্রধান দিক হল আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্যতত্ত্বের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তুত এগুলি ব্যক্তিমনের অধ্যাত্মভাবনার অনুষঙ্গ বাহিত। কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকের নাট্যপ্রেণার মূলে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যাপক কালচেতনার চাপ। আপন হাতে গড়া বিজ্ঞান-দর্পী যন্ত্রশক্তির দানবিক লোভ ও আগ্রাসনের জালে বন্দী মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ মর্মমন্থন, যন্ত্রের মতোই তৃপ্তিহীন অস্থিরতা অর্থাৎ পশ্চিমে প্রত্যক্ষ করা নব্যধনতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায়

মানুষের চূড়ান্ত অপঘাতের সমগ্র স্বভাব ও তার সম্ভাব্য পরিণতির রূপরেখাটি 'রক্তকরবী' নাটকে দেহধারণ করেছে।

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কিত আলোচনার এই প্রথম অধ্যায়ে আমরা নাটকটির কাহিনিবৃত্তের বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করতে চলেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে—

- আপনারা নাটকটির মূল কাহিনির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করতে পারবেন।
- নাটকটির আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কী মনোভাব কার্যকরী হয়েছিল তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- নাটকের আখ্যানভাগের প্রাথমিক বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে সেটিও জানতে পারবেন।

৫.২ নাটকের আখ্যানভাগ

'রক্তকরবী' নাটকের শুরু রাজার জালের জানালার বাইরে। নন্দিনী ও সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোরের সাক্ষাতের মাধ্যমে। নন্দিনীর মধ্যে প্রাণশক্তি, সৌন্দর্য এককথায় যা আমাদের মনকে টানে, আমাদের অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করে তুলে সীমার বন্ধন অতিক্রম করে অসীমের পানে ধাবিত করে— এসবের সমন্বয় হয়েছে। নন্দিনী যক্ষপুরীতে যন্ত্রপিষ্ট পুতুল-মানুষের মধ্যে একটা প্রাণের আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে। ওদের একঘেয়ে অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে নন্দিনীর আবির্ভাবে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কিশোরের মধ্য দিয়ে কবি কৈশোর কালকে রূপায়িত করেছেন। রঞ্জন পূর্ণ যৌবনের প্রতিভূ— আনন্দ, জীবিত অবস্থায় সশরীরে হাজির না হলেও তার অস্তিত্ব পাঠক বা দর্শক মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে। যেসব গুণ রঞ্জনের মধ্যে পরিপূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করেছে তারই কৈশোর অবস্থার রূপ কিশোর চরিত্রে দেখা যায়। নন্দিনীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিশোর ছন্দে সুরে নন্দিনীকে ডাকতে থাকে। এই ডাকের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে কিশোরের অন্তরের ব্যাকুলতা, বিস্ময় ও আবেগ। যক্ষরাজের যক্ষপুরীতে প্রাণশক্তিকে আহ্বান করা অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। এখানকার সব মানুষ কলের পুতুলের মতো। প্রাণশক্তির আরাধনা এবং সৌন্দর্যের অনুভূতির অধিকার এখানকার মানুষের নেই। কিন্তু কিশোর এগুলোকে অগ্রাহ্য করতে চায়, সোনার তাল খোঁড়ার মাঝে সময় চুরি করে সে নন্দিনীর জন্য ফুল জোগাড় করে আনে। নন্দিনী রক্তকরবী ভালোবাসে। যক্ষপুরীতে একটিমাত্র রক্তকরবী গাছ আছে। সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে সেই গাছ থেকে নিজের হাতে নন্দিনীর জন্য এই দুর্বল রক্তকরবী ফুল তুলে আনবে— এতেই তার আনন্দ। তার জন্য যে শাস্তি সে পাবে তার ব্যথায় ফুলগুরি আরও একান্তভাবে

কিশোরকে স্মরণ করিয়ে দেবে নন্দিনীর কথা।

'রক্তকরবী' নাটকে এরপর প্রবেশ করেন অধ্যাপক। অধ্যাপক জানেন দরকারের বাঁধনে নন্দিনীকে বাঁধা যায় না। দরকারের ব্যাপারটা খোইকরদের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য যারা পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা— তাল তাল সোনা নিয়ে আসছে। অধ্যাপক বোঝেন যক্ষপুরীর যা কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী নন্দিনীর যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। অধ্যাপক বলেন— 'সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।' এদেশের সব কাণ্ড-কারখানা দেখে নন্দিনী অবাক হয়ে যায়। পাতালে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এরা যক্ষের ধন বার করে আনে,— অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী যাকে কবর দিয়ে রেখেছিল। অধ্যাপক বলেন 'আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধন করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।' জড়বাদীরা মনে করেন যে পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের দ্বারা তাঁরা পৃথিবীকে আপন বশে আনবেন।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা এবং ধনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পাশবিক শক্তিলোভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা এবং একটা নারকীয় লোভ এবং লোলুপতার ভান। এই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ যক্ষপুরীর মকররাজ বাস করেন একটা জটিল জালের আবরণের মধ্যে। আজকের যান্ত্রিক যুগে যেকোনো রাষ্ট্রের ঠিক শক্তিকেন্দ্র যে কোথায় একথার উত্তর দেওয়া মুশকিল। বর্তমান যুগে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসাধারণের কোনো সম্বন্ধ নেই, নিজেদের চারদিকে যান্ত্রিকযুগের মানুষ এক একটা জাল সৃষ্টি করছে এই জালের আবরণ। অধ্যাপক বলেন— 'আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।' নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে— 'এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?' অধ্যাপক বলেন— 'সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি।'

রঞ্জন যৌবন এবং আনন্দের রূপ ধরে এই নাটকে এসেছে। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। দস্যুবৃত্তি এখানকার মানুষের জীবনের আদর্শ। বসুন্ধরাকে খাবলে খাবলে কে কতটা খেতে পেরে তার ওপর নির্ভর করে এদের জড়বাদী মনের সার্থকতা। এখানকার লোকেরা নিজেরা আস্ত নয় এবং কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। এই পরিবেশ থেকে রঞ্জনকে নিয়ে দূরে চলে যেতে উপদেশ দেন অধ্যাপক। নন্দিনীর কিন্তু বিশ্বাস যে রঞ্জনকে আনলে এখানে এদের মরা পাঁজরের ভেতর প্রাণ নেচে উঠবে। নন্দিনী অধ্যাপককে জানায় যে আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

অধ্যাপকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুল। গোকুল যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক মানুষদের প্রতিনিধি, নন্দিনীকে দেখে সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার অভ্যস্ত যান্ত্রিক জীবনের মধ্যে প্রাণশক্তির এই আবির্ভাবকে সে বিশ্বাসের চোখে

দেখতে পারে না। তার ভয় হয়, এর পেছনে কোনো সর্বনাশের ইঙ্গিত আছে। সবাইকে সাবধানে করে দেওয়ার জন্য সে স্থানত্যাগ করে।

নন্দিনী রাজার জালের দরজায় আঘাত করে। আড়াল থেকে রাজা জবাব দেন তিনি এখন খুব ব্যস্ত। নন্দিনী তার প্রাণের খুশি নিয়ে ভেতরে যেতে চায়, নিজের আনন্দ দিয়ে সে সবকিছুকে আনন্দময় করে তুলবে এই তার বাসনা। পদ্মপাতায় ঢেকে রাজার জন্য কুন্দফুলের মালা গেঁথে এনেছে। রাজা বলেন—

'আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা'। নন্দিনীর উত্তর— 'সেই চূড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও। ভিতরে যাব।' এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসে পৌষের গানের ধ্বনি— 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...' ইত্যাদি। এখানে দুটি বিপরীত ভাবের সংঘাত সৃষ্টি করে নাট্যকার একটি বড়ো সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাজা যান্ত্রিকতার প্রতিনিধি হয়ে যান্ত্রিকতার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন পর্বতচূড়ার মতো আকাশছোঁয়া বস্তুপুঞ্জ— একটা হাহাকার মিশ্রিত বিরাট শূন্যতার বোঝা। যান্ত্রিক সভ্যতা চায় সবকিছুকে গ্রাস করতে, সবার মধ্যে যে প্রাণশক্তি রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে, কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া অসম্ভব। কারণ তা হল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

প্রকৃতির ধর্ম হল প্রাণ সৃষ্টি করে সবকিছুকে প্রাণবন্ত করে তোলা। গাছ-পালা, ফুল-ফল, জীব-জন্তু, পশু-পাখি সৃষ্টি করে চারদিকে আনন্দের সুরলহরী বইয়ে দেন প্রকৃতিমাতা— চারদিকে ধ্বনিত হতে থাকে জীবনের পরিপূর্ণতা। পৌষের পাকা ধান এবং ফসল পাকার গান এই নির্দেশই দিচ্ছে যে ধ্বংস কখনো সৃষ্টি অতিক্রম করে যেতে পারে না, কদর্যতা সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনা। ধনের চাইতে ধান্যের সার্থকতা অধিকতর, পশুশক্তির এমন সামর্থ নেই যে জীবন থেকে সৌন্দর্যকে নষ্ট করে ফেলবে। নন্দিনী রাজাকে তাই খোলা মাঠের মাঝখানে প্রকৃতির বুকে নিয়ে যেতে চায়। সেখানে রাজা সহজ কাজের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারবেন। কিন্তু রাজার জবাব শোনা যায় — 'সহজ কাজটাই আমরা কাছে শক্ত'। যান্ত্রিকতা যাতে অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিকভাবে গড়ে তুলেছে সে কি কখনো এত সহজে 'সহজের মাঝে', 'আনন্দের মাঝে' ফিরে আসতে পারে? রাজার প্রচণ্ড শক্তির প্রতি নন্দিনীর কিন্তু শ্রদ্ধা আছে। তবে প্রকৃতির আনন্দের সৃষ্টি ধানের খেতে যে ছন্দের ঢেউ খেলে যায় তার একান্ত অভাব বৈজ্ঞানিক জড়শক্তিতে স্ফীত বস্তুপুঞ্জের মাঝে। এর পরের কয়েকটা সংলাপ—

নন্দিনী : আচ্ছা রাজা, বলো তো— পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

রাজা : কেন, ভয় কিসের?

নন্দিনী : পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন

তার বুক চিরে মড়া হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, — একানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে।

রাজা : অভিসম্পাত?

নন্দিনী : হাঁ, খুনোখুনি— কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

এই নাটকে কারো প্রাণে সহজ আনন্দ নেই। সবারই মন ক্রোধ, সন্দেহ, এবং ভয়ে সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত। মকররাজের ইচ্ছা হয় অন্যান্য বস্তুর মতো নন্দিনীকেও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে— তা না পারলে তাকে ভেঙেচুরে ফেলতে চান। কিন্তু রাজা একথাও বোঝেন যে শক্তির দ্বারা আর সব পাওয়া গেলেও আনন্দ, মাধুর্য এবং সৌন্দর্যকে আয়ত্তে আনা যায় না। রাজা একথাও বোঝেন তাঁর সঙ্গে রঞ্জনের তফাৎটা কোথায়। তাঁর নিজের মধ্যে আছে কেবল শক্তি, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু। তিনি মানুষের প্রাণের স্থবিরতা আর রঞ্জন হল বিস্ময়। তিনি মৃত্যুর মন্ত্রে সকলকে দীক্ষা দেন আর রঞ্জন প্রাণের বন্যায় চারদিক ভাসিয়ে দেয়। রাজার মধ্যে দুর্বার শক্তি আছে একথা যেমন সত্য আবার তেমনি তাঁর ভেতরে রয়েছে এক অসীম ক্লান্তির ভার। জীবন থেকে আনন্দ এবং সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে যে শক্তি গড়ে উঠে তার মধ্যে ক্লান্তির ভাব আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাজা মনে মনে উপলব্ধি করেন যে বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েও সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই। পর্বত যেমন বিরাট হয়েও অনুর্বর রাজাও ঠিক তাই। নন্দিনীর মধ্যে রয়েছে ছন্দ — যে ছন্দ তাকে এমন সহজ ও সুন্দর করেছে, এত বড়ো শক্তির অধিকারী হয়েও রাজা সেই ছন্দকে গ্রাস করতে পারেন না। কারণ শক্তির দ্বারা সৌন্দর্যকে আয়ত্ত বা দখল করা যায় না।

নন্দিনীর প্রস্থানের পর নাটকে খোদাইকর ফাগুলালা ও তার স্ত্রী চন্দ্রাকে দেখা যায়। খানিক বাদে আসে বিশুপাগল এবং তারপর খোদাইকর গোকুল। নন্দিনীর আর্বিভাব এদের সবার ওপরে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে— সকলের প্রাণে সাড়া জাগিয়ে। চন্দ্রা মনে করে নন্দিনী মায়াবিনী— মায়া জানে। ফাগুলাল উপলব্ধি করে এই যক্ষপুরে তাদের মনুষ্যত্ব কীভাবে নষ্ট হতে বসেছে। তাই সে বলে — 'নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।' গোকুল তার যান্ত্রিক জীবনেই অভ্যস্ত। এই পরিবেশে নন্দিনী যেন ঠিক খাপ খায় না, তাই গোকুলের মনে সন্দেহ, সে বলে 'দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।'

বিশুর চরিত্র অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা জাতীয় চরিত্রের মতো, তার অন্তরের যা কিছু কালো তা দুঃখের আগুনে শুদ্ধ এবং পবিত্র হয়েছে। জীবনে বেদনা পেয়েছে বলেই তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক দার্শনিকতার ভাব গড়ে উঠেছে।

এই নাটকে এরপর দেখা যায় সর্দারকে, খানিকক্ষণ কথাবার্তর পর সে জানায় ভালো কথা শোনানোর জন্য কেনারাম গোঁসাইজিকে আনানো হয়েছে। বলতে বলতে

গোঁসাইজি হাজির হল। ধনতন্ত্র পরিচালিত রাষ্ট্রে লোকের প্রাণশক্তিকে সুপ্ত রাখার প্রধান সহায় ধর্মের আফিম— তার মাধ্যমে এই কথাই ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। খোদাইকরেরা বিশুকে জিজ্ঞাসা করে নন্দিনী তাকে কীভাবে ভুলিয়েছে? বিশু বলে ভুলিয়েছে দুঃখে। ফাগুলাল আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা শুনতে চায়, বিশু জানায়— 'কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের—' এখানে কাছের পাওনার দ্বারা ক্ষুদ্রলোভকে বোঝানে হয়েছে, দূরের পাওনার অর্থ অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। এরপর নন্দিনী নাটকে পুনঃপ্রবেশ করে। সে বিশুর কাছে আসে। বাইরে পৌষের গান শুনে নন্দিনীর মন আজ খুশিতে ভরা। সেই খুশি নিয়ে সে বিশুর কাছে এসেছে।

সংসারে এমন একধরনের লোক দেখা যায় — যাদের চরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে সাধারণ মানুষ তাদের পাগল আখ্যা দেয়। বিশু এরকমই এক চরিত্র। সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে বাহির বিশ্বের আনন্দ-উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য নন্দিনীর প্রয়োজন হয় বিশুর সাহায্যের। বিশু যে দার্শনিক, তার সংস্পর্শে এলে মন উন্মার্গগামী হয়, একথা নন্দিনীর অজানা নয়। বাহিরকে জানবার জন্য, অসীম সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য বিশুর সাহায্য অপরিহার্য,— একথা নন্দিনী মনেপ্রাণে অনুভব করে। এতদিন বিশুর মনে হত জীবন থেকে তার আকাশ বুঝি হারিয়ে গেছে কিন্তু এখন বিশুর মনে হচ্ছে তার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে। নন্দিনী বিশুর ঘুম-ভাঙানিয়া। অর্থাৎ যে মোহনিদ্রায় বিশু এতদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল, আপন প্রাণশক্তির প্রভাবে নন্দিনী তাকে সেখানে থেকে উদ্ধার করেছে। অসীমরে রহস্য এবং আনন্দের বার্তা নন্দিনী বিশুর কাছে বয়ে এনেছে। বিশু কবি এবং দার্শনিক, তার গান এবং দর্শনের ভেতর থেকে যে দুঃখের বার্তা শোনা যায় এতদিন পর্যন্ত নন্দিনী সেই ধরনের বার্তা শোনেনি। রঞ্জনের কাছ থেকেও সে এর কোনো খবর পায়নি। রঞ্জন যৌবনের, পূর্ণতার প্রতিমূর্তি; যৌবনের আবেগ, শক্তি, সাহস ইত্যাদির পরিচয় নন্দিনী রঞ্জনের কাছ থেকে পেয়েছে — কিন্তু জীবনের দুঃখ-দর্শনের দিকটা সে বিশুর কাছ থেকেই লাভ করেছে। এখানেই বিশুর শ্রেষ্ঠত্ব আর এজন্যই তার চরিত্র রঞ্জন অপেক্ষা পরিণত এবং সম্পূর্ণ।

সর্দারের কাছে রঞ্জন আসবে শুনে খুশি হয়ে নন্দিনী তাকে কুন্দফুলের মালা দেয়। সর্দার বলে— 'জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান; আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান।' মুখে না বললেও সবাই যেন নন্দিনীর হাত থকে এই রক্তকরবী ফুল লাভ করার জন্য মনে মনে আগ্রহী। এই নাটকে রক্তকরবী সংকেতিত করছে মুক্তি, প্রাণশক্তি এবং বিদ্রোহকে। যক্ষপুরীর মানুষেরা অর্থাৎ যন্ত্রযুগের যন্ত্রমানুষের দল সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে সবাই চায় রক্তকরবী অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সৌন্দর্য। এই নাটকটিতে তাই রক্তকরবীর প্রাধান্য আগাগোড়া দেখা যায়।

বিশুকে নন্দিনীর সঙ্গে দেখা রাজা বিশুর পরিচয় জানতে চাইলে সে বলে 'আমি রঞ্জনের ও-পিঠা, যে পিঠে আলো পড়ে না, আমি অমাবস্যা।' বিশুর মধ্য দিয়ে

জীবনের অন্ধকার দিক অর্থাৎ দুঃখের, রহস্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রাজা এবং নন্দিনীর সংলাপে নীলকণ্ঠ পাখির প্রসঙ্গ এসেছে, এসেছে ডালিমের প্রসঙ্গ। এই বর্ণসমাবেশ থেকে নীলকণ্ঠ— পাখির প্রসঙ্গে যে নীলিমার, ভাবের সৃষ্টি হয় তা স্মরণ করিয়ে দেয় অসীমের কথা, আর ডালিমের রক্তিমাভার লালিমা মুক্তি ও বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বর্ণসমাবেশের মাধ্যমে নাট্যকার রঞ্জনের ব্যক্তিস্বভাব এবং প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতি সংকেত করেছেন।

এরপর সর্দার এবং মোড়লের কথা থেকে বোঝা যায় যে নানাভাবে চেষ্টা করেও এরা রঞ্জনকে বশে আনতে পারেনি। সে বলে হুকুম মেনে কাজ করা তার অভ্যাস নয়। খোদাইকরদের সে শিক্ষা দেয় খোদাইনৃত্যের। ভাঙা সারেঙ্গি বাজিয়ে শিকল কেটে সে গান গাইতে চলে যায়। তা দেখে সর্দার মোড়লকে আদেশ দেয়— 'ধরো গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।'

এরপর প্রবেশ করে ছোটো সর্দার। সে জানায় মেজ সর্দারকে পর্যন্ত রঞ্জন চঞ্চল করেছে। এদের প্রস্থানের পর অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের কথাবার্তায় বোঝা যায় যে রাজার মধ্যে এক ভয়ংকর পরিবর্তন এসেছে। বস্তুতত্ত্ববিদ্যার সবকিছু উজাড় করে দিলেও রাজা অধ্যাপকের কাছ থেকে জানতে পারেনি যে প্রাণপ্রাচুর্যের অন্দরমহল কোথায়। তাই কিছুদিনের জন্য রাজাকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। সর্দার এসে জানায় যে পুরাণবাগীশের আগমনবার্তা শুনে রাজা খেপে উঠেছেন। রাজার মতে পুরাণ বলে কিছু নেই, বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

আবার নন্দিনী নাটকে প্রবেশ করে। দূরে কতকগুলি ছায়ামূর্তি দেখা যায়। রাজার জালের খিড়কি-দরজা দিয়ে নন্দিনীর পূর্বপরিচিত কিছু মানুষ— অনুপ, উপমন্যু, বার হয়ে আসছে। একদিন এরা ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। যক্ষপুরীতে প্রবেশের ফলে আজ এদের মানুষ বলে চেনা যায় না। এদের মাংস, মজ্জা, মন, প্রাণ আখের মতো চিবিয়ে ফেলা হয়েছে। টলতে টলতে প্রবেশ করে পালোয়ান, অত্যন্ত আহত অবস্থায়। বাইরে থেকে তার আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না— ভেতর থেকে তাকে যেন শুষে ফেলা হয়েছে। বাঘকে বাঘ খায় না কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা পাশবিকতায় পশুকেও হার মানিয়েছে। মানুষ যেভাবে অবাধে মানুষকে শোষণ করছে তার তুলনা হিংস্র পশুর মধ্যেও বিরল।

কিশোর এসে সংবাদ দেয় যে প্রহরীরা বিশুকে নিয়ে এই পথ দিয়ে যাবে। বন্দী অবস্থায় প্রবেশ করে বিশু নন্দিনীকে বলে— 'এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।' সত্য কথা বলার অপরাধে বিশুকে বন্দী করা হয়েছে। পশুর মতো তাকে চাবুক মারা হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে যক্ষপুরবাসীরা তাদের ভেতরকার পশুটাকেই বড়ো করে তুলেছে। মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না। বিশুর বদলে কিশোর তার হয়ে বন্দীত্ব বরণ করতে চায়, কিন্তু বিশু কিশোরকে একটা বিপদের কাজ দেয়— 'রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।'

কিশোর বিদায় নেওয়ার আগে নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে কোন্ কোন্ কথা জানাবে। নন্দিনী রক্তকরবীর গুচ্ছ দিয়ে বলে রঞ্জনকে এই ফুল দিলেই তার সব কথা জানাতে হবে। দূর থেকে ফসল কাটার গান ভেসে আসে।

এদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে চিকিৎসক ও সর্দার। চিকিৎসক জানায় যে রাজা নিজের উপর নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এ রোগ বাইরের নয় ভিতরের। এর প্রতিকার বড়ো রকমের ধাক্কার— হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাঁধিয়ে দেওয়া।

আধুনিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার জগতে সারা পৃথিবীর লোক আজ মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। চারদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-অশান্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সভ্যতার ক্রমবিবর্তন যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তাতে তার পরিণতি যে একদিন এরূপ নারকীয় এবং বীভৎস রূপই ধারণ করবে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সেই সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

এদিকে রাস্তায় নানা দলের লোক বেরিয়েছে। সবাই ধ্বজাপূজার উৎসবে যোগ দেবে। নন্দিনী এদের জিজ্ঞাসা করে রঞ্জনকে কেউ দেখছে কি না। সবাই জানায় ধ্বজাপূজা উপলক্ষে রাজাও বাইরে বেরিয়ে আসবে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। ওরা শুরুটা জানে শেষটা জানে না। নন্দিনী এসে রাজার জানালায় ঘা দেয়। রাজা বলে 'আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব।' কিন্তু নন্দিনী স্থান ত্যাগ করে না, রাজাকে সে ভয় করে না। রাজার প্রশ্রয়কে সে ঘৃণা করে বলায় রাজা উত্তপ্ত হয়ে উত্তর দেন 'তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় আছে এসেছে।' রাজা দরজদা খোলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ভূতলশায়ী রঞ্জনের মৃতদেহ। রাজাই না জেনে রঞ্জনকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য নন্দিনী রাজার কাছে আকুল প্রার্থনা জানায়। কিন্তু রাজা জানান— 'আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।' রাজার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি বুঝতে পারেন এত দিন ধরে পদে পদে তিনি যৌবনকেই হত্যা করে এসেছেন। নন্দিনী রাজাকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করে। রাজা জানান তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁরই হাতে হাত রেখে নন্দিনীকে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। রাজার এই সংলাপের মধ্যে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে ধনতন্ত্রের নিজের মধ্যেই সুপ্ত এবং লুক্কায়িতভাবে ধ্বংসের বীজ রয়েছে।

রাজা নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ধ্বজাদণ্ড ভেঙে ফেলেন। দলের লোকেরা ভাবে রাজা বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছেন। সর্দারকে খবর দেবার জন্য তারা ছুটে যায়। সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে দেখে রাজা ও নন্দিনী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান। এদিকে বন্দীশালা ভেঙে ফেলে, বিশু কারাগারের বাইরে আসে এবং নন্দিনীর খোঁজ করে। ফাগুলাল জানায় সে সবার আগে গিয়েছে শেষ মুক্তিতে। ফাগুলাল বিশুকে দেখায় রঞ্জনের মৃতদেহ পড়ে আছে। ধুলায় পড়ে আছে নন্দিনীর

হাতের রক্তকরবীর কঙ্কণ। বিশু সেই কঙ্কণ তুলে নিয়ে নন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে প্রস্থান করে। দূর থেকে শোনা যায় ফসলের গান— 'ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হায় হায় হায়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'রক্তকরবী' নাটকে কালচেতনা কতটুকু ছায়াপাত করেছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

বিশু নন্দিনীকে তার 'ঘুমভাঙানিয়া' কেন বলেছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রাজা এবং নন্দিনীর সংলাপে নীলকণ্ঠপাখি এবং ডালিমের প্রসঙ্গ কীসের সংকেত বহন করেছেন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫.৩ আখ্যান বিশ্লেষণ

'রক্তকরবীকে' নাটকের সমস্ত ঘটনা ঘটেছে যক্ষপুরীতে। এই যক্ষপুরী মাটির তলার রাজ্য। মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের ও প্রেমের লীলা, যেখানে মাথার

উপর আকাশের নীল, যেখানে পাখির আনন্দকূজন, ঝরনার উচ্ছল গান শোনা যায়, যক্ষপুরী তা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। মাটির উপরিতলের রাজ্য আর মাটির নিচের রাজ্য— এই দুয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। মাটির উপরে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, মাটির নিচে 'শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি'। মাটির উপরে রূপ ও রঙের বৈচিত্র্য আর মাটির নিচে বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়ে জীবন।

যক্ষপুরীর যে চিত্র নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে এক পীড়িত মানুষের দলে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে যন্ত্র এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, মানুষ সেখানে মনুষ্যত্বহীন— নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার ভারে প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে লুপ্ত। যক্ষপুরীর লোকগুলো তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের পরিচয়টুকু পর্যন্ত তারা হারিয়েছে। মাটির উপরিতলের প্রাণ ও প্রেমের রাজ্যে যারা আপন নামে ছিল পরিচিত, যক্ষপুরীতে এসে তারা পরিণত হয়েছে প্রাণহীন জড় বস্তুতে। ইট, কাঠ পাথরের মতো সংখ্যায় তাদের পরিচয়। যক্ষপুরীর পাড়াগুলিও নামহীন— ন-পাড়া, ণ-পাড়া নামে এদের পরিচয়। নামের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত, সংখ্যার নীরসতারই সেখানে অধিপত্য।

এই যক্ষপুরী নিরবচ্ছিন্ন শীতের রাজ্য— শীতের জড়তা শীতের রিক্ততা সেখানে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজিত। আনন্দের প্রবাহ সেখানে রুদ্ধ, ছুটির খুশি সেখানে নেই। যক্ষপুরীর মানুষগুলো কাজের জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে জানে। আনন্দের জগৎ থেকে তারা দূরে সরে এসেছে। সোনার নেশায় মাটির নিচে গর্ত তৈরি করতে করতে মাটির উপরিতলের রাজ্য থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

যক্ষপুরীর মানুষরা সঞ্চয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে আছে। সেখানে সবাই কাজের তাড়নাতেই চলছে, প্রয়োজনের তাগিদে জীবনযাপন করছে। কাজের বন্ধনে জাড়িয়ে গেছে তাদের জীবন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

" 'রক্তকরবী'তে দেখি— কবি গূঢ় অধ্যাত্ম-সাধন বা ধর্মবোধ বা মানবাত্মার সংকট রূপায়িত করিবার জন্য পূর্বের অবিমিশ্রিত কাল্পনিক আখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে — পরিবেশে তাঁহার আখ্যানবস্তু স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-জীবন ও সমাজ-জীবন-সমস্যার একটি সুপরিচিত চিত্র। সেইজন্য 'রক্তকরবী' একটা বিশিষ্ট কৌতুহলের উদ্রেক করে এবং তত্ত্বকথার মধ্যেও একটা নূতন বাস্তবরসের আস্বাদ দেয়। 'রক্তকরবী'র মূল প্রতিপাদ্য যন্ত্র-সভ্যতায় নিষ্পেষিত মানবাত্মার স্বরূপ উদঘাটন করা। এই ভাবটি সংকেত ও রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। রূপকের অংশগুলি এমন মননসীলতা ও স্বার্থকতায় নির্মিত যে সমান্তরাল অর্থতাৎপর্যে বাস্তবের একটা সুসংগত ছবি আমাদের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে। একথা বলা যায়— 'রক্তকরবী' নাটকে সংকেত ও রূপকের সঙ্গে একটা বাস্তবতার অনুভূতিও

হৃদয়ে জাগ্রত হয়। তাহার প্রধান কারণ আখ্যানবস্তুর পরিবেশ ও নির্মাণ-কৌশল। নাটকের মধ্যে নন্দিনী, রঞ্জন, রাজা ও অনেকাংশে বিশু-পাগল সাংকেতিক চরিত্র। তাহাদের চারিত্রিক পরিমণ্ডলের মধ্য হইতে মানবাত্মার সংকটময় অবস্থার রহস্যময় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাহাদের ঘিরিয়া নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতির সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা-ঝংকার উঠিতেছে। কিন্তু আধুনিক ধনসংগ্রহশীল যন্ত্র-সভ্যতার যে রূপকটি নাটকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ এমন সচেতনভাবে কল্পিত ও সুচারুরূপে গঠিত যে রূপকের মাধ্যমে আমরা অতি-সহজে নাট্যকার-উদ্দিষ্ট ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত বাস্তবের একটি চিত্রও আমাদের কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠে। রূপক যেন অনেকস্থলে সীমা হারাইয়া বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং আমাদের মনে একটা বাস্তবতার প্রতীতী সঞ্চার করে।"

['রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা' : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য]

যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী— যেখানে আনন্দের হর্ষের উল্লাসের নির্মল সূর্যালোক নেই। সেখানে প্রশান্তি নেই, নেই কোনো প্রসন্নতা। একটা অশান্তির ছায়া যক্ষপুরীর সর্বাঙ্গে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। এই যক্ষপুরীতে সামঞ্জস্য নেই, রয়েছে শুধু বিরোধ— তাই সেখানে সৌন্দর্যের অভাব। এই রাজ্য মানবমনে একটা নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করে। এখানে একবার প্রবেশ করলে আর বাইরে আসার পথটা খুঁজে পাওয়া যায়না। এখানকার দৃশ্য ভয়ানক— যেন প্রেতপুরী। শক্তিমান প্রাণোচ্ছল মানুষও যদি এখানে একবার প্রবেশ করে, তবে তার সমস্ত শক্তি, মাংসমজ্জা, মনপ্রাণ নিঃশেষিত হয়। তাই দেখা যায় অনুপ, উপমন্যু, শকলু, কঙ্কু আর পালোয়ান— একদিন যাদের মধ্যে অসীম শক্তি ছিল, প্রাণের প্রবল আবেগ ছিল তারাও যক্ষপুরীতে প্রবেশ করার পর অভাবনীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের মাংসমজ্জা বিশুষ্ক হয়েছে। নন্দিনীর সংলাপে যক্ষপুরীর এই নিষ্পেষণের চিত্র উদঘাটিত হয়েছে : "ও কী! ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি! ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। ম'রে যাই! ওদের এমন দশা কে করলে? ঐ-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার-খেলায় সববার আগে পেত মালা। — অনূ-প, শক্‌লু— এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। — মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। — ও কী, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে ঘাটে জল আনতে যেতুম তারই কাছে ঢালু পাড়ির'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টামি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। — হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত সে আমার ডাকে সাড়াই

দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।"

যক্ষপুরীর কঠিন কবলে পড়ে পালোয়ানের সমস্ত ভেতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। তাই সে আক্ষেপ করে বলেছে— "এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে! শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।"

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

পৃথিবীর স্বাভাবিক জগতের সঙ্গে যক্ষপুরীর পার্থক্য কী? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকে রূপক এবং বাস্তব কীভাবে অন্বিত হয়েছে? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নন্দিনীর জবানিতে যক্ষপুরীর নিষ্পেষণের কীরূপ চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

যক্ষপুরীতে নৈতিক অবস্থা অবনত, এদের চিন্তাশক্তি লুপ্ত, মন নিশ্চল। এদের মধ্যে কখনো অসন্তোষের ক্ষীণ বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন চন্দ্রা বলেছে— 'কাজ ছেড়ে দাও না। চলো না ঘরে ফিরে। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো? যেন ধানের গায়ে তুঁষ, ফালতে কিছুই নেই।' সোনা তুলতে তুলতে, ক্রমাগত শুধু কাজ করতে করতে এরা আজ যন্ত্রে পরিণত। এরা কাজ করে, কিন্তু সেই কাজের মধ্যে কোনো পরিশ্রম অনুভব করে না— কারণ পরিশ্রম অনুভব করার শক্তিটুকু পর্যন্ত এদের মধ্য থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

যক্ষপুরীর মানুষেরা মদ্যপ। কিন্তু সেখানে কোনো অবকাশ নেই, আকাশ নেই, জীবনের সহজ আনন্দ সেখানে বিনষ্ট। তাই যক্ষপুরীর লোকেরা চোয়ানো মদের নেশায় নিজেদের সঞ্জীবিত রেখেছে। এরা নিজেদেরে প্রাণঘাতী শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছে চোয়ানো মদের নেশায় বিভোর হয়ে। দিনান্তের ক্লান্তির পর চোয়ানো মদ পান করে একটা বাইরের উত্তেজনায় আত্মহারা হওয়া যায়। কিন্তু ফরমাসের করা আনন্দ অস্বাভাবিক। তা পরিণামে অশান্তিকেই ডেকে আনে বা আহ্বান করে। প্রকৃতির আনন্দরূপ যে মদ বস্তুত তাতেই হয় প্রাণের পুষ্টি, হৃদয়ের সঞ্জীবন। নিজের অন্তরের চলার বেগে যে পথ তৈরি হয় তখন তা হয় আনন্দযাত্রা। আর বাইরের কঠোর নির্দেশে যখন চলতে হয় তখন তা হয় বন্দীর পদচারণ। যক্ষপুরীর খোদাইকরেরা সেই সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল। যন্ত্রসভ্যতার চাপে এদের জীবনের সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়েছিল, অন্তরাত্মা তাই হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করেছে।

অবশ্য যক্ষপুরীর দুর্নিবার সঞ্চয়লিপ্সাকেই কবি শুধু চিহ্নিত করেননি, যক্ষপুরীর মধ্যে আলো ও আনন্দের ঝরনা ধারা যে এনে দেওয়া যায়, এই কদর্যতার মধ্যেও যে সৌন্দর্য-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব— তাও এই নাটকে দেখিয়েছেন। নন্দিনীর আবির্ভাবের মধ্যদিয়ে এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'রক্তকরবী'র সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। 'রক্তকরবী', ও নন্দিনীর মধ্যে একটি ভাবগত সাদৃশ্যও বর্তমান। রক্তকরবী ফুল বেদনারক্তিম প্রেমের প্রতীক। নন্দিনীও যক্ষপুরীতে প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক। রক্তকরবী ফুলের লাল রঙের মধ্যে প্রেম বিদ্রোহ ও শক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। নন্দিনীও প্রাণের আবেগ এবং নতুনের প্রেরণার দূতী। 'রক্তকরবী' নাটকের দ্বন্দ্ব প্রেম ও যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে প্রেমই জয়ী হয়েছে। নন্দিনীর নামের মধ্যে যেমন তার আনন্দময় সত্তার পরিচয় রয়েছে, তেমনি রঞ্জনের নামের মধ্যেও তার মনোরঞ্জক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। তারা যেন একই সত্তার পুরুষ ও নারী রূপের বিগ্রহ। তারা উভয়ের মিলনে উভয়ে সম্পূর্ণ। রাজা ও রঞ্জন যেন একই ধাতুরে গঠিত। কিন্তু রাজার প্রতি ধাবিত হয়েছে কিন্তু তার প্রেমের আকর্ষণ রঞ্জনের প্রতিই। রাজা এবং রঞ্জন উভয়েই রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ নন। নন্দিনীর সংলাপের মধ্যেই রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলনের ধরা পড়েছে। রঞ্জন একা সম্পূর্ণ নয়। সে জীবনের আলো ও আনন্দ আর বিশু দুঃখ ও রহস্যের দিক। এরা দুজনে দুজনের পরিপূরক। এই দুজনের ঘিরে নন্দিনীর প্রেম সার্থক হয়েছে। তাই রঞ্জনের মৃত্যুর পর রক্তকরবীর মঞ্জরী বিশু নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে। রাজা এক জটিল আবরণের মধ্যে বাস করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা অপরিমিত শক্তিলাভ, প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয়, মনুষ্যত্বহীন হৃদয়হীন শোষণশীল যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে তাঁর জীবন আনন্দহীন। এর দ্বারাই রাজার মূল আনন্দময় সত্তা আবৃত হয়ে রয়েছে। জাল এরই সংকেত বহন করেছে। নন্দিনী রাজাকে বাইরের দিকে আকর্ষণ করতে চায়, কিন্তু তারা অনভ্যস্ত আনন্দকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে ভয় পান। রাজার অদ্ভুত শক্তির প্রতি নন্দিনীর শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু নন্দিনী চায়

সেই শক্তি ছড়িয়ে পড়ুক। রাজার উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে শক্তিকে সংহত করা। বিপুল শক্তি যখন প্রেম ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সহজে মিলিত হয় তখনই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে। এই সত্য অনেক সময় উপলব্ধি করলেও কার্যকরী করা যায় না। রাজার মধ্যে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপলাভ করেছে। অবশেষে রঞ্জনের মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাত এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে— রাজার বন্ধজীবন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে, জড়বাদের ওপর প্রাণশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

রাজা রঞ্জন ও বিশু— এই তিন চরিত্রের পারস্পরিক মূল যোগসূত্রটি কী? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নন্দিনী ও রঞ্জন কীভাবে একে অন্যের পরিপূরক? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"আলোচ্য নাটকটির মূল Architectionics হল— নন্দিনীর মাধ্যমে কাহিনীটি উপস্থাপন। সকাল থেকে নন্দিনীর সঙ্গে এক-একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ হচ্ছে এবং তারই সঙ্গে আলোচনা মাধ্যমে যক্ষপুরীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং নন্দিনীর মানস জানে যাচ্ছে। এইভাবে এক-একটি কাহিনী-খণ্ড বা বৃত্ত রচিত হয়েছে। নন্দিনী কোনো তত্ত্ব বোঝা না, তার মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে 'ভয়' আছে, সে কেবল বিশুদ্ধ প্রাণ, গান, আনন্দ। তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটি অসম্পূর্ণতা আছে। নানা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগর মাধ্যমে নানা অভিজ্ঞতায় তাকে যেন পূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। সে ধারাপথটি এই ঃ অসম্পূর্ণ নন্দিনী (দুঃখ-ব্যাথা-ভুল-জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যতীত রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো নারী চরিত্রই পূর্ণতা অর্জন করেনি

একেবারে, নন্দিনীরও তাই)> অধ্যাপকের তত্ত্বালোচনায় প্রথমে সে ঋষ হল > বিশুর দুঃতত্ত্ব ও নির্ভয়তার তত্ত্ব তাকে দিল আর এক বর্ধিতমাত্রা > কিশোর-বিশুকে নিরাসক্ত মনে বিদায় দান করে নিজেও নিরাসক্ত হল, রাজার কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ণ মানসিক প্রস্তুত অর্জন করল > প্রাণ-উদ্দামতাময় রঞ্জনের সঙ্গে মৃত্যুর অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে শেষ পরিণতি লাভ করল। রঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত না হলে সে মরণকে উত্তরণ করতে পারত না, রাজার মধ্যেও প্রাণ সঞ্চার করতে পারত না। রাজা-নন্দিনীর একত্র হওয়াতেই সর্দারের বিরুদ্ধে শেষ লড়াই শুরু হল। অধ্যাপক সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন, সংশয় মুক্ত হয়ে তিনি লড়াইয়ের সহযাত্রী হলেন। সবাইকে লড়াইয়ে আমন্ত্রণ জানলেও বিশুর লড়াই একলা চলার। তবে, বিশু-নন্দিনীরই প্রেরণায় ফাগুলাল প্রভৃতি সাধারণ শ্রমিকগণ লড়াইয়ে নেমে পড়ে।"

[রবীন্দ্রনাথ : রক্তকরবী— নির্মলেন্দু ভৌমিক]

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

যক্ষপুরীর প্রাণহীন নিরানন্দ কর্মব্যস্ত জীবনের একটি আলেখ্য প্রস্তুত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবার আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে 'রক্তকরবী' নাটকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিষ্পেষণের এক সর্বগ্রাসী বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পাশ্চত্যের যন্ত্রসভ্যতা, জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মানুষকে কীভাবে পশুর স্তরে নিয়ে গেছে তা এই নাটকে ধরা পড়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকের নাট্যপ্রেরণার মূলে ব্যাপক কালচেতনার প্রভাব রয়েছে। এই নাটক রচনার কিছুদিন পূর্বে কবির আমেরিকা সফর এতে ছায়াপাত করেছে।

আমরা নাটকটির আখ্যানবস্তু বিশ্লেষণে দেখেছি যে এই নাটকের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যক্ষপুরীতে। এই যক্ষপুরী মাটির তলার রাজ্য। প্রাণের সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিকতার নিরিখে স্বাভাবিক পৃথিবীর সঙ্গে এর ভেদ সূচিত হয়েছে। যক্ষপুরীর মানুষ মনুষ্যত্বহীন, নামহীন। প্রাণের মাধুর্য সেখানে নেই, প্রয়োজনের নিগড়ে তাদের জীবনযাত্রা বাঁধা। যক্ষপুরীতে সামঞ্জস্য নেই, আছে শুধু বিরোধ, তাই সৌন্দর্য সেখানে থেকে নির্বাসিত। জীবনের সহজ আনন্দ থেকে যক্ষপুরীর মানুষেরা বিযুক্ত, তাই এই শূন্যতাকে এরা পূরণ করে চোয়ানো মদের নেশায়।

এই যক্ষপুরীতে আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রাণময়ী প্রতিমারূপে নন্দিনীর আবির্ভাব। নন্দিনীর পরিপূরক রূপে নাটকে এসেছে রঞ্জন। তারা উভয়ের মিলনে উভয়ে সম্পূর্ণ। এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা শক্তিলাভ, প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় এবং হৃদয়হীন যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে রাজার আনন্দময় সত্তা আবৃত হয়ে রয়েছে, তাই রাজার জীবন আনন্দহীন। নন্দিনী রাজাকে বহির্জীবনে আকর্ষণ করেছে কিন্তু রাজা দ্বিধাগ্রস্ত। রঞ্জনের মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে রাজার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত জীবনে রাজার উত্তরণ ঘটেছে।

৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

রূপক : রূপক বলতে নীতিগর্ভ আখ্যানগুলিকে বোঝায়; যেমন শকুন্তলা, ডিভাইন কমেডি, ফাউস্ট, পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস ইত্যাদি। রূপকের দুটি অর্থ থাকে — উপাখ্যানের এবং উপাখ্যানোতীত ভাবের। নীতিকথার নীতির দিকটা প্রত্যক্ষ এবং সাধারণভাবে বললে অনেক সময় নীরস প্রতীয়মান হয়। এই বিপদ এড়াবার জন্য রূপককার নীতিকথাকে সরস আখ্যানের আচরণের দ্বারা আবৃত করে দেন। ফলে শুকনো নীতি হয়ে দাঁড়ায় রসে ভরপুর প্রাণবন্ত এবং বিস্ময় উদ্রেককারী সজীব সাহিত্য।

সংকেত : কোনোকিছু যখন অন্য কোনোকিছুকে নির্দেশ করে তখন তা হয় --- বা সংকেত। যেমন কালোরঙ মৃত্যু বা নৈরাশ্যের প্রতীক। ফুল প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এখানে দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবনার মধ্যে অভেদ বা সমীকরণ ঘটেছে। সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে সংকেত বস্তুর নিজস্ব আভিধানিক অর্থের সীমানা পেরিয়ে একটি আরোপিত অতিরিক্ত অর্থকে নির্দেশ করে, ফলে ওই সব উল্লিখিত দিকগুলির বাস্তব ও শারীর দিক প্রসারিত ও বিস্তৃততর হয়ে যায়। এই কারণেই আবার অর্থের মধ্যে বোধ্যতার সঙ্গে অস্পষ্টতার সংশয়াচ্ছন্ন একটি আবরণ যুক্ত হয়ে যায়, আবেগ ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়।

৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা একাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

৫.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৬
রক্তকরবী
রক্তকরবী : প্রসঙ্গ ও পটভূমি

বিষয় বিন্যাস

৬.০ ভূমিকা (Introduction)
৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৬.২ 'রক্তকরবী' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি
৬.৩ 'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি
৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৬.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৬.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

'রক্তকরবী' নাটকে পাশ্চত্যের ধনিকসম্প্রদায় পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব, জড়বাদী, বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্তির অপব্যবহার প্রভৃতি ক্রমাগত মানুষকে কীভাবে পশুত্বের স্তরে নিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তারই স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। একালের আত্মঘাতী উন্মত্ততায় পৃথিবী আজ সর্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব আজ পদে পদে খর্ব হচ্ছে। সে আজ আত্মবিস্মৃত, নির্জীব, বিশেষত্ববর্জিত, সমাজের যন্ত্রবিশেষ। আজ তার দেওয়ার মতো নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, সত্তা নেই, নেই কোনো প্রাণশক্তি। মানুষ আজ ব্যক্তিবিশেষ নয়, তার পরিচয় গোষ্ঠী, দল বা জাতিহিসাবে; ব্যক্তিহিসাবে সে ৪৭ ফ-এর মতো কিছু সংখ্যামাত্র। তার বাসস্থান দন্ত্য 'ন' কিংবা মূর্ধ্যন্য 'ণ' পাড়ায়।

মনুষ্যত্ব এবং মানবতার এই নিপীড়ন ও অপমানের ফল ফলতে শুরু করেছে, ধন ও শক্তির লোভে মানুষ আজ নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের জীবন থেকে সৌন্দর্য, ছন্দ, রং ও রস ক্রমাগত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সহজ যোগ দূর হয়ে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিশ্বনিয়ন্তার বংশীধ্বনিতে যে সুরলহরী সৃষ্টি হয়, নটরাজের নৃত্যের তালে তালে যে ছন্দস্রোতের ধারা বইতে থাকে, তাইতো প্রতিক্ষণে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বস্তুবিশ্বের অন্তরে অন্তরে, মানবের মানবরাজ্যে এবং প্রকৃতির রূপে-বর্ণে-শব্দে-গন্ধে-গানে ও আলোকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হওয়া উচিত— একের অন্তরের ছন্দের সঙ্গে অন্যের অন্তরের ছন্দের নিবিড় মিলনে। তেমনি জড়বস্তুর বাহ্যিক রূপের মোহে আকর্ষিত না

হয়ে তার অন্তরস্থিত ছান্দিক রূপটাকেই উপলব্ধি করতে হবে। আন্তরিক ছন্দের বন্ধন স্থাপন করতে পারলেই প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এর ফলেই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ হবে।

সুখ-সম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টনের জন্যই একদিন ধন ও অর্থের সৃষ্টি হয়েছিল, অর্থাৎ অন্যান্য পদার্থের সহজ এবং সুন্দর আদান প্রদানের জন্যই অর্থের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান জগতে মানুষ অর্থ উদ্ভাবনের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে অর্থ হিসাবেই অর্থকে ভালোবাসে। এর ফলেই জন্মলাভ করেছে ধনতন্ত্রবাদ এবং দেখা দিয়েছে দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার। প্রেমের দ্বারা নিজেকে সংহত করার মধ্যেই শক্তির সার্থকতা, কিন্তু আজকের পৃথিবীতে প্রেম এবং শক্তি বিপরীতমুখী এবং পরস্পরবিরোধী। ফলে দেখা দিয়েছে শক্তির অপব্যবহার— দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এবং নিপীড়ন।

এইভাবে জীবন থেকে সহজ সরল স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে বর্জন করে মানুষ আজ কতগুলি অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। নিজের শুভদিক ও বৃত্তিকে উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করে অশুভ দিকটিকেই মানুষ আজ প্রধান করে তুলছে। এই সব তথ্যই রক্তকরবী নাটকে ইঙ্গিতময়তায় সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। প্রজ্ঞা, শক্তি ও প্রেমের মিলনের মধ্য দিয়ে চরম সৌন্দর্য ও আনন্দকে লাভ করা যায়। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ নেই সে আসলে মৃত। তাই আজকের পৃথিবীতে প্রাণশক্তির এত অভাব। যান্ত্রিকতার প্রভাবে আজ মানুষ অত্যন্ত ক্লান্ত নির্জীব এবং প্রাণশূন্য। তার মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়েও তাই আজকের মানুষ এত দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত।

'রক্তকরবী' নাটকের আরও একটি দিক আছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্রশাসনধারা বিকৃত রূপের প্রতি তীব্র কশাঘাত ও বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্যের নবযুগের কবির দলও সমাজব্যবস্থা, সভ্যতার স্বরূপ, বিকৃত জীবনযাত্রার দর্শনে মনে প্রাণে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। মানুষ যেন প্রাণহীন, ইচ্ছাশক্তিহীন যন্ত্রপরিচালিত জীব। প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করছে, সব ব্যাপারেই সকলের সংশয় এবং দ্বিধা। যুদ্ধোত্তরকালে সভ্যতার মূলে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল তা থেকে মানুষের বিশ্বাস হয়েছিল যে যন্ত্রকে ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাই এর মূল কারণ। সমাজব্যবস্থার অসামঞ্জস্য যে মানুষকে পেষণ করছে ও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে এবং এই অসামঞ্জস্যই যে তার দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ, তাও প্রতিভাত হল এসব কবিদের কাছে। যুদ্ধের নারকীয় পরিণাম গোটা ইউরোপকে এক বিরাট মহাশ্মশানে পরিণত করল। এই বীভৎসতা পাশ্চাত্যের মানুষের মনে যে হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল তা অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন কবি টি. এস. এলিয়ট। তাঁর অধিকাংশ কবিতাতে যুদ্ধোত্তরকালের ভয়াবহতা,

গ্লানি, আদর্শচ্যুতি ও বেদনাহত ইউরোপের সমাজজীবন এবং মানুষের বিকৃত ও অসুস্থ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রসঙ্গকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা নাটকটির প্রাথমিক পরিচিত গ্রহণ করব। আমরা আমাদের আলোচনা এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি, যাতে এই আলোচনার মাধ্যমে—

- আপনারা নাটকটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- আপনারা নাটকটির পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬.২ 'রক্তকরবী' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে 'রক্তকরবী' নাটকটি ১৩৩৩ (১৯২৬) সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাকালীন সময়ে নাটকটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মবকাশে শিলঙ বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই কবি পরে এর নামাকরণ করেছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে সংশোধিত আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল।

সাহিত্যে বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কখনোই তত্ত্বকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু, সাহিত্যের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকা তত্ত্বের অনিবার্য পরিণতি রসে গিয়ে পৌঁছানো, তাহলেই সেই তত্ত্ব সাহিত্যের একটি অঙ্গ বা উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তিন সংখ্যক প্রবন্ধে জীবনেদেবতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন সেই তত্ত্ব রস এবং সৌন্দর্যের পরিপোষক না হলে তা শুধুমাত্র ভাব হিসাবে পাঠকের বিরক্তির কারণ হবে। তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে কবি নিজেই বারবার নানা তাত্ত্বিক দিকের অবতারণা করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তাত্ত্বিকতার প্রসঙ্গটি স্মরণ রেখেও সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে যতটুকু রসবাদী ছিলেন ততটুকু তত্ত্ববাদী ছিলেন না। 'রক্তকরবী' নাটকেও একদিকে তিনি নানা তত্ত্ব ও সমস্যার উল্লেখ করেছেন, অপরদিকে পালাটিকে 'নন্দিনী' নামে 'একটি মানবীর ছবি' রূপেই দেখতে অনুরোধজ্ঞাপন করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকে সম্পর্কে

কবি প্রদত্ত তত্ত্বগুলি রস ও সৌন্দর্যকে কতদূর প্রকাশ করেছে এবং সেগুলি সমগ্র ও অখণ্ডভাবে নাটকের অর্থজ্ঞাপনে কতদূর সহায়ক হয়েছে,— সেটাই আমাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য। 'রক্তকরবী'-র সাধারণ পরিচিতি ও পটভূমি বিচার প্রসঙ্গে আমরা নাটকটির নাট্যপরিচয়, এবং প্রথম সংস্করণ 'রক্তকরবী'-র 'প্রস্তাবনা' অংশের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্যের সাহায্য গ্রহণ করব।

নাট্যপরিচয় অংশে কবি প্রথমেই বলেছেন — 'এই নাটকটি সত্যমূলক'। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন, সাহিত্যের বাস্তব এবং সাহিত্যের সত্য প্রকৃত জগতের বাস্তব ও সত্য থেকে পৃথক। 'রক্তকরবী' নাটককে তিনি সত্যমূলক বলেছেন, এই সত্য কোনো প্রাকৃত বা রাজনৈতিক তত্ত্বাদর্শের অর্থে সত্য নয়। 'কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য', অর্থাৎ এটি তাঁর সাহিত্যেক উপলব্ধি এবং সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে আন্তরিক এবং সেজন্যই তা সত্য। 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন — '... সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি — জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। মূলত সত্য এক শাশ্বত বস্তু— সকল দেশে সকল যুগে তা সমান। সত্যের প্রকাশ সর্বকালেই অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী। সকল রকম বিকৃতি এবং অস্বাভাবিকতাকে ছিন্ন করে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ শোষণ এবং যন্ত্রসভ্যতা যখন জীবনকে অস্বাভাবিক করে তোলে, তখন জীবনই এর প্রতিবাদ করে সত্যকে স্পষ্টরূপে মূর্ত করে— যেমন যক্ষরাজ নিজেই সেই সত্য ও স্বাভাবিকতার প্রতি সচেতন হয়েছেন। এই সত্যের প্রকাশও ঘটে সরল, প্রত্যক্ষ, তীব্ররূপে— কোনো রূপক বা পরোপক্ষতার আবরণে নয়। তাই রাবণ-বিভীষণের চিরকালীন দ্বন্দ্বকে 'রূপক' বলা হয় নি। সেই কারনেই 'রামায়ণ' বা 'রক্তকরবী' 'রূপক' নয়। নন্দিনী এখানে জীবন বা জীবনের সত্যের দিক— যে জীবনের মৃত্যু নেই। তবে লক্ষণীয় নন্দিনীকে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠতে হয়েছে। বস্তুত এই নাটকে সত্যকে পাইয়া যায় দুটি মাত্রায়— প্রথমত রাজা এবং যক্ষপুরীর সমস্তরকম অস্বাভাবিকতা এবং বিকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকতার উদ্বোধনে, যা এক চিরকালীন সত্য; দ্বিতীয়ত, বিশুর দুঃখতত্ত্ব এবং রঞ্জনের মৃত্যুর মূল্যে নন্দিনীর নিজের সত্য হয়ে উঠায়।

'রক্তকরবী' নাটকে যে ঘটনাধারা প্রবহমান, যে সমস্যার অবতারণা এতে করা হয়েছে, তা পৃথিবীর এক চিরকালীন সমস্যা। পৃথিবীর সকল কালের সকল দেশের মনুষ্যসম্প্রদায়ের হৃদয়হীন, প্রেমহীন শক্তিমদমত্ততা ও অন্ধ হরণস্পৃহা 'রক্তকরবী' নাটকে রূপলাভ করেছে। যে শক্তি শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দুর্ধর্ষ করে তুলে পৃথিবীতে গ্লানি ও বেদনার তীব্র হলাহল সৃষ্টি করতে চায়, এই নাটকে সেই কথাই বলা হয়েছে। নাটকের যক্ষপুরী পৃথিবীর যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার কথা এবং মানুষের শক্তিদম্ভ ও স্ফীত-লোভের কথা মনে করিয়ে দেয়। যক্ষপুরীর মানুষগুলো আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে উঠে আসা এক-একটি চরিত্র। কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে বস্তুজগৎ ও পার্থিব ঘটনাসমূহ কবির ভাবকল্পনার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। নাটকের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের অধীন চরিত্রসমূহের মাধ্যমে একটা ভাবজগতের আভাস ধরা পড়েছে। বাস্তবের

সঙ্গে অন্বিত হলেও এই নাটকটি একটা কল্পনার জগৎকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। কেন্দ্রীয় সমস্যার বিচারে নাটকটি সত্যমূলক; কিন্তু সত্য কবির সত্য, রসের সত্য।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বকে দেখেছেন মানুষের নিজস্ব প্রকৃতিরই এক বিশেষত্ব হিসাবে — যে মনুষ্যত্ব চিরকাল অসত্যের আবরণে আবৃত থাকে না, এই মনুষের নিজের মধ্যে থেকেই স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে। কর্ষণজীবী সভ্যতা-সংস্কৃতির যে দ্বন্দ্বের কথা নাট্যকার উত্থাপন করেছেন দেখা যায় যে নাটকের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে কর্ষণজীবী সভ্যতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই কর্ষণ কিন্তু কৃষিমকর্ম নয়— কর্ষণ মানে Culture, আত্মার কর্ষণ সাধনের মাধ্যমে জীবনকে আবিষ্কার। নন্দিনী সেই কর্ষণেরই প্রতীক। কবির এই বিশ্বাস ছিল মানুষের নির্জন-নিসঙ্গ-নিরানন্দ-পতিত জগৎকে নীরীই একদিন আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা উদ্ধার করবে। মানব ব্যক্তিত্বের এই শুভ চেতনা, এই অসীম ও ঐশ্বরিক সত্তাটির সসীম বিকাশ নারীর মধ্যেই লভ্য। তাই মানবকন্যা নন্দিনীর যক্ষপুরীতে আগমনের ফলে ধর্ম জেগে উঠল— বস্তুত মানবধর্ম জেগে উঠল মানুষেরই মনে।

কিন্তু এই নন্দিনীকে বিশু ও রঞ্জনের প্রেরণা এবং জীবন অভিজ্ঞতাই পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে, সেই সঙ্গে তারা নিজেরাও পূর্ণ হয়েছে। এই পূর্ণতাতেই নন্দিনী মুক্তিলাভ করেছে। বস্তুত প্রেমের মাধ্যমেই নন্দিনীর মুক্তি-কামনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমই তার মুক্তির মূল উৎস। রঞ্জনের প্রতি প্রেমেই তাকে আসক্তির বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং রসের মধ্যে সম্পর্ক কী? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যমূলক' বলেছেন কেন? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকটি কী অর্থে 'রূপক' নাট্য নয়? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকটিতে যে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তার সঙ্গে 'রামায়ণ'-এর তত্ত্বের অনেকাংশেই মিল আছে। কবির উপলব্ধিতে 'রামায়ণ' কাহিনির যে সারসত্য ধরা পড়েছিল তা এই নাটকে রূপলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বাল্মীকির 'রামায়ণ'-এর সঙ্গে নানা দিক থেকে 'রক্তকরবী'-র সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। 'রামায়ণ'-এর মধ্যে তিনি এক চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করেছেন। এই অর্থেই 'রামায়ণ' তাঁর কাছে চিরকালের এবং আধুনিক কালের কাব্য। প্রথম সংস্করণ 'রক্তকরবী'-র প্রস্তাবনা অংশে তিনি এ সম্বন্ধে বিষদভাবে আলোচনা করেছেন—

"... শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বারণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি, কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি বারণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবান লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে বারণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই বারণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনা-স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্চ স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনা-স্থানের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগ্য আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী— প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল কেউ তা মানবে না। এটা যে বর্তমান কালেরই, হাজার জয়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সত্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝাঁটি ধরে টানে দিয়েছিল?

আরো-একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগের তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনরে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাত ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই,

মানুষের সব গুরুত্বতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পের মধ্যে তারই প্রমাণ পাই।

হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি, রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর— একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখ দুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা।"

কবির এই রক্তব্যের মানদণ্ডে আমরা 'রামায়ণ'-এর সঙ্গে 'রক্তকরবী'-র মিল-অমিলের প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করতে পারি।

যক্ষপুরীর রাজা যেন 'রামায়ণ'-এর রাবণ। রাজা যেন 'রামায়ণ'-এর আধুনিক সংস্করণ, তাই কবি 'তার একটার বেশি মুণ্ড আর দুটোর বেশি হাত' দেননি। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠার জন্য এ যুগে এক শ্রেণির মানুষের হাত-পা-মাথা অদৃশ্যভাবে বেড়ে উঠেছে— এদেরই প্রতিনিধি 'রক্তকরবী'র রাজা। রাবণের মতোই সর্বগ্রাসী রাজার লোভ। 'রামায়ণ'-এ দেখা যায় যে স্বর্ণলঙ্কার সম্পদের ভাণ্ডার। রাবণ বহুসংগ্রাহী, বহুগ্রাসী। দেবকুল তাঁর বন্দী, কল্যাণ ও ধর্মবোধ তার রাজ্য থেকে নির্বাসিত। রাবণের সম্পদ-সমৃদ্ধি অনন্ত, কিন্তু তাঁর সেই ধনে কোনো কল্যাণশ্রী নেই। স্বর্ণলঙ্কার সম্পদরাজি শুধুই পুঞ্জীভূত ধনরাশি, জড়বস্তুর স্তূপ মাত্র। সেই ধন লক্ষ্মপুরী যে স্বর্ণলঙ্কারই আধুনিক রূপ।

রাবণের সমৃদ্ধি ও শক্তি কম নয়, 'রামায়ণ'-এ তা সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই শক্তি কল্যাণবিমুখতার জন্য পশুশক্তিতে পরিণত। সেই কল্যাণ-বিরহিত ঐশ্বর্যপুরীতে মানবকন্যা সীতার আগমন ঘটল। সেই মানবকন্যা সহজ-স্বাভাবিক জীবনের দর্পণে লঙ্কাপুরীর অসম্পূর্ণতা প্রতিভাত হল, সেখানে জেগে উঠল ধর্মবোধ। সহোদর হওয়ার সত্ত্বেও বিভীষণ ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করলেন। লঙ্কাযুদ্ধে রাবণের পরাজয় ঘটল। সহজ জীবনের আঘাতে রাবণের পতন হল।

'রক্তকরবী' নাটকে এই ভাবটিই রূপপরিগ্রহ করেছে। রাবণের ঐশ্বর্যমদমত্ততা এবং কল্যাণ-বিযুক্ত সম্পদ-সমৃদ্ধির সঙ্গে আধুনিক যুগের ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর মিল রয়েছে। কবি একালের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ভেতরের ভোগের চেহারা দেখে এবং সেই ভোগবাদের পরিণামের কথা ভেবে আতঙ্কিত। আদিকবির 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত রাবণের মধ্যে ভোগের যে রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে তাকেই কবি বর্তমানের পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করে 'রক্তকরবী' নাটকটি লিখেছেন। 'রামায়ণ'-এর রাবণ ও 'রক্তকরবী'-র রাজা— শক্তিতৃষ্ণাই উভয়ের চালকশক্তি। দুজনের ভোগবাদই এদের অকল্যাণকে আহ্বান করেছে।

সহজ জীবনের গতি ও ঔদার্য যক্ষপুরীতে নেই। সেখানকার জীবন বিকারের ঘোরে মাতাল। ধর্ম সেখানে কল্যাণস্পর্শহীন। প্রাণের জাদুতে রাজার আকর্ষণ নেই, যান্ত্রিক ক্ষমতার প্রয়োগেই তাঁর অধিক আগ্রহ।

'রামায়ণ'-এর মধ্যে কবি দেখতে পেয়েছেন কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী— এই দুই জাতীয় সভ্যতার এক বিষম দ্বন্দ্ব। আকর্ষণজীবী সভ্যতা সেকালেও ছিল, একালেও আছে। সেকালের আকর্ষণজীবী সভ্যতা ছিল শোষপ্রধান, একালে তা ধনতান্ত্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতা। পুরাকালে যেমন, একালেও তেমনি এই সভ্যতা মানবজীবনের শান্তি ও স্থিতিকে বিচলিত করেছে।

যক্ষপুরীর শ্রমিকরা একদিন কৃষিতন্ত্রের অধীন ছিল। কিন্তু কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা মেতে উঠেছে স্বর্ণ আহরণের নেশায়। সোনার লোভে, সম্পদের তৃষ্ণায় কৃষিজীবী মানুষের দল যন্ত্রসভ্যতা ও ধনতান্ত্রিকতার আশ্রয় নিয়েছে। ত্রেতাযুগে এই বৃত্তান্তই সোনার মায়ামৃগের ছলনার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। ত্রেতাযুগে যেমন আজকের দিনেও তেমনি রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভে, দুর্দমনীয় সোনার নেশায় চাষিরা কৃষিতন্ত্র ছেড়ে যন্ত্রের দাসত্ব করার জন্য ধাবমান। কৃষিতন্ত্র থেকে ভ্রষ্ট মানুষ সোনার লোভে খোদাইকরে পরিণত। সীতার বন্দীত্বের দশা আজ কলের শ্রমিকদের। সেনার লোভে খোদাইকরে পরিণত। সোনার মায়ামৃগের মায়ায় ভোলার পরিণাম 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা 'রক্তকরবী' নাটকের স্বল্প পরিসরে বেশ স্পষ্ট। যক্ষপুরীর সোনার খনির শ্রমিকরা ভগ্নস্বাস্থ্য, তাদের মনের আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সমস্ত জীবনটাই তিক্ত-রিক্ত।

বস্তুত 'রামায়ণ'-এ যে দ্বন্দ্ব, 'রক্তকরবী'-তেও রয়েছে সেই একই দ্বন্দ্ব। 'রামায়ণ'-এর দ্বন্দ্ব আরাম ও শক্তির সঙ্গে চিৎকার ও অশান্তির দ্বন্দ্ব। 'রক্তকরবী' নাটকেও শান্তি ও শক্তির দ্বন্দ্ব — নন্দিনীর মাধুর্যের সঙ্গে রাজার প্রচণ্ড শক্তির দ্বন্দ্ব। রাজার যন্ত্রনির্ভর শক্তি মানবকন্যা নন্দিনীর আগমনে বিদ্ধস্ত। প্রাণের অবাধ প্রবাহ দ্বারা সে যক্ষপুরীর বিকার আর জড়তার প্রাকারে আঘাত করল। তার সহজ জীবনের দর্পণে রাজা নিজের অসম্পূর্ণতা দেখে, মানবশক্তির কুশ্রীতা প্রত্যক্ষ করে জেগে উঠলেন। তাঁর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হল, তিনি উপলব্ধি করলেন উদার কল্যাণে জীবনের স্বার্থকতা। নিজের জীবন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাই তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন। যক্ষপুরীর অধর্মের অধ্যায় শেষ হল।

বিকার কখনো স্থায়ী হতে পারে না, রুদ্র আঘাতে তার ধ্বংস অনিবার্য— এটিই 'রামায়ণ'-এর তত্ত্ব। ধন এবং শক্তি ক্ষণস্থায়ী, সহজ জীবনযাত্রারই শেষ পর্যন্ত জয় ঘোষিত হয়। বিকারগ্রস্ত সত্তার ভাঙনের বীজটা তার অভ্যন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে। সীতা ও নন্দিনীর আগমন রক্ষোপুরী ও যক্ষপুরীকে তাদের বিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে, কিন্তু আসল লড়াইটা শুরু হয়েছে তাদের ভিতরে ভিতরেই।

'রামায়ণ'-এর বিভীষণ সুস্থতার প্রতীক, রাবণ বিকারের। 'রামায়ণ'-এর কবি দীর্ঘ পরিসরের উভয়ের চরিত্রকে বিকশিত করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আসলে তারা একই লঙ্কাপুরীর দুটি পৃথক রূপ। 'রক্তকরবী' নাটকের পরিসর অল্প হওয়ার জন্য অধর্ম ও ধর্ম— এই দুয়ের দ্বন্দ্বকে দুটি পৃথক চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ ছিল না, তা একই চরিত্রের মধ্যে দুই বিরোধীভাব সন্নিবিষ্ট করে দ্বন্দ্ব ও মোহমুক্তি দেখানা হয়েছে।

রাজার নিজের বিরুদ্ধে নিজের লড়াই দেখানোর ফলে 'রামায়ণ'-এর ভাবটি 'রক্তকরবী' নাটকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রাজার মধ্যে দুই শক্তির দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে বৃহৎভাব ও ধর্মের জয় বিঘোষিত হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'রামায়ণ'-এর সীতা ও 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মধ্যে যোগসূত্র কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী'র রাজা চরিত্রের রবীন্দ্রনাথ কেন দুটি বিরোধী ভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৬.৩ 'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি

'রক্তকরবী' নাটকের পটভূমি প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, এই নাটকের পটভূমি পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ, স্ফীত যন্ত্রসভ্যতা। মূলত পশ্চিমি ধনতন্ত্রের সংস্পর্শে এসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকটি রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতার রূপ, এর বীভৎসতা ও নিষ্ঠুর পীড়নে কবির মনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল তা থেকেই 'রক্তকরবী'র জন্ম। যে পটভূমির উপর নাটকের সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা পৃথিবীর উপরিতলের যন্ত্রজগৎকেই মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিক বিরোধী। তিনি সুন্দরের ও প্রাণের পূজারি। প্রাণকে যা পীড়ন কর তাকে তিনি কখনো ক্ষমা করেননি। যন্ত্র যে প্রাণকে পীড়ন করে, পৃথিবীতে কদর্যতা আহ্বান করে— এই সত্য কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। যন্ত্রসভ্যতার স্ফীতি মানুষের মনুষ্যত্বের বিলোপ ঘটায় মানুষের দৃষ্টিকে

খণ্ডিত করে, সংকীর্ণ করে। সঞ্চয়ের লোভ কেবল বাড়তে থাকলে তার পরিণাম ঘটে নির্যাতন-নিপীড়নে, মনুষ্যত্বের আবমাননায়। 'রক্তকরবী' নাটকটিতে আগাগোড়াই যন্ত্রসভ্যতার সেই কদর্য পরিণামের ইঙ্গিতে রয়েছে।

'রক্তকরবী' নাটক রচনার কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। আমেরিকা বসবাসকালে পশ্চিমি সভ্যতা তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "সেখানে ভোগের চেহারা দেখছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর— অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে— সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হলে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে, গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বাহাদুরির মত্তময় সে ভোঁ হয়ে যায়।

তেমনি করেই আট্‌লান্টিকের ও পারে ইঁট-পাথরের জঙ্গলে বসে আবার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই— এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগলে না।"

মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধলে তাতে 'পণ্যদ্রব্য রাশিকৃত হয়, বিশ্বজুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবড়ি ওঠে', সত্য, কিন্তু এ সমস্ত কিছুর শুধু প্রয়োজনটাই রয়েছে, কোনো 'বাণী নেই'। 'রক্তকরবী' নাটকেও এরকম এক বাণীহারা পুঞ্জীভূত প্রয়োজনের জগৎকেই রূপদান করা হয়েছে। নাটকে মাটির তলার যে রাজ্য, কবি যার নামাকরণ করেছেন যক্ষপুরী, তাতে পশ্চিমের কৃত্রিমতার ছায়াপাত ঘটেছে, নিষ্প্রাণ ঐশ্বর্যের রুক্ষ ধূসর রূপ প্রকটিত হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিকতা ও যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে কবির মনোভাব কীরূপ ছিল? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) 'এই নাটকটি সত্যমূলক' — রবীন্দ্রনাথর এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করুন।

[সংকেতসূত্র: প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) 'রামায়ণ'-এর সঙ্গে 'রক্তকরবী'র কোন দিক দিয়ে সংযোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে বিচার করুন।

[সংকেতসূত্র: প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(গ) পাশ্চাত্য যন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা 'রক্তকরবী' নাটকে কীভাবে ছায়াপাত করেছে বুঝিয়ে দিন।

[সংকেতসূত্র: প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার শেষে এই আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, 'রক্তকরবী' নাটকে পাশ্চাত্য ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব, বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার, জড়বাদ ইত্যাদি মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করছে— তারই প্রতিফলন ঘটেছে। পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে মানুষের ব্যক্তিগত আজ বিপর্যস্ত, তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, ধন ও শক্তির লোভে মানুষ আজ নিজের মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্যুত। নিজের শুভ দিক ও বৃত্তিকে উপেক্ষা করে অশুভ দিককেই মানুষ আজ প্রধান করে তুলেছে। যান্ত্রিকতার প্রভাবে আজ ক্লান্ত নির্জীব এবং প্রাণশূন্য। 'রক্তকরবী' নাটকে এই সমস্ত কথাই ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

আমরা জেনেছি যে 'রক্তকরবী' নাটকটি ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে কবির শিলং বাসকালে রচিত। প্রথমে এর নাম ছিল 'যক্ষপুরী', ১৩৩১ সালে সংশোধিত

আকারে 'রক্তকরবী' নামে এটি প্রকাশিত হয়। 'রক্তকরবী'র সঙ্গে নানা তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবেই অন্বিত হয়ে রয়েছ। 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নাটকটি সত্যমূলক। সমস্ত বিকৃতি এবং অস্বাভাবিকতাকে ছিন্ন করে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ এবং যন্ত্রসভ্যতা জীবনকে অস্বাভাবিক করে তুললে জীবনই এর প্রতিবাদ করে সত্যকে প্রকাশ করে— যেমন 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজ তাঁর কৃত্রিম জীবনের তুলনায় সত্য এবং স্বাভাবিকতার প্রতি সচেতন হয়েছেন। জীবনের শাশ্বত সত্যের প্রকাশ ঘটে সরল ও প্রত্যক্ষরূপে — কোনো রূপক বা পরোক্ষতার আবরণে নয়। তাই 'রামায়ণ'কে রূপক বলা হয়নি। ঠিক একই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথও 'রক্তকরবী'কে রূপক বলতে চাননি।

'রামায়ণ' কাহিনির সঙ্গে বিভিন্ন দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। 'রামায়ণ'-এর মধ্যে মানুষ ও তার জীবনের এক চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এই চিরন্তনত্ব এবং শাশ্বত সত্যের মানদণ্ডেই 'রক্তকরবী'র কেন্দ্রীয় সমস্যা 'রামায়ণ'-এর সমীপবর্তী হয়েছে। প্রথম সংস্করণ 'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনা অংশে কবি এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনাও করেছেন।

এই নাটকটির পটভূমি পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ ও স্ফীত যন্ত্রসভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন। যন্ত্র যে প্রাণকে পীড়ন করে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'রক্তকরবী' নাটকে যন্ত্রসভ্যতার এক শোচনীয় পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

৬.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

প্রবাসী : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। বাংলাদেশে বিশ শতকের এটি একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। রাজনীতি ও সমাজ-সম্পর্কিত সমস্যাবিষয়ক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনাগুলিও এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ।

টি. এস. এলিয়ট : বিশ শতকের বিখ্যাত গীতিকবি। ১৯৪৮ সালে তিনি নবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড' অতি বিখ্যাত। 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত নাটক।

৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

৬.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৭
রক্তকরবী
রক্তকরবী-এর চরিত্রমালা ১ : রঞ্জন, নন্দিনী ও রাজা

বিষয় বিন্যাস

৭.০ ভূমিকা (Introduction)
৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৭.২ চরিত্রবিচার
৭.২.১ রঞ্জন
৭.২.২ নন্দিনী
৭.২.৩ রাজা
৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৭.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৭.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৭.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

'রক্তকরবী' নাটকটিতে তিন ধরনের নামের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এক শ্রেণির নামের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তি-পরিচয়টি নেই। সেই নামগুলির সঙ্গে জীবিকার পরিচয় আছে। যেমন অধ্যাপক, চিকিৎসক, গোঁসাই, পুরাণবাগীশ ইত্যাদি। আর একটি শ্রেণি আছে যাদের ব্যক্তিগত নাম থাকলেও তারা সংখ্যানামেই পরিচিত। যেমন ৪৭ ফ, ৬৯ ঙ ইত্যাদি? আবার শ্রেণির নামের মধ্যে জীবিকা বা সংখ্যার ব্যাপার নেই। তারা ব্যক্তিনামেই পরিচিত। যেমন, নন্দিনী, কিশোর, রঞ্জন ইত্যাদি। এদের নামের সঙ্গে তাদের চরিত্রের একটি সামঞ্জস্য আছে।

নন্দিনী শব্দের একটি অর্থ আছে। যে ধাতু থেকে এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, তার সঙ্গে আনন্দের একটি সম্পর্ক আছে। এবং নন্দিনী চরিত্রটিও হাসিখুশিতে ভরপুর, স্ফূর্ত চরিত্র। নামের সঙ্গে তার চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিনামের অর্থ ব্যক্তিচরিত্রে সাধারণভাবে ততটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু লেখকরা সাধারণত চরিত্রসংগত নাম ব্যবহার করেন। 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জন ও নন্দিনীর নামের সঙ্গেও তাদের চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। রঞ্জন যৌবনের রঙে সব রাঙিয়ে তোলে। সে চিত্ত রঞ্জিত করে তোলে।

ফাগুলাল, গোকুল প্রভৃতি যক্ষপুরীর মানুষের সঙ্গে নন্দিনীদের পার্থক্য আছে। যক্ষপুরীর নাগরিকদের একটি বিশেষ চেহারা আছে। তারা ক্লিষ্ট। কিন্তু যক্ষপুরীর বিশেষ

সমস্যায় যদিও জীবন গ্লানিময় হয়ে ওঠে তবু সেসব নন্দিনীদের ক্লিষ্ট করে না। কারণ তারা বহিরাগত। কিশোর যক্ষপুরীর অন্তর্গত হলেও যক্ষপুরীর ব্যক্তিদের সঙ্গে তারও পার্থক্য আছে। কারণ কিশোর এখনও সে বয়সে এসে পৌঁছয়নি, যখন জীবনের গ্লানি অনুভব করা যায়। তাই সে সতেজ, প্রাণবন্ত। নন্দিনী ও রঞ্জন স্থানের দিক থেকে যক্ষপুরীর মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র আর কিশোর কালের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এগুলি হল তাদের পরিবেশগত স্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু ফাগুলাল, গোকুল যারা বহুদিন ধরে যক্ষপুরীতে পিষ্ট হচ্ছে এদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনযাত্রার ধরনটি তাদের সংলাপ থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। যক্ষপুরীর সমাজে মানুষের কতটা মূল্য আছে, একের কাজের মূল্য অপরে কতটা দিচ্ছে— এসব প্রশ্ন তাদের সংলাপে রয়েছে। সম্পর্কের মধ্যেও গড়ে উঠেছে একটি বিনিময়প্রথা। কর্মীদের সঙ্গে তাদের কর্মফলের কোনো যোগাযোগ থাকছে না। ফলে কর্মীরা তাদের কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে কাজ সে করছে তার সঙ্গে হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবিকা মানুষকে তার সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব থেকে ছিন্ন করে খণ্ডিত করে তুলেছে। জীবিকা প্রত্যেকের মুখে একটি মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের একটি বিশেষ নিয়মে মানুষ এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছয় যেখানে সমস্তকিছু নির্মিত হয় লাভের দ্বারা। সেই সমাজে মানুষকে একটি পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয়েছে। সে সমাজ নির্লজ্জ, কারণ সেখানে চিকিৎসক, উকিল, অধ্যাপক, ধর্মযাজকরা বেতনভুক্ত শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। যক্ষপুরীর মানুষগুলি কেউ আর সম্পূর্ণ মানুষ নয়, তারা বিরাট যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলেছে, তার অস্তিত্বকে করেছে লুপ্ত।

কিন্তু মনে রাখতে হবে 'রক্তকরবী' নাটকের সমস্যা বা প্রতিবাদ যন্ত্র বা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। লাভের লোভে সমাজ মানুষকেও যন্ত্র করে তুলেছে। সেখানে মানুষের মূল্য নেই, লাভের মূল্য আছে। এরই ফলে মানুষ সংখ্যায় পর্যবসিত। মানুষ যখন তার সংখ্যা-পরিচয়ে লাঞ্ছিত হয় না তখনই বোঝা যায় সে ভেতরে ভেতরে সমস্ত সম্পর্ক থেকে দূরে সরে এসেছে। এর ফলে মানুষ তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিকে যেতে পারছে না। ব্যক্তিনামের দরকার হয় ব্যক্তি পরিচয়ের জন্য। ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হবার জন্য এই পরিচয়ের প্রয়োজন। কিন্তু নাম না থাকলে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে যায় এবং বর্তমান সমাজেও তাই হয়েছে। 'রক্তকরবী'র সমাজেও প্রত্যেককে পিণ্ড পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা অধ্যাপক বা ৪৭ ফ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কিন্তু যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে নাটকে। যেমন যক্ষপুরীর সর্দার ফাগুলালদের নাম সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও বিশু, গোকুল, ফাগুলাল এরা একে অপরকে সংখ্যানামে ডাকে না। তারা পরস্পরকে ব্যক্তিনামে সম্বোধন করে। অর্থাৎ তাধের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা সম্বন্ধ আছে। এদের বেয়াই, নাতনী, পাগলভাই, দাদা ইত্যাদি সম্বোধন আমাদের আশ্বাস দেয় যে সেখানে সম্পর্কের একটি মূল্য আছে। সুস্থ

সমাজের চিহ্ন সে সম্পর্ককে বাড়াতে চায়। কোনো ব্যক্তিই কেবলমাত্র পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চায় না, তার সম্পর্ক বেড়ে চলে, এবং সম্পর্কের গণ্ডিকে বৃদ্ধি করবার প্রবণতাটিই সুস্থ সমাজ বা মানুষের লক্ষণ। পুঁজিবাদী সমাজ একে নষ্ট করতে চায়। কিন্তু ফাগুলালরা সকলের আড়ালে একটি সম্পর্ক তৈরি করে চলেছিল এবং একদিন সেই যান্ত্রিক সমাজটাকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছিল।

সমাজের এই বাস্তবতাকে দেখাবার জন্যই সংখ্যানাম এবং জীবিকানাম নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। এই যান্ত্রিকতাকে বিনষ্ট করে ফাগুলালরা সেই সমাজে পৌঁছতে পেরেছিল যেখানে তাদের ব্যক্তিনামের মূল্য আছে।

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কিত আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় নাটকে অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণ। এই পর্বে আমরা রঞ্জন, নন্দিনী ও রাজা— নাটকের এই তিন প্রধান চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করব। নাটকের অন্য কয়েকটি চরিত্রের (বিশু, কিশোর, অধ্যাপক) বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনারা—

- 'রক্তকরবী' নাটকের চরিত্রসমূহের নামকরণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- নাটকের বিশেষ কিছু চরিত্রের নামহীনতার কারণটিও অনুধাবন করতে পারবেন।
- আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষিত তিনটি চরিত্রের নাট্যোপযোগিতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৭.২ চরিত্রবিচার

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের ভূমিকাংশে 'রক্তকরবী' নাটকের চরিত্রসমূহের নামকরণের তাৎপর্যের বিষয়টি আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি। উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে রেখে এবারে আসুন এই পর্বে আমাদের আলোচ্য তিনটি চরিত্র এক এক করে বিশ্লেষণ করা যাক।

৭.২.১ রঞ্জন

'রক্তকরবী' নাটকে দুটি বিরোধী পক্ষের সংঘাত রূপলাভ করেছে— এক পক্ষের সেনাপতি সর্দার, অন্যপক্ষের সেনাপতি অদৃশ্য, নেপথ্যচারী রঞ্জন। এই দুই দলের রাজাকে অধিকার করার দ্বন্দ্বই নাটকটির মূল ভিত্তি। কদর্যতা যে কখনোই সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে

উঠতে পারে না এই তত্ত্বকে পরিস্ফুট করার জন্য রঞ্জন চরিত্রের অবতারণা। রঞ্জন যৌবনের প্রতীক। যৌবনের আবেগ ও শক্তি, সাহস, আনন্দ, গতিবেগ সমস্তই তার মধ্যে সম্পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। তাকে কোনো নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। কাজের কঠিন নিয়মে তাকে বন্দী করা যায় না। সে মুক্তিসাধনার আদর্শ— দুঃখের ঊর্দ্ধে, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তার প্রতিষ্ঠা। যক্ষপুরীতে মুক্তির মহামন্ত্র বিতরণ করে সেখানকার সুপ্ত প্রাণকে সে জাগিয়েছে। যক্ষপুরীতে প্রয়োজন আনন্দকে অতিক্রম করেছিল, সেখানকার ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল যান্ত্রিক। সেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা জীবনের গতিকে করেছিল রুদ্ধ। সেই অবরুদ্ধ ব্যবস্থায় রঞ্জনের আগমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গতির তরঙ্গ। রঞ্জন শক্তির সংহত রূপ। সে আনন্দের প্রতীক— আনন্দে সে সকলের মন রাঙিয়েছে। রঞ্জিত করার মোহন-মন্ত্র নিয়ে যক্ষপুরীতে তার আবির্ভাব।

১৯০৮ সালে লিখিত 'শারদোৎসব' নাটকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাট্যের যে পালাবদলের সূচনা হয়, তার বেশ কিছু নাটকের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষণীয়; তা হল কোনো এক বিশেষ চরিত্রের বা প্রধান চরিত্রের শারীরিক অনুপস্থিতি। 'রক্তকরবী'তেও রাজা চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় না। রাজা কথা বলেন জালের আড়াল থেকে, অবশেষে নাটকের শেষাংশে দ্বারোদঘাটন ও রাজার আত্মপ্রকাশ। অনুরূপভাবে 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জন চরিত্রটিও নাটকে দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুপস্থিত। রাজা এবং মৃত রঞ্জনের শরীরী আত্মপ্রকাশ প্রায় একই সঙ্গে। জীবিত অবস্থায় রঞ্জনের নাট্যদৃশ্যে এই অনুপস্থিতির বিষয়টি নাটকের উদ্দেশ্য এবং বক্তব্যের নিরিখে বিচার্য।

এই উপস্থাপনার মধ্যে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার আগে রঞ্জন চরিত্রের স্বরূপটি বোঝা দরকার। যক্ষপুরীর মধ্য দিয়ে একটি আবদ্ধ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অপরের জন্য সম্পদ আহরণ করছে। তাদের জীবনের যথার্থ কোনো উদ্দেশ্য নেই। যক্ষপুরীর এই অবস্থার মধ্যে নন্দিনী এসেছে, তাকে কিন্তু চারপাশের পরিবেশ চেপে ধরেনি, বরং সে সকলকে উজ্জীবিত করে তোলে। নন্দিনীর প্রণয়ী হল রঞ্জন। সে যদিও প্রত্যক্ষভাবে নেই কিন্তু নন্দিনীর মধ্য দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। পরস্পরের ওপর তাদের ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতা এত বেশি যে একজনের উপস্থিতি যেন অপরজনকেও উপস্থিত করায়। নন্দিনীর কথাবার্তা চলাফেরায় যেন রঞ্জনের ভালোবাসার একটি পরিবেষ্টন থাকে। রঞ্জন চঞ্চল— নন্দিনীর বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। রঞ্জন সম্পূর্ণ জীবনকে যৌবনের আমেজে উপভোগ করতে পারে। সে যেন সমস্ত জীবনকে কানায় কানায় পান ও ভোগ করছে। এই ধ্রুবাত্মক দিক থেকে রঞ্জনকে আমরা জানতে পারি। যক্ষপুরীতে আসার পর রঞ্জনের ক্রিয়াকর্ম থেকে বোঝা যায় যে সে এসেছিল নন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। কিন্তু যক্ষপুরীতে এসে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ধরনটি দেখতে পেয়ে নিজেও তাদের সঙ্গে মিশে গেছে এবং শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের ভার সে নিজেও বহন করার চেষ্টা করেছে। বিশু কারাগারে যাবার আগে শ্রমিকদের সংগঠিত করার যে আয়োজন করেছিল সেই কাজের ভার সে রঞ্জনকে

দিয়ে গেছে। অর্থাৎ রঞ্জন নানা কাজে জড়িয়ে গেছে। সে গ্রামের সহজ জীবনযাপনের মধ্যে ছিল এবং যক্ষপুরীতে নন্দিনীর খোঁজে এসেছিল। কিন্তু এখানে আসার পর অন্য কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে নন্দিনীকে খোঁজার কাজ কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখল। তার প্রেম ও কর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। নন্দিনী-রঞ্জনের মিলিত ভালোবাসা আমাদের দেখিয়েছে যে কীভাবে ভালোবাসা জীবনের কর্মের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করতে পারে। সুস্থ সম্পূর্ণ ভালোবাসাই বিশেষ করে কর্মের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করে দেয়। নন্দিনীর প্রতি ভালোবাসা রঞ্জনকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পেরেছিল বলেই সে যক্ষপুরীর কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পেরেছে।

বিশুর মতো রঞ্জন প্রেমিক ও কর্মী। কেবল পার্থক্য এই যে বিশুর কর্মী মূর্তিটি আছে বাইরে আর প্রেমিক মূর্তিটি অন্তরালে। আর রঞ্জনের ক্ষেত্রে তার প্রেমিক মূর্তিটি রয়েছে আগে, কর্মী মূর্তিটি দেখা যায় পরে। আর একটি পার্থক্য এই যে রঞ্জনের মধ্যে কোনো অপূর্ণতা নেই, কিন্তু বিশু একটি অপূর্ণতার দুঃখ নিয়ে চলছে। রঞ্জনের মধ্যে সুখের, উল্লাসের, চাঞ্চল্যের ছবি রয়েছে। কিন্তু বিশু ও রঞ্জন এই দুজনকে মিলিয়েই জীবনের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায়। রঞ্জন ও বিশু সুস্থ জীবনের সম্ভাব্য রূপের ছবি তুলে ধরেছে।

'রক্তকরবী'তে বর্ণিত যক্ষপুরীতে চলছে এক নিশ্ছিদ্র কাজের আবর্তন। নন্দিনী নামে নারী সেখানে এক ব্যতিক্রম। অধ্যাপক, খোদাইকর, সর্দার, মোড়ল সবাই যেন খণ্ডিত চরিত্রের মানুষ। এই কাজের জগতে রঞ্জন যে ছুটির মধু নিয়ে আসবে তার আগাম সংবাদ পাওয়া যায় অধ্যাপক ও নন্দিনীর সংলাপের মাধ্যমে। নাট্যঘটনা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে যক্ষপুরীর নিয়ম-শৃঙ্খলিত জীবনের সঙ্গে রঞ্জনের স্বভাবের বৈপরীত্যের ছবিটি ফুটে ওঠে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে, অর্থাৎ রঞ্জন নাট্যদৃশ্যে সশরীরে অংশগ্রহণ না করেও নাট্যঘটনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছে। প্রত্যক্ষভাবে রঞ্জন উপস্থিত না থেকেও এক বহুলালোচিত চরিত্র হয়ে উঠেছে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনিবার্য হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। রঞ্জনের আগমনের প্রত্যাশায় এবং আশঙ্কায় নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র দোলায়িত হয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রকে সরাসরি নাটকে উপস্থাপিত না করার মধ্যেই আছে রঞ্জন চরিত্রটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এরই ভিত্তিতে রঞ্জনের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

যক্ষপুরীর মকররাজ সম্পদ সংগ্রহের তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। প্রেমাবেগের আঘাতে লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে ছিন্ন করে নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় রাজা কী করে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন, তা দেখানো হয়েছে নন্দিনীর মাধ্যমে। রঞ্জন নন্দিনীর ভালোবাসার পাত্র, রঞ্জনই নন্দিনীর মনকে রাঙিয়েছে। রঞ্জনের প্রতি প্রেম ও তার আগমনের প্রতীক্ষাই নন্দিনীকে প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যমের জোগান দিয়েছে। আর এদিক থেকে রঞ্জনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির চেয়ে অপ্রত্যক্ষ আয়োজন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নন্দিনীর কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় যে রঞ্জন যক্ষপুরীতে এলে এখানকার চলতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটব। নাটকের বক্তব্যের দিক থেকে দেখা যায় যে রঞ্জনের আগমনের পরাই রাজার অন্তিম পরিবর্তন সাধিত হল। রঞ্জনকে যদি প্রত্যক্ষভাবে নাটকে প্রথমাবধি উপস্থিত করা হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের নারীর মাধ্যমে প্রাণশক্তির প্রবর্তনের তত্ত্বটি ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং রঞ্জন ও রাজার দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে নাটকের অবসান হত তাড়াতাড়ি।

নন্দিনী এবং রঞ্জন একে অন্যের পরিপূরক। এই দুই চরিত্রের সঙ্গে রাজার চরিত্রের বৈপরীত্য তৈরি করে রাজার ক্রমিক বিবর্তনের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে তুলে ধরেছেন। যন্ত্রশক্তি এবং প্রাণশক্তির সংঘাতের ফলে মকররাজের অন্তরের যে ক্রমোন্মোচন নাটকে বিবৃত হয়েছে, রঞ্জন চরিত্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হত, এবং রাজার পরিবর্তনের ছবিটি ধরা পড়ত না।

'রক্তকরবী' নাটকের মকররাজ স্থবির, প্রাচীন, নিঃসঙ্গ, জীবনানন্দে চঞ্চল নন্দিনীকে তিনি পেতে চান, জানতে চান প্রাণের রহস্য। কিন্তু তাঁর চাহিদা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল। রাজা চান নন্দিনীকে অধিকার করতে, কিন্তু প্রাণের রহস্য জানতে হয় প্রাণ দিয়েই, আর তা জানে রঞ্জন; আর তাইতো রাজা ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতকে ধরতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন অথচ রঞ্জন দূরে থেকেও নন্দিনীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে ছিল। রঞ্জনকে অপ্রত্যক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথ শারীরিক নৈকট্যের জড়ত্বের উপর আত্মিক নৈকট্যের জয় ঘোষণা করেছেন রঞ্জনেরই মাধ্যমে।

অবশেষে সর্দার ও মোড়লের কথোপকথনে যক্ষপুরীতে রঞ্জনের আগমন-সংবাদ জানা যায়। কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় রাজার দ্বার-উদঘাটনের পর। কিন্তু সে রঞ্জন মৃত, রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে সে প্রাণ দিয়েছে। লক্ষণীয় যে রাজা এবং মৃত রঞ্জনের আত্মপ্রকাশ প্রায় একই সময়ে। যতক্ষণ রাজা আত্মপ্রকাশ করেননি, ততক্ষণ জীবিত রঞ্জনের প্রসঙ্গ নাটকে বারবার আলোচিত হয়েছে, আবার যখন রাজা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন, তখনই রঞ্জনের প্রয়োজন শেষ হল।

মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। রঞ্জনের মৃত্যুও একদিকে নন্দিনীর মধ্যে, অপরদিকে যক্ষরাজের মনে দ্বিমুখী প্রভাব ফেলেছে। নাটকের অন্যতম প্রধান ঘটনা এই রঞ্জনের মৃত্যুর দ্বিমাত্রা 'রক্তকরবী'র বিশেষত্ব। রঞ্জনের মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় হত্যাকারী মকররাজের মধ্যে মানস প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। রঞ্জনের মৃত্যু রাজাকে জাগিয়েছে। তেমনি রঞ্জনের মৃত্যুতেই নন্দিনী শক্তির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিশোরের মৃত্যু সেই শক্তিকে করেছে আরো দৃঢ়। রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সত্তারূপে প্রতিফলিত, অতঃপর রাজার মধ্যে সঞ্চারিত; শেষে অধ্যাপক, ফাগুলাল প্রভৃতির মধ্যে প্রসারিত। রঞ্জনের মরণই নন্দিনীকে পূর্ণতা দিয়েছে। আর নন্দিনীকে এই পূর্ণতা প্রদান করে রঞ্জনও যেন মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পেরেছে। এই

পূর্ণতা অর্জনের জন্যই নন্দিনীর এতদিনের প্রতীক্ষা ছিল, রঞ্জনের মৃত্যুর মাধ্যমে সেই পূর্ণতারই স্বীকৃতি। রঞ্জন কেবল একা রাজাকেই প্রাণ দেয়নি, নন্দিনীকে দিয়েছে পূর্ণতা, আর নিজেকে করেছে মৃত্যুঞ্জয়। বলা যায় বহু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নাটকের শেষাংশে রঞ্জনের মৃত্যুদৃশ্য রচিত হয়েছে।

তাছাড়া নাটকের বক্তব্যের দিক থেকেও এবার রঞ্জনের কাজ ফুরিয়েছে। নন্দিনীর ভেতরের যে আগুনকে রাজা দাহন করে বের করতে চেয়েছিলেন, নিজের অজ্ঞাতে রঞ্জনকে হত্যা করে তিনি সেই আয়োজন সম্পূর্ণ করেছেন। আবার রঞ্জন অন্যদিকে প্রেরণার কাজ করেছে, সে তার প্রাণশক্তি রাজার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছে, শক্তিদণ্ড ভাঙার মধ্য দিয়ে রাজা নতুন সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করছেন। রাজার ছিল না নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা, এবার তিনি প্রেম এবং মরণের মাধুর্য অনুভব করে সেই পথে অগ্রসর হয়েছেন। রঞ্জনের যৌবন রাজার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যে খোদাইকররা এতদিন শুধু শোষিতই হয়েছে, আজ তারা রঞ্জনের মৃত্যুর অভিঘাতেই সর্দারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। বলা যায় মৃত রঞ্জনই যেন তাদের নেতা। রঞ্জনের মৃত্যু তাদের প্রণোদিত করেছে।

বলা যায় রঞ্জনের মৃত্যুদৃশ্যটিও নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যে ব্যক্তি- রঞ্জনের শরীরী উপস্থিতি নাটকে প্রথমাবধি নেই, সেই রঞ্জনের মৃতদেহটি অথবা মৃত্যুদৃশ্যটি বহু উদ্দেশ্য সাধন করেছে। নাট্যকার রঞ্জনের মৃত্যুর আঘাত দিয়ে প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে আবেগ ও শক্তিসঞ্চার করেছেন— যা মনস্তত্ত্বসম্মত।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

রঞ্জন এবং বিশু চরিত্রের সমধর্মিতার দিকটি পরিস্ফুট করুন। (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রঞ্জন চরিত্রের অবতারণা নাটকের বক্তব্যের দিক থেকে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"রঞ্জন 'বিধাতার হাসি', মরা জিনিসের ভেতরে প্রাণকে নাচাতে পারে, ভাঙতেও পারে। জীবনকে সে এমনভাবে দেখে, মরণ যার কাছে তুচ্ছ। 'প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে।' সে বিশুর ঠিক বিপরীত প্রান্ত। রাজা নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' নন্দিনীর উত্তর ছিল, 'এখ্‌খনি'। রাজা তা বিশ্বাস করেন নি এবং ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রঞ্জনের প্রতি প্রেমই নন্দিনীর প্রাণ, কাজেই সেই প্রেমের জোরেই রঞ্জনের মৃত্যুকে সে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছে। এরই নাম— প্রাণ দেওয়া। রঞ্জনের যে আজ মৃত্যু ঘটবেই, নানা Premonition এবং Foreshadowing-এর মাধ্যমে তা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। রাজা ও রঞ্জন পরস্পরের 'শনিগ্রহ', একে অপরের কাছে বিপদস্বরূপ। রাজার কাছে সেই বিপদ পরিণামে অত্যন্ত কল্যাণকর, তিনি মুক্তি পেয়েছেন রঞ্জনেরই মৃত্যুর মাধ্যমে। আর রঞ্জনের কাছেও সে বিপদ কল্যাণকর, —সে মরণের মাধ্যমেই মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠেছে। রঞ্জন বীরের মতো মৃত্যুকে বরণ করেছে, রাজার কাছে নিজের নাম-পরিচয় ব্যক্ত করেনি। দুর্বলের হীন মরণ কখনোই মরণজয়ী হতে পারে না। এইজন্যেই নন্দিনী তার মাথায় নীলকণ্ঠ পাখির পালক পরিয়ে দিয়ে যেন বলেছিল ঃ 'জয়যাত্রায় যাও গো।' 'তোমার সোনার প্রদীপে জ্বালো, আঁধার ঘরের আলো।' রাজা বলেছিলেন, নন্দিনীর ভেতরে যে আগুন আছে, 'একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।' নিজের অজ্ঞাতে রঞ্জনকে হত্যা করে, সেই আঘাতে সত্যিই তিনি নন্দিনীর ভেতরের আগুন দাহন করে বের করে এনেছেন। এ যেন নিয়তির অভিভব, এ না করে যেন 'নিষ্কৃতি' ছিল না। রঞ্জনের মৃত্যু না হলে নন্দিনীর অন্তরের আগুন বের হত না। কদর্থে গোকুল তাকে 'রাঙা আলোর মশাল' বলেছিল, সেটাই তখন মনোরম এক Irony-র নিদর্শন হয়ে সদর্থক হয়ে উঠেছে। হাসি-নৃত্য-সুরে-আনন্দে-উদ্যামতায় রঞ্জন জীবনের এক অনন্য অনুভূতি। তার কাছে জীবন-মৃত্যু যথার্থই 'পায়ের ভৃত্য'।

[রবীন্দ্রনাথ : রক্তকরবী— নির্মলেন্দু ভৌমিক]

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) রঞ্জন চরিত্রের নাট্যোপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) রঞ্জন চরিত্রটি নাট্যদৃশ্যে অনুপস্থিত থেকেও নাট্যক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে— এই অভিমতের সারবত্তা প্রতিপাদন করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৭.২.২ নন্দিনী

'রক্তকরবী' নাটকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার একটি ছবি তুলে ধরেছেন কবি। এই যান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি সহজ সরল নিষ্পাপ মেয়ে এসেছে, বর্তমান জীবনের জটিলতা ক্লেদ গ্লানি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা যার নেই। সে সহজ আর সহজ বলেই যক্ষপুরীর বাসিন্দা— যারা কিছু পরিমাণে বিকৃতির শিকার— তারা নন্দিনীকে স্বতন্ত্র চোখে দেখে। তারা যেহেতু বিকৃতির ফলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই আচ্ছন্নতা থেকে নন্দিনীর দিকে তাকালে তাকেই তাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এজন্যই নন্দিনীকে নিয়ে তাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। নন্দিনী সম্পর্কে তাদের কৌতূহল কখনো কখনো বিস্ময় ও মুগ্ধতায় পৌঁছে যায়। চন্দ্রা একবার বিশু সম্পর্কে বলেছে 'ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে'। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় শুধু বিশু নয়, অনেককেই নন্দিনীতে পেয়েছে। তাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারছে না। সে এসে যক্ষপুরীর জীবনে যেন একটা ঢেউ তুলেছে। সকলকে তাদের অবস্থা-বন্ধনের বাইরে নিয়ে গেছে। সমাজের মধ্যে সকলেরই একটি বিশেষ অবস্থা-বন্ধন থাকে। সেই বন্ধন মুক্তির একটি সম্ভাবনাও থাকে— যে মুক্তির পথ নন্দিনী দেখিয়েছে— সবাই এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এখানেই নন্দিনীর গুরুত্ব যে সে বেরিয়ে আসার ইচ্ছাটা জাগিয়ে তুলেছে বা তাদের অবস্থাটাই যে চূড়ান্ত নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছে। এ সম্পর্কে নাটকের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। নাটক প্রসঙ্গে এই কথাটির গুরুত্ব অনেক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল নন্দিনী। সাধারণতে মনে হতে পারে রাজাই হলেন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কারণ নাটকের প্রথম থেকে তাঁর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। রাজার সমস্যাটি একটি বড়ো সমস্যা। রাজা ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত দুই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর মূর্তিটি এক দিক থেকে সমাজের মূর্তিও বটে। তাই 'রাজা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, এটা মনে হতে পারে। রাজা সত্যিই কেন্দ্রীয় চরিত্র, তিনি সেই শক্তি, অশুভ থেকে শুভতে যাঁর উত্তরণ ঘটছে। কিন্তু তার এই শুভ মূর্তি উদয়ের মূল শক্তি নিহিত আছে নন্দিনীর অস্তিত্বের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে নাটকের এই শুভ মূর্তির সমস্ত কেন্দ্রীয় ভাবনার মূলে রয়েছে নন্দিনী নামের একটি নারী।

এই ব্যাপারটি কিন্তু 'রক্তকরবী'তেই প্রথম রূপলাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই এই ব্যাপারটি রয়েছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকির জ্ঞানোদয় হয় সেই বালিকাকে দেখে যাকে বলি দেবার জন্য আনা হয়েছিল। নন্দিনীকেও আলংকারিক অর্থে বলি দিতেই আনা হয়েছিল যক্ষপুরীতে। সে আলংকারিক অর্থে দস্যু সমাজেই এসেছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'-এর বালিকাটি যেমন তার মুখচ্ছবি দিয়ে বাল্মীকিকে ভুলিয়েছিল, সেই একই ভাবনার এক জটিল ছবি রয়েছে 'রক্তকরবী'তে। 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহকে নিয়ে যখন সমস্যা সৃষ্টি হয় সেখানে অপর্ণাকে আনা হয়, —যার করুণ কাতর ক্রন্দনধ্বনি সব

পুরোনো অভ্যাসকে বদলে দিতে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেমন অল্পবয়সী কিশোর চরিত্রের সাহায্যে সমাজের গ্লানিকে বুঝিয়েছেন তেমনি নারী চরিত্রদের সাহায্যেও তা দেখিয়েছেন। 'রক্তকরবী' রচনার কয়েক বছর আগে ১৯১৬-১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকায় যান। তাঁর সেখানকার বক্তৃতাগুলি 'Nationalism' ও 'Personality' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। 'Personality' গ্রন্থের 'Women' প্রবন্ধে তিনি বর্তমান আধুনিক ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার সংকটের মুক্তির পথের কথা বলেছেন এবং তাঁর মতে সেই মুক্তির পথ রয়েছে নারীর মধ্যে। সে তার সহানুভূতি নিয়ে জটিলতার মধ্যে দাঁড়াতে পারে। রবীন্দ্রনাথ Materialistic Civilizationএর পরিবর্তে Spiritual Civilization প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন সভ্যতার ভিত্তি এখন জড়বাদে, এর থেকে সরে গিয়ে অধ্যাত্মবাদে পৌঁছানোই হল মুক্তি। সে অধ্যাত্মবাদ রয়েছে প্রাচীন ভারতে। Spiritual Civilizationএর প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য। এই পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নারী। রবীন্দ্রনাথ পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রভেদ দেখেছেন। নারীকে বন্দী করার জন্য সমাজে যে সব শৃঙ্খল রয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেসমস্তর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি জিনিস তিনি মনে রেখেছেন যে, নারী ও পুরুষ-প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। নারীর প্রকৃতি হল ভালোবাসার, বেঁধে রাখা ও স্থৈর্যের প্রকৃতি। পুরুষের মধ্যে রয়েছে একটি গতি। নারী যেন এই উর্দ্ধশ্বাস ধাবমানতার সঙ্গে তার স্থৈর্যের সমন্বয় ঘটায়। স্নেহ মমতা দিয়ে নারী এক মমতাময়ী মূর্তি তৈরি করে এবং সভ্যতার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থৈর্য সৃষ্টি করতে পারে, —এই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। 'রক্তকরবী'র পর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি' ও 'কালান্তর'-এর 'নারী' প্রবন্ধেও তিনি এই একই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই ধারণাটিই একটি মানবীরূপ লাভ করল 'রক্তকরবী'র নন্দিনীতে এসে। এখানে নন্দিনীও তার স্নেহ মমতা নিয়ে এসেছে এবং তাকে বিস্তারিত করতে চেয়েছে। তখনই বোঝা যায় সে কেন সর্দারদের কাছেও কুঁদফুলের মালা নিয়ে গেছে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে অনেক জড়তার মীমাংসা হতে পারে এটাই নন্দিনীর ধারণা। চারপাশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এটিই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সংযোগকেই সবচেয়ে বড়ো মূল্যবোধ বলে মনে করেন এবং এর সবচেয়ে বড়ো আশ্রয় হল নারী। তাই তাঁর বহু নাটকে নারীই হল মুক্তির পথ। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি তাত্ত্বিক চিন্তা। এই তাত্ত্বিক ভাবনাটি যখন কোনো গল্প-উপন্যাসে কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয় তখন চরিত্রটিকে বিশ্বাস্য করে তুলতে হয়। প্রশ্ন হল সেই অর্থে নন্দিনীকে একটি বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বলে মনে হয় কি? নন্দিনী যদি শুধুমাত্র একটি সরল নারী হত তবে তার চরিত্রের কোনো নাটকীয় জোর থাকত না। নাটকটির মধ্যে নন্দিনী একবারও কোনো তত্ত্বকথা উচ্চারণ করেনি বা সে কী ব্রত নিয়ে এসেছে সে কথা বলেনি। অপর্ণা 'বিসর্জন' নাটকে বলি বন্ধ করতে বলেছিল, জয়সিংহকে মন্দির ছেড়ে বাইরে আনতে চেয়েছিল। নন্দিনী অপর্ণার মতো এরকম কোনো চরিত্র নয়। যদিও সে রাজাকে ঘর থেকে বের করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সে দ্বিধা করেনি। সবাই কেন তাকে দেখে বিস্মিত হয় এটা নন্দিনী বুঝতে

পারেনি। এবং এটাই তাকে স্বাভাবিক করে তুলেছে।

নন্দিনী প্রথমে যক্ষপুরীতে এসে বিস্মিত হয়ে দেখেছিল যে এখানকার বাসিন্দারা যেন সুস্থ নয়, তারা সবাই সন্দেহ করছে বা সব সময়ই বিরক্ত হয়ে আছে। এগুলি বিকৃতির লক্ষণ। নন্দিনী চায় তারা যেন এর থেকে মুক্ত হয়। কেন সর্দাররা মারমুখী হয়ে রয়েছে, রাজা কেন তাঁর ঘর থেকে বেরোন না— এসব প্রশ্ন নন্দিনীর মনে জেগেছে। সে জানে না যে এই পৃথক পৃথক প্রশ্নগুলি আসলে একই প্রশ্ন অর্থাৎ প্রশ্নগুলির উত্তর একটিই। অধ্যাপকও নন্দিনীকে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। যক্ষপুরীর বাসিন্দারা এরকম কেন নন্দিনীর এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেছেন তুমি তো রাজার বন্ধু। অধ্যাপক এখানে বলতে চেয়েছেন যে এই মানুষগুলির এই অবস্থার মূল হেতু হলেন রাজা, তাঁকে বুঝতে পারলেই সব জানা যাবে। নন্দিনী অধ্যাপক ও বিশুর কাছে রাজার বিশাল চেহারার বর্ণনা দিয়েছে 'কপালখানা যেন সাত মহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন দুর্গমদুর্গের লোহার অর্গল।' তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সে কত মমতা দিয়ে রাজাকে দেখেছে। এজন্যই অধ্যাপক বলতে চেয়েছেন যে যাকে নন্দিনী মমতা দেখাচ্ছে সে-ই সর্বনাশের মূল। কিন্তু নন্দিনী অবোধ, সে তা বুঝতেই পারছে না। নাটকটির মধ্যে রাজার যেমন একটি ক্রমিক পরিবর্তন আছে, তেমনি নন্দিনীরও একটি পরিবর্তন দেখা যায়। নাটকের প্রথমে যে নন্দিনীকে দেখি সেই নন্দিনী আর নাটকের শেষের নন্দিনী মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তন রয়েছে। রাজাকে যখন সে বলেছে 'এবার সময় হল', তখনই বোঝা যায় যে সে আত্মবোধে এসেছে, কোন সমাজের মধ্যে সে রয়েছে তা বুঝতে পারছে, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ঠিকমতো চিনতে পারছে। এটি কিন্তু হঠাৎ ঘটেনি, ধীরে ধীরে সে এই সমাজকে চিনতে পারছে। তার অভিজ্ঞতাটি স্তরে স্তরে দেখানো হয়েছে। যেমন গজ্জু পালোয়ানের ঘটনা। গজ্জুর মতো পালোয়ানকে অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে নন্দিনী অবাক হয়েছে। রাজার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গজ্জুর এই অবস্থা হয়েছে। আহত গজ্জুকে কেউ সাহায্য করেনি। তাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে সাহস করেনি। কারণ, এটি যক্ষপুরীর নিয়ম অনুসারে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এবং এই নিয়ম না মানলে রাজার রোষভাজন হবার ভয় থাকে। নন্দিনী গজ্জুকে সাহায্য করতে গেলে অধ্যাপক তাকে বাধা দিয়েছেন। নন্দিনী দেখেছে মনুষ্যত্বকে কীভাবে নিঃশেষ করা হচ্ছে। সে দেখেছে, যে নির্যাতিত সেও সাহায্য নিতে ভয় পাচ্ছে। নন্দিনীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এই দৃশ্যটি জরুরি। আবার অনুপ, উপমন্যুদের সঙ্গে নন্দিনীর দেখা হবার দৃশ্যটিও জরুরি। তাদের দুরবস্থা দেখে নন্দিনী আর্তনাদ করে উঠেছে। এই দৃশ্যটি হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা সংগ্রহের আর একটি স্তর। যে রাজাকে সে শ্রদ্ধা করে সেই রাজা যে কীভাবে সমস্তকিছুকে গ্রাস করে নিচ্ছেন তা নন্দিনী বুঝতে পারছে। যাদের সে ভালোবাসে তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে ভীত হচ্ছে। বিশুর জন্যেও সে ভীত হয়েছে। সে দেখেছে কীভাবে তারা বিশুকে বন্দী করেছে। যদিও সে কোনো অপরাধ করেনি তবুও তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। এটিও নন্দিনীর আর একটি অভিজ্ঞতা। এরপর সে রঞ্জনের জন্য উতলা হয়েছে। এবং তাকেও মরতে দেখেছে। কিশোরের মৃত্যু দেখেছে। এসব দেখে সে বুঝতে পেরেছে

যে সে আছে এটাই যথেষ্ট নয়। তাকে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ততদিনে সে অভিজ্ঞ, শক্ত নারী হয়ে উঠেছে, যে লড়াই করতে চায়। এই সাধারণ নারীটিই তখন নেতৃ হয়ে উঠেছে। তার এই নেতৃ হয়ে ওঠার ঘটনাটি অবিশ্বাস্য নয়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেও এমন এনেক নারীকে দেখা যায়। নন্দিনীর উপস্থিতির একটি অন্য তাৎপর্যও রয়েছে। রঞ্জন ও নন্দিনীকে মিলিয়ে দেখলে সেই তাৎপর্য ধরা পড়ে।

বাস্তবজীবনে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে নামের সুসংগতি বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সাহিত্যে অনেক সময় লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে চরিত্রদের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণ করেন। কখনো কখনো চরিত্রদের সঙ্গে তাদের নামের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। 'ডাকঘর'-এ অমলের নামের সঙ্গে যেন তার নিষ্পাপ চরিত্রের একটি সঙ্গতি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রায়ই এধরনের সঙ্গতি দেখা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকের দুই চরিত্র রঞ্জন ও নন্দিনীর নামকরণও যে রবীন্দ্রনাথের সচেতন চিন্তা-প্রসূত তা বোঝা যায়, কারণ নাটকটির প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপিতে নায়িকার নাম ছিল খঞ্জন বা খঞ্জনা। এই নামেরে পর মাত্র কয়েকদিনের জন্য সুনন্দা নামটিও ছিল। তবে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকেই নন্দিনী নাম রয়েছে। নন্দিনী শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে 'নন্দিত' বা 'আনন্দিত' শব্দ থেকে। যার সত্তায় আনন্দ আছে, যে আনন্দ ছড়াতে পারে তাকেই বলা হয় নন্দিনী। 'রক্তকরবী' রচনার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাম্নী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, যার মধ্যে অনেক মেয়ের নানা ধরনের নাম এবং তাদের চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। 'রক্তকরবী' ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয়। এর দুবছর আগে বিশ্বকবি তাঁর পুত্রের পালিতা কন্যার নাম রেখেছিলেন নন্দিনী। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে এই নামটির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল, তার পছন্দ ছিল। 'নাম্নী' কবিতায় নন্দিনী নামের কোনো মেয়ের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র নন্দিনীকে মেলানো যায়। রাজার মুখে বা অন্যভাবে নাটকে নন্দিনীর যে বর্ণনা পাই তার সঙ্গে কবিতাটিতে বর্ণিত নন্দিনীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য আছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

নন্দিনী চরিত্রে নারী সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নন্দিনী চরিত্রের সঙ্গে তার নামের কী সংগতি রয়েছে? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রঞ্জন অর্থাৎ যে সমস্ত কিছু রাঙিয়ে তুলছে, তার চরিত্রের সঙ্গেও তার নামের সংগতি রয়েছে। রঞ্জন ও নন্দিনীর নামের সঙ্গে তাদের চরিত্রের সংগতি দেখে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির মধ্যে একটি আনন্দের তত্ত্ব, শক্তিমান যৌবনের তত্ত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন। আনন্দ এবং তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই নাটকে আছে। কিন্তু এই তত্ত্বকথা বা জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তাটি শুধু তত্ত্ব হিসাবে নয় জীবনের রূপ হিসাবেও নাটকে এসেছে। অনেক সমালোচকের মতে এতে জীবনের রূপ নেই। তাই যেসব মানুষ এই নাটকে এসেছে তারা আসলে মানুষ নয় তত্ত্ব। নন্দিনী আনন্দের রূপক, রঞ্জন যৌবনের রূপক। সমালোচকরা বলেন নাটকটিতে কোনো পুরুষ বা নারীর কথা নয়— তত্ত্বের কথা আছে, তাই এর মধ্যে কোনো প্রাণস্পন্দন নেই। কিন্তু জীবনের পরিমণ্ডল রূপেও নাটকটি সার্থক। নন্দিনী, রঞ্জন ব্যক্তিগত মানুষ হয়েও শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে অর্থাৎ রঞ্জন বা নন্দিনী শুধু নয় তাদের মতো আরো অনেক রঞ্জন-নন্দিনী আছে। তারা একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। কিন্তু জীবনের যে অভিজ্ঞতার ছবি এই নাটকে আছে তাকে বাদ দিয়ে কেবল তত্ত্বকে দেখলে শুধু রক্তকরবী নয় সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কেই একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'রক্তকরবী' রূপক নয়। লেডি ম্যাকবেথকে যেভাবে বোঝা যায়, নন্দিনী বা 'রাজা'র সুদর্শনা প্রমুখকে সেভাবে বোঝা যায় না। বস্তুত গিরিশচন্দ্র প্রমুখদের নাটক যেভাবে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সেভাবে বোঝা যায় না। তাঁর নাটকে দুটি স্তর থাকে, —একটি স্তরে বাস্তবতা, আর দ্বিতীয় স্তরে সেই বাস্তবতার সম্প্রসারণ। বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা একসঙ্গে তাঁর নাটকগুলিতে রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাটক অন্য মানদণ্ডে বিচার্য। এবং তাই জীবনের বাস্তবতাকে জানা দরকার। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ তার এক চূড়ান্ত উপলব্ধির কথা শ্রীবিলাস ও দামিনীকে বলেছে। সে বলেছে যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরকে সে বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন পথে গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে তা শচীশের জানা ছিল না। এখন সে উপলব্ধি তার হয়েছে। ঈশ্বর কোনো রূপ বা সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য অরূপ থেকে রূপের মধ্যে আসেন। আর আমাদের রূপ থেকে অরূপের মধ্যে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। ঈশ্বর একজন শিল্পী, তিনিও সৃষ্টি করছেন। শিল্পী মাত্রেই জীবনবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। জীবনভাবনাটি হল একটি তত্ত্ব এবং শিল্পী একে প্রকাশ করার জন্য জীবনের রূপের মধ্যে তাকে ধরেন। শিল্পী যেহেতু জীবনভাবনা থেকে জীবনরূপে চলে আসেন তাই কোনো শিল্পীকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জীবনরূপ থেকে জীবনভাবনায়

যেতে হবে। 'রক্তকরবী'তে আমরা জীবনরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দেখতে চেয়েছি। এবং যক্ষপুরীর সমাজের রাজা এবং নন্দিনী ও রঞ্জনকেও জীবনরূপের সঙ্গে মিলিয়েই দেখা দরকার। এই অর্থেই তারা এক বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী সম্পর্কে বলেছেন 'মানবীর ছবি'। নন্দিনী কোনো রূপক নয়, বা নয় কোনো তত্ত্ব।

'রক্তকরবী' যে অন্য নাট্যকারদের নাটকগুলির মতো সাধারণ নয় তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন, তাই তিনি বলেছেন 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। নাটকে যে একটি বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেটি একদিকে ব্যক্তিগত, অপরদিকে শ্রেণিগত। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'আমার নাটকও একই কালের ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর।' এটিই হল নাটকটির দুটি স্তর। এই নাটকের রসগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি এই কথাটি মনে রাখা যায় যে এটি নন্দিনী বলে একটি মানবী এবং রঞ্জন বলে একটি মানবের ছবি, তাইলেই নাটকের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জীবনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"চারদিকের পীড়নের মধ্য দিয়া এই নন্দিনীর আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, নন্দিনী তেমনি করিয়াই যক্ষপুরীর পীড়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ চরিত্রটি যেন গ্যেটের—

The eternal womanly

That draw us above.

এ নারী মানুষকে বৈকুণ্ঠের দিকে লইয়া যায়। এমনি নারী প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ। এ-ধরনের নারী মানুষের ললাটে মহিমার রাজটীকা পরাইয়া দিবার জন্য আগাইয়া আসে। মাটি খুঁড়িয়া পাতালের মধ্যে যেখানে খনির ধন খোঁজা হয়, নন্দিনী সেখানকার নয়। মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণ ও প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেখানকার। তাহার পরনে 'ধানীরঙের কাপড়'। যেখানে নিষ্প্রাণ সোনার স্তূপ, সেখানে পৃথিবীর উপরিভাগের শ্যামশ্রী লইয়া তাহার আবির্ভাব। 'পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা তাহার সর্বাঙ্গে।' নন্দিনী সহজ-সুখের ও সহজ সৌন্দর্যের জগৎ হইতে যক্ষপুরীতে আসিয়াছে তাহার যাদুস্পর্শে জীবনের যত কিছু রুক্ষতা, হৃদয়হীন যান্ত্রিকতা দূর করিতে। যেখানে মানুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা হইতে সোনার সম্পদ ছিনাইয়া আনিতেছে, যেখানে নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টা, যে রাজ্য হইতে প্রাণের মাধুর্য নির্বাসিত, সেখানে জটিলতার জালে জড়িত হইয়া মানুষ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন, সেখানে হইয়াছে নন্দিনীর আবির্ভাব। ইহাতেই দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে প্রাণের বেগের সহিত নিষ্প্রাণ যন্ত্রের। প্রেমের সহিত হৃদয়হীন শোষণবৃত্তির। নন্দিনীর প্রাণবেগে নিষ্প্রাণ যক্ষপুরীতে জাগিয়াছে প্রাণের সাড়া। জড়তার মধ্যে সে একটা চাঞ্চল্য আনিয়াছে।"

[রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক : কনক বন্দ্যোপাধ্যায়]

৭.২.৩ রাজা

'রক্তকরবী' নাটকে মাটির তলার রাজ্য যে যক্ষপুরী তারই অধীশ্বর রাজা। রাজা চিরকালের রাষ্ট্রসত্তা, শোষণ তাঁর ধর্ম। ক্ষুধা, দ্বেষ আর হিংসার ছায়ায় তিনি লালিত। 'রক্তকরবী'র রাজার সহকারী শক্তিরূপে নাটকে এসেছে সর্দার, মোড়ল, গুপ্তচর ইত্যাদি চরিত্রসমূহ। রাজা বিজ্ঞানের বলদৃপ্ত শক্তি ও যান্ত্রিকতার প্রতীক। যক্ষপুরীর যান্ত্রিক জীবনে তিনি কেন্দ্রীয় শক্তি, সেখানকার যন্ত্রজীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাঁর ধারনা নন্দিনী যক্ষপুরীতে এসেছে সেখানকার যন্ত্রধর্মকে বিকল করার উদ্দেশ্যে। তাই নন্দিনীর প্রতি তিনি বিরূপ।

'রক্তকরবী' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ সত্যমূলক বলে অভিহিত করেছেন। এটি ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক সত্য নয়, এটি একটি গভীর সত্য, যা সময় বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই সত্যকে উপস্থাপিত করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে রাজাকে দেখিয়েছেন।

নাটকটির মধ্যে রাজার সঙ্গে নন্দিনীর কথোপকথনের তিনিটি স্তর আছে। এই তিনটি স্তরের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়েই রাজা চরিত্রটির সমস্যা ধরা পড়েছে। তাঁর সংলাপের প্রথম স্তরের কতকগুলো নাটকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। নন্দিনী রাজার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। কিন্তু রাজা প্রথমে বলেছেন তাঁর সময় নেই। পরে যখন নন্দিনী চলে যেতে চেয়েছে তখন রাজা একটি বিশেষ কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠে নন্দিনীকে যেতে দিতে চাননি। লক্ষণীয় যখনই রঞ্জনের প্রসঙ্গ ও তার সঙ্গে রাজার তুলনার প্রসঙ্গ আসে তখনই রাজা উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এর থেকে বোঝা যায় নন্দিনী রাজার মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যক্ষপুরীর ঐশ্বর্য লাভ করার পর রাজা হাত বাড়িয়েছেন নারীর দিকে, তাঁর সঙ্গ-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য। নন্দিনীর আগেও অনেক নারী রাজার জীবনে এসেছে, এটা বোঝা যায় যখন রাজা বলেন 'তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে...।' মরুভূমির এই স্বরূপ থেকে রাজা মুক্তি পেতে চান নন্দিনীরূপ 'ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে।' বহু নারীর পর এবার নন্দিনী এসেছে রাজার জীবনে। কিন্তু এবার একটি প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। রাজা হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পাচ্ছেন না। রাজার মধ্যে নন্দিনীকে লাভ করার একটি আকাঙক্ষা আছে। আবার রাজা যখন বলেন নন্দিনীকে ভেঙে চুরে ফেলবেন তখনই বোঝা যায়, এটি ভালোবাসার আকাঙক্ষা নয়, কেবলমাত্র পাবার আকাঙক্ষা। আগের নারীদেরও তিনি ভালোবাসেননি এবং তাদের মাধ্যমে তৃপ্ত হননি। এবারও নন্দিনীকে তিনি হাতের মুঠোয় পাচ্ছেন না কারণ সে ঐশ্বর্য ভয় বা শক্তির কাছে ধরা দেয় না, আবার সে অন্য নারীদের মতো সরেও থাকে না। বরং রাজার কাছে গিয়ে বন্ধুত্ব করতে চায়। ভয় বা লাভের সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে নন্দিনী রাজার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এক অর্থে নন্দিনী রাজাকে ভালোবাসে। পরে রাজা জানতে পারেন যে নন্দিনীর এক প্রেমিক আছে, যাকে ভালোবেসে সে এত পরিপূর্ণ। তখনই রাজার মধ্যে একটি সংকট ও ভালোবাসা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। রঞ্জন ও নন্দিনীর মিলিত জীবনের সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনিও

জীবনে অংশ গ্রহণ করতে চান; নন্দিনীর কাছে পৌঁছতে চান। নন্দিনী ও রঞ্জন পরস্পরকে ভালোবেসে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, আর রাজা নন্দিনীকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু কাকে বলে ভালোবাসা তা তিনি জানেন না, এটাই তাঁর সংকট। কেবলমাত্র সম্পদের লাভ-ক্ষতি ছাড়া তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু সমস্ত কিছু অর্জন করার পরও তিনি দেখলেন যে আসলে সবই ফাঁকা। রাজা এমন একজন মানুষ যিনি বাইরে শক্তিশালী, কিন্তু ভেতরে রয়েছে তাঁর অসীম শূন্যতা। এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Hollow man'-এ বলেছেন সমাজের মানুষদের বাইরে থেকে যেমনই দেখাক তারা আসলে ফাঁকা। মানুষের ভেতরের এই যে যন্ত্রণা এটাই রাজার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে রাজা আস্ফালন ও গর্জন করেন কিন্তু তাঁর অন্তরে একটি শূন্যতা আছে যাকে পূর্ণ করার জন্যই তিনি মানসিক দোসর খুঁজেছেন। রাজার ধারণা নারীর হৃদয়টিও তত্ত্ব-সম্পদের মতো একটি অর্জনসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু হৃদয় অর্জনসাধ্য বস্তু নয়।

এই নাটকে রাজার মূল সমস্যাটি হচ্ছে তাঁর অহংকেন্দ্রিক সমস্যা। অপরের দুঃখ জানার অবস্থা তাঁর নেই। এই ব্যক্তি যখন ভালোবাসার কথা ভাবছেন তখনও কিন্তু নন্দিনীকে তিনি যথার্থভাবে ভালোবাসছেন না। তখনও তিনি নিজেকেই সুখী করবার চেষ্টা করছেন, তাই নন্দিনীকে বলেছেন, 'আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙুচুরে ফেলতে চাই।' অর্থাৎ নন্দিনীকে না পেলে তিনি তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এই সংলাপে রাজার অধিকার বিস্তারের মানসিকতাই ফুটে উঠেছে। রাজার এই সংলাপে একই সঙ্গে ফুটে ওঠে একটি আকুলতা ও তীব্র ঈর্ষা। রাজা রঞ্জনকে দেখেননি কিন্তু যে রঞ্জন নন্দিনীকে এত আচ্ছন্ন করে আছে তার থেকে দূরে থেকেও নন্দিনী কী করে এত আনন্দে আছে এটাই রাজার প্রশ্ন। তার মনে প্রায় একটি বালকোচিত আকুলতার সৃষ্টি হয়েছে। নন্দিনী রঞ্জনের মতোই রাজাকেও ভালোবাসে কি না এটাই রাজা জানতে চান। রঞ্জন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এটাই কিন্তু রাজার ভালোবাসার প্রথম সূত্রপাত।

রাজা ও নন্দিনীর দ্বিতীয় অংশের সংলাপের সঙ্গে প্রথম অংশের সংলাপের সাদৃশ্য আছে। এখানেও রাজা নন্দিনীকে ভেতরে যেতে দিতে প্রস্তুত নন। এখানেও রাজা তাঁর শ্রান্তি, ক্লান্তি ও সঙ্গীহীনতার কথা বলেছেন। এখানেও রয়েছে তাঁর সঙ্গীহীনতার দুঃখ। রাজা বলেছেন 'তুমি জান না আমি কত শ্রান্ত।' নন্দিনীর কাছে তিনি কাতরভাবে সময় ভিক্ষা করেছেন। রাজার সংলাপে দুটি বিপরীত ছবি মাঝে মাঝেই ভেসে উঠেছে। এই বৈপরীত্য এবার তীব্র হয়েছে। শূন্যতার বেদনা ও আক্রমণের উত্তেজনাও এখানে প্রকট। রঞ্জনের প্রতি রাজার ঈর্ষা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে অপর একজনকে নন্দিনীর পাশে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। নন্দিনীর ওপর তাঁর প্রভুত্ব এতদূর বেড়েছে যে নন্দিনীর যে কোনো সঙ্গীকেই রাজা সরিয়ে দিতে চান। রঞ্জনকেও ধুলোয় মিশিয়ে দেবার ভয় তিনি দেখিয়েছেন। নন্দিনীও উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এর আগে রাজার সঙ্গে কথোপকথনের সময় নন্দিনীকে এতটা আক্রমণাত্মক দেখা যায়নি। এখানে আগের অনুভূতিগুলি তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও একটি বড়ো ব্যাপার এই যে রাজার চরিত্রের পরিবর্তনের একটি আভাস এখানে পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে

একটি মৃত ব্যাঙের উল্লেখে। সেই ব্যাঙের কাছ থেকে রাজা টিকে থাকার রহস্য শিখছিলেন। ব্যাঙটি জানে কীভাবে টিকে থাকতে হয়। সেই ব্যাঙটিকে মেরে রাজা তাকে বাঁচালেন অর্থাৎ টিকে থাকা আর বেচে থাকার মধ্যের পার্থক্যটি রাজা বুঝতে পারছেন। নিরন্তর টিকে থাকা থেকে ব্যাঙটিকে মুক্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকুলভাবে নন্দিনীকে প্রশ্ন করেছেন যে এটি কি একটি ভালো খবর নয়।

আধুনিক সভ্যতার জীবনযাপনের ধরনটিও যক্ষপুরীর মতো হয়ে গেছে। বর্তমান সমাজে বেঁচে থাকার যে প্রক্রিয়াটি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আত্মিকতার কোনো মর্যাদা নেই। ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত সুখ চরিতার্থতার চেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা মানুষকে কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে অতিক্রম করতে শিখিয়েছেন। শারীরিক অর্থে বেঁচে থাকাটা হল টিকে থাকা। মানসিকভাবে বেঁচে থাকাটাই যথার্থ বেঁচে থাকা। আমরা যাকে জীবন বলি তার দুটো ভাগ আছে। একটি হল কোনোভাবে অহং-এর সাহায্যে গণ্ডিবদ্ধভাবে জীবিত থাকা আর অপরটি হল অহংমুক্ত যথার্থ জীবন। যক্ষপুরীর রাজাও তাঁর চারদিকে টিকে থাকার আদর্শই তৈরি করেছিলেন। তার ফলে সেখানকার শ্রমিকরা পর্যন্ত সংখ্যানামে পরিচিত ছিল। রাজা যখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে টিকে থাকাটাই জীবনের শেষ কথা নয়, তখনই যক্ষপুরীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটবে। রাজার কাছে টিকে থাকাটাই যেখানে ছিল জীবনের আদর্শ সেই রাজাই এখন নন্দিনীকে বলেছেন ব্যাঙটি টিকে থাকতে জানে বেঁচে থাকতে নয়। অর্থাৎ রাজা এবার জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এটিই রাজার মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যেভাবে তিনি বেঁচে আছেন তাকে বেঁচে থাকা বলে না। এই টিকে থাকার আকাঙক্ষাকে ধ্বংস করাকে দ্যোতিত করেছে ব্যাঙের মৃত্যু। তাই এটি তাৎপর্যময়। এবং এই খবরটি নন্দিনীর কাছে সুখের, কারণ সে দেখেছে রাজা একটি সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে আছেন। রাজা তা বুঝতে পেরেছেন বলেই আকুল আগ্রহ নিয়ে নন্দিনীর সহমর্মিতা পেতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই নন্দিনী রঞ্জনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজার অন্তরে আক্রোশের সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে রাজার সম্পূর্ণ মুক্তি হয়নি। কেবল মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাজা ঘুমোন না, গানও শুনতে চান না। যারা টিকে থাকে তারা নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। তাই রাজাও কোনো মাধুর্যের সামনে দাঁড়াতে পারেন না।

অধ্যাপকের কথোপকথনেও রাজার সংবাদ পাওয়া যায়। রাজাকে বস্তুবাগীশ প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায় সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। যিনি কেবল সোনা জমিয়ে চলেছেন সেই রাজার মনে আজ এই নতুন প্রশ্নের উদয় হয়েছে। প্রাণ বস্তুটি নিয়ে তাঁর কোনো সমস্যা ছিল না। প্রাণের উপর যাঁর দরদ নেই তিনি যে এই প্রশ্ন করেছেন তার কারণ হল একটি সহজ মেয়ের রহস্যকে রাজা জয় করতে পারছেন না। তিনি বুঝতে পারছেন না সে এত জোর কোথা থেকে পায়। তখন তিনি বুঝতে পারছেন যে বিদ্যাবিশ্লেষণ দিয়ে যতটুকু জানা যায় তার বাইরেও একটি জগৎ আছে। রাজা যখন প্রাণপুরুষের সন্ধান নিয়েছেন তখন তাঁর মুক্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপের সূচনা হয়েছে।

নন্দিনীর সঙ্গে রাজার তৃতীয় স্তরের কথোপকথনে রঞ্জন প্রসঙ্গে রাজার কথায় একটি নতুন সুরের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম কথোপকথনে রঞ্জন সম্পর্কে রাজার ছিল একটি কৌতূহল। দ্বিতীয় স্তরে কৌতূহলের পরিবর্তে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। কিন্তু তখনো রাজার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যে যখন রঞ্জন আসবে তখন তিনি নন্দিনী ও রঞ্জনকে একসঙ্গে বসিয়ে দেখবেন। যদিও তা দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষ স্তরে দেখা যায় রাজার আর কোনো আক্রোশ নেই। এবার তিনি নন্দিনীকে তাঁর সামনে থেকে সরাতে চাইছেন এবং সর্দারকে বলছেন রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর যেন মিল হয়। আগে দেখা গেছে সমস্তকিছুকে যক্ষপুরীতে খণ্ড খণ্ড করে আনা হত, নন্দিনীকেও টুকরো করে আনা হয়েছে। কিন্তু এবার রাজা তাকে রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইছেন। এ থেকে বোঝা যায় এতদিনে রাজা নন্দিনীকে যথার্থভাবে ভালোবেসেছেন, নন্দিনীর প্রতি এখন আর তাঁর মোহ নেই। নন্দিনী রঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণ হোক এটাই রাজা কামনা করছেন। নন্দিনীর মঙ্গল হোক, তাদের মিলন হোক এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুক্তি ঘটল। তাঁর সামনের জাল ভেঙে গেল এবং তিনিও একজন পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠলেন।

নাটকের শেষে দেখা যায় রাজার ঘরের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে, শুধু বাইরের নয়, —তাঁর অন্তরের দ্বারও খুলে গেছে। কিন্তু যে সমাজতন্ত্র তিনি তৈরি করেছিলেন তারই একটি অংশ হল সর্দার যাকে রাজা নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের মিলন ঘটিয়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু রাজার অজ্ঞাতসারে তাঁরই হাতে রঞ্জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং সর্দারের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি তা করেছেন। অর্থাৎ রাজার নিজের যন্ত্র তাঁকে মানেনি। তাঁদেরই সৃষ্ট যন্ত্র ক্রমশ উন্নত হয়ে এখন সমস্তকিছুকে অধিকার করেছে। অর্থাৎ যন্ত্রকে মানুষ নয়, যন্ত্র মানুষকে পরিচালিত করছে। কিন্তু এই বোধ শুধু জাগলেই হবে না, যে নষ্টসমাজ চারদিক থেকে জীবনকে ঘিরে ধরেছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। এই সংগ্রামকে নাটকে ফাগুলালদের সংগ্রাম হিসাবে দেখা যায়। সেই সংগ্রামে রাজাও যোগ দিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন মুক্তি পেতে হলে নিজের সৃষ্ট যন্ত্রের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। অর্থাৎ একদিক থেকে তা নিজের সঙ্গে নিজেরই লড়াই। এই লড়াইয়ের মাধ্যমেই রাজা নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন। এই মুক্তি একদিকে যেমন রাজার ব্যক্তিগত মুক্তি, অপরদিকে তেমনি তা সমাজেরও মুক্তি। সমাজের মুক্তির সম্ভাবনাটির ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি শেষ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধপরবর্তী সমগ্র বিশ্বের একটি ছবি এই নাটকে দেখিয়েছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে আধুনিক সমাজের একটি ছবি দেখা গেছে। সমস্ত মানুষই এই সমাজে খণ্ড খণ্ড বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে।

'রক্তকরবী'র শেষে দেখি ফাগুলাল প্রভৃতি শ্রমিকরা হাতিয়ার নিয়ে যন্ত্রের সেই সর্দারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেছে। তাদের সঙ্গী হয়েছেন অধ্যাপক ও সাধারণ মেয়ে নন্দিনী এবং নিজেকে মুক্ত করে রাজাও এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি বৈপ্লবিক ইঙ্গিত আছে। বহু সমালোচকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে জটিল আধ্যাত্মিক কথা বলেছেন। কিন্তু আসলে রবীন্দ্রনাথ কোনো মতবাদ চাপিয়ে দেননি।

তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, 'আমার পালায় একটি রাজা আছে। ...আমার পালার রাজা-যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে।' এখানে কবি বলেই দিয়েছেন যে— '...কলিযুগের রাক্ষসদের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে', —অর্থাৎ নির্যাতিত শ্রমিকরা যে জেগে উঠবে এখানে তার একটি আভাস আছে।

'রক্তকরবী'র আগের নাটক 'মুক্তধারা'য় জাতীয়তাবাদ যে পৃথিবীতে কী সংকট সৃষ্টি করেছে তার কথা বলা হয়েছে। সেই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের যে একটি পরিবর্তন ঘটবে সেই স্বপ্ন কবি দেখেছেন 'রক্তকরবী'তে। তার পরবর্তী নাটক 'কালের যাত্রা'য় এই স্বপ্ন আরো স্পষ্ট হয়েছে। সেখানে দেখি একটি রথ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের চেষ্টায় চলল না। অবশেষে শূদ্ররা রথটিকে সচল করল। এইভাবে পরপর তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের সংকট ও তার থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। এন্ড্রুজের কাছে লেখা চিটিপত্রেও তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটের কথা বলেছেন এবং মনে করেছেন চূড়ান্ত বিকাশের অবস্থায় একদিন এর পতন ঘটবে। 'রক্তকরবী'তেও এই ইঙ্গিত রয়েছে যে চূড়ান্ত বিকাশের সময়ই পতনের মুহূর্ত তৈরি হয়।

রাজার সমস্যাকে এই সমাজের একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা যায়। প্রথম থেকেই কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। শ্রমিকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু পরে দেখা যায়, শুধু এটি নয়, আর-একটি ষড়যন্ত্রও আছে। যেখানে বড়ো সর্দার মেজ ও ছোটো সর্দারদের সঙ্গে রাজাকে ভুলিয়ে রাখার পরিকল্পনা করছে। সেই সর্দার পরে রাজার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছে এর মধে সমাজের ওপরওয়ালাদের ভেতরের একটি আত্মবিরোধের ইঙ্গিতও রয়েছে। এই বিরোধ সম্পূর্ণ হয় যদি নীচ থেকে একটু ধাক্কা দেওয়া যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সমাজটিই নিজের বিরুদ্ধে নিজে কাজ করছে। রাজার ভেতরে যে ব্যক্তিগত রাজা প্রচ্ছন্ন আছেন, তিনি ভালোবাসতে চান, সঙ্গীহীনতার দুঃখ বোঝেন বা দুর্বল ঘাসের দিকে হাত বাড়ান। এটি রাজার ভেতরের একটি গোপন সত্তা। কিন্তু এটি প্রকাশিত হতে পারছে না। তাকে প্রকাশিত হতে বাধা দিচ্ছে সেই সত্তাটি যে কেবল ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য ও জড় প্রকৃতিকে বোঝে, টিকে থাকতে চায়। এটি রাজার সেই সত্তাকে চাপা দিচ্ছে যিনি ভালোবাসতে চান, তাই রাজার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলছে। অবশেষে সেই সত্তাই জয়লাভ করল যে ভালোবাসতে চায়। এখানে রাজা নিজেই নিজেকে মেরেছেন। তাঁর নেতিবাচক সত্তাকে ধ্বংস করেছে ইতিবাচক ধ্রুব সত্তা। প্রত্যেকের মধ্যেই দুটি সত্তা থাকে, —একটি শুভ, অপরটি অশুভ। প্রবৃত্তির দিক বা জৈবিকতার সঙ্গে মানবিকতার একটি দ্বন্দ্ব থাকে, এই দ্বন্দ্বটিই রাজার মধ্যে দেখা যায়। জৈবিকতার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজার মুক্তি ঘটল। সমাজের একটি শুভ দিক থাকে, সেই শুভ দিক জয়ী হয়ে সমাজকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। একেই রবীন্দ্রনাথ একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।' বিভীষণ রাবণের সহোদর ভাই। কোথায় আঘাত করলে রাবণের মৃত্যু হবে বিভীষণই সেই তথ্য রামকে প্রদান করেছিল। সুতরাং

বলা যায় রাম নয়, বিভীষণই রাবণকে মেরেছে। এবং যেহেতু তারা সহোদর ভাই তাই বলা যায় রাবণ নিজেই নিজেকে মেরেছে। 'রক্তকরবী'তেও একথাই বলা হয়েছে। বিভীষণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এবং রাবণ অশুভ বুদ্ধির প্রতিভূ। ফলে অশুভের বিরুদ্ধে শুভর লড়াইটি হল রাবণের সঙ্গে বিভীষণের লড়াই। এটির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ রাজার ভেতরের দ্বন্দ্বকে বুঝিয়েছেন। নাটকে এই দ্বন্দ্বটি দুটি স্তরে এসেছে। একটি রাজার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব আর একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব। এরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজের মুক্তির কথা বলেছেন, শুভশক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, —এটিই 'রক্তকরবী'র রাজা-চরিত্র এবং একইসঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তুরও মূল কথা।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'রক্তকরবী'র রাজার প্রসঙ্গে মৃত ব্যাঙের উপমাটি কেন প্রযুক্ত হয়েছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রাজাকে কেন একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"রঞ্জন যৌবনের প্রতীক। যৌবনের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যৌবনের স্বরূপ হইল অফুরন্ত শক্তি ও সাহস, ছন্দায়িত গতিবেগ, আনন্দে সর্বব্যাপী অনুভূতি— সৌন্দর্য, প্রেম ও কল্যাণের বিশুদ্ধ উপলব্ধি। এই যৌবন কেবল বয়সের যৌবন নয়— ইহা মনের ও হৃদয়ের যৌবন। এই যৌবন অন্তরাত্মার চিরসম্পদ— প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক্ষেত্র। ইহাই মানুষের দেব-অংশে নিত্যস্বভাব। অপাপবিদ্ধ, অহংমুক্ত মানুষের ইহাই বিশুদ্ধ সত্তা। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার মধ্যেও এই যৌবনকে দেখা গিয়াছে। রঞ্জনের মৃত্যুতে তাই রাজা আক্ষেপ করে— 'আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমার

সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।' রাজার মধ্যেও এই নিত্য যৌবন আছে, ইহাই তাহার বিশুদ্ধ সত্তা; কিন্তু তাহার ঘোরতর যান্ত্রিক নিয়ম-ব্যবহার দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ—মৃত। রাজার জীবনে তাহার প্রকাশ নাই—সে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না; অথচ হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উহার স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করিতেছে। উহাই রাজার চিত্ত-দ্বন্দ্বের কারণ।"

[রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য]

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি' —বিশ্লেষণ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) রাজা চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান আলোচনার শেষে এর সারসংক্ষেপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে এই অধ্যায়ে আমরা রঞ্জন, নন্দিনী ও রাজা এই চরিত্রত্রয়ের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছি। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে 'রক্তকরবী' নাটকে তিন ধরনের চরিত্রনাম ব্যবহৃত হয়েছে। একশ্রেণির নামের মধ্যে তাদের ব্যক্তিপরিচয় নেই, জীবিকার দ্বারাই তারা পরিচিত। আরেকটি শ্রেণির ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিনাম থাকলেও তারা সংখ্যার দ্বারা পরিচিত। অন্য আরেকটি শ্রেণির নামের মধ্যে জীবিকা বা সংখ্যার ব্যাপার নেই, তারা ব্যক্তিনামেই পরিচিত।

রঞ্জন চরিত্রের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে রঞ্জন যৌবনের দূত। যৌবনের আবেগ, শক্তি, সাহস, আনন্দ সমস্তই তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরজিত। সে মুক্তিসাধনার আদর্শ— দুঃখ, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তার অবস্থান। সে নন্দিনীর প্রণয়ী, সে নন্দিনীর পরিপূরকও বটে। রঞ্জন ও নন্দিনী চরিত্রদ্বয়ের সঙ্গে রাজার চরিত্রের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে রাজার ক্রমবিবর্তনের ছবিটি নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। রঞ্জন চঞ্চল, দুর্বার। সে যক্ষপুরীর কাজের মধ্যে গান ও ছন্দ নিয়ে এসেছে।

রঞ্জনকে নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। কিন্তু নাট্যদৃশ্যে সশরীরে উপস্থিত না হলেও বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে যক্ষপুরীর জীবনের সঙ্গে রঞ্জনের স্বভাবের বৈপরীত্যের ছবিটি ধরা পড়েছে এবং এইভাবেই রঞ্জন নাট্যঘটনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছে। রঞ্জনের আগমনের প্রত্যাশা এবং আশঙ্কায় নাটকের প্রতিটি চরিত্র দোলায়িত হয়েছে। নাটকের শেষে রঞ্জনের মৃত্যুতে তার যৌবন রাজার মধ্যে যেন সঞ্চারিত

হয়ে গেছে। রঞ্জনের মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রাজাকে জাগিয়েছে এবং রঞ্জনের মৃত্যুতেই নন্দিনী শক্তির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নন্দিনী চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নন্দিনীই নাটকের মূল গ্রন্থি। তার আবির্ভাবে যান্ত্রিকতা ও নিষ্প্রাণতার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ জেগেছে, সজীবতার স্পন্দন অনুভূত হয়েছে। নন্দিনী চরিত্রটি নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি তাত্ত্বিক মতাদর্শকে পরিস্ফুট করেছে। আনন্দহীন যক্ষপুরীর জীবনে প্রাণস্ফূর্তি, ছন্দ ও মুক্তির আনন্দ সে নিয়ে এসেছে। তার প্রভাব থেকে অধ্যাপক বিশু ফাগুলাল কেউই মুক্ত নয়। যক্ষরাজের নীরন্ধ্র সংস্কার ও মোহাচ্ছন্ন হৃদয়েও নন্দিনী প্রাণের আবেগ পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। নন্দিনী রাজাকে তাঁর লোভ ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছে, নন্দিনীর হাতে হাত রেখেই নাটকের শেষে রাজা নতুন পথে যক্ষপুরীর অধীশ্বর। শোষণ তাঁর ধর্ম। তাঁর মধ্যে কেবল জোরটাই রয়েছে, প্রেম বা সৌন্দর্যবোধ নেই। তাঁর শক্তি যন্ত্রের শক্তি। তিনি যে বস্তুস্তূপ জড়ো করেছেন তার মধ্যে রয়েছে এক হাহাকার মিশ্রিত শূন্যতা। এই শূন্যতার সঙ্গে নন্দিনীর মাধুর্যের এক বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। নন্দিনী রাজার মধ্যে আলোড়ন তৈরি করেছে। নাটকে রাজা চরিত্রের একটি ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন। নাটকের শেষে রঞ্জনের মৃত্যুতে এবং নন্দিনীর মাধুর্যের স্পর্শে ও সহায়তায় রাজা নিজের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ত্যাগ করে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছেন।

৭.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) : বিখ্যাত জার্মান কবি ও নাট্যকার। তিনি প্রথম জীবনে চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্য ও নানা জটিল বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'ফাউস্ট' রচনা করতে শুরু করেন। কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করে তিনি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। গোল্ডস্মিথের Deserted Village তিনি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

৭.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Summing Up)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

৭.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

প্রসঙ্গ-পুস্তকের তালিকা একাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ-৮

রক্তকরবী

রক্তকরবী-এর চরিত্রমালা ২ : বিশু, কিশোর ও অধ্যাপক

বিষয় বিন্যাস

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ চরিত্রবিচার

- ৮.২.১ বিশু
- ৮.২.২ কিশোর
- ৮.২.৩ অধ্যাপক

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৮.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৮.০ ভূমিকা (**Introduction**)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী। তার প্রাণবেগে নাটকের সমস্ত ঘটনা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অভ্যস্ত পথে স্তিমিত বেগে চলা যক্ষপুরীতে নন্দিনীর প্রাণ-প্রবাহের আবির্ভাব ঘটায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছে। যক্ষপুরীর জীবনে নন্দিনী বেমানান। তাই অন্যান্য চরিত্রগুলির কেউবা তাকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে আবার কেউবা তাকে একটা দুর্যোগ মনে করে যক্ষপুরী থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছে। বস্তুত নাটকটির নাট্যঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নাটকের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই নন্দিনীর দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে, অনেকটা নিয়ন্ত্রিতও হয়েছে। নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্র নন্দিনীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। তাই নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও নন্দিনী চরিত্রটির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করে, নন্দিনীর আবির্ভাবের পটভূমিকায় সেই সমস্ত চরিত্রের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখলেই চরিত্রগুলির মূল তাৎপর্য ও নাট্যঘটনার সঙ্গে তারা কী সূত্রে অন্বিত তা অনুধাবন করা যাবে। নন্দিনীর আগমনে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে অভাবিত প্রতিক্রিয়া জন্মেছে তা লক্ষ করলেই তাদের মানসিক গতিবিধি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠব। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য চরিত্রত্রয়ও এর ব্যতিক্রম নয়।

নন্দিনী প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে নন্দিনী প্রেম-প্রাণ-গান-সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক নিশ্চয়, কিন্তু প্রথমাবধিই তাকে পূর্ণরূপে নাটকে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। বিভিন্ন স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়ে সে নাটকের শেষ স্তরে এসে পূর্ণতা অর্জন করেছে। এই পূর্ণতা অর্জনের কাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্র সহায়ক হয়েছে। অন্যকে সৌন্দর্যের দিকে সে যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি নিজেকেও সে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে। নিজেকে এবং অপরকে বিবর্তিত করাই নাটকে নন্দিনীর কাজ। আমাদের আলোচ্য বিশু, কিশোর, অধ্যাপক চরিত্র তিনটিও নন্দিনীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত বলা যায় নন্দিনীর পূর্ণতা অর্জনের ধারাবাহিকতায় বিশু ও কিশোর চরিত্রদ্বয় দুটি বিশেষ অধ্যায় সূচিত করেছে। অধ্যাপকও নন্দিনীর এই যাত্রাপথে এক বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

তৃতীয় অধ্যায়ের চরিত্রমালার আলোচনা শেষ করার পর এবারে আসুন চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। এই পর্বে আমাদের আলোচ্য 'রক্তকরবী' নাটকের আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— বিশু, কিশোর ও অধ্যাপক। এই চরিত্রত্রয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে—

- আপনারা চরিত্র তিনতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে পারবেন।
- নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে এই তিনটি চরিত্র কী সূত্রে অন্বিত তা জানতে পারবেন।
- চরিত্রত্রয়ের তাৎপর্য ও নাট্যোপযোগিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৮.২ চরিত্রবিচার

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য তিনটি চরিত্র— বিশু, বিশোর ও অধ্যাপক। বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকাংশের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তিনটি চরিত্রই অনেকাংশে নন্দিনীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আবার এই তিনজনই নন্দিনীর ওপর কমবেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে রেখে এবারে আসুন চরিত্রগুলি এক এক করে বিশ্লেষণ করা যাক।

৮.২.১ বিশু

'রক্তকরবী' নাটকের বিশু চরিত্রটি যেন গ্রিক নাটকের কোরাস চরিত্রের মতো। নাট্যকারের ভাব-ধারণা, চিন্তা-চেতনা কোরাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কোরাস চরিত্র

গান গায়, উপদেশ দেয়, নাটকের ভাববস্তু মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করে— বিশুও সেই ধরনেরই একটি চরিত্র। বিশু সত্যদ্রষ্টা। সে অনেকাংশে নাট্যকারের প্রতিনিধি স্বরূপ। সে সমালোচক, রঙ্গরসের আবরণে কৃত্রিমতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ সে করেছে। তার সংলাপে যক্ষপুরীর নীরন্ধ্র অন্ধকারময় জীবনের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। নন্দিনীর স্বরূপও তার উক্তির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। নন্দিনী ও বিশু দুজনেই মুক্তির সাধনা করেছে। বিশুর মুক্তিসাধনা দুঃখসাধনার রূপকে আত্মপ্রকাশ করেছে। কঠোর দুঃখের মধ্য দিয়ে বেদনার সমুদ্র অতিক্রম করে সে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। দুঃখের মধ্যে সে লাভ করেছে অসীমকে।

বিশুর নামের পেছনে একটি চিরন্তন বিশেষণ লাগানো হয়েছে— 'পাগল'। বিশু ঠাকুরদাদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি চরিত্রের সমশ্রেণির। এঁরা জ্ঞানী, আনন্দ-প্রাণ, তত্ত্বজ্ঞ, মুক্তিপুরুষ— অন্যের মুক্তিসাধনাই এঁদের কাজ।

বিশুর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানা যায় যে একটি নারীর প্রতি প্রেমই তাকে যক্ষপুরীতে টেনে এনেছে। সেই নারীর স্বর্ণলোভ চরিতার্থ করার জন্য সে যক্ষপুরীতে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তির কাজে বিরক্ত হয়ে সে যখন কর্মত্যাগ করল তখন সেই নারীও তাকে ত্যাগ করে গেল। নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে দেখে সে মুক্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। বিশু নন্দিনীকে বলে 'ঘুমভাঙানিয়া', 'দুখজাগানিয়া', 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। কারণ নন্দিনীই তার মধ্যে জীবনের বৃহত্তর স্বরূপের জন্য আকাঙক্ষা জাগিয়েছে।

বিশু যতক্ষণ ফাগুলাল ও চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে ততক্ষণ তার ব্যক্তিগত জীবনের খবর জানা যায় না। কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে আলাপের সময়ই তার কথার সুর পালটে যায়। বিশু ও নন্দিনীর প্রথম সংলাপেই দেখা যায় তাদের কথার ভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ আছে। দুইজনই আগ্রহের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু বিশুর কথার মধ্যে কখনো কখনো একটি ক্লান্তির সুর থাকে। যখন সে নন্দিনীকে বলে 'আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব' —তখন এখানে বিশুর গোপন বেদনার একটি খবর পাওয়া যায়। নন্দিনী যখন বিশুকে বলে 'কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি'। তখন এই বাক্যের 'তাই' শব্দটি যেন বিশুকে অন্য এক মাত্রা দান করে। নন্দিনী বলে 'তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।' এটি হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সান্নিধ্যের একটি Form, যেখানে কোনো দীনতা নেই। যার অন্তরে কোনো দীনতা নেই তার পাশে এসে দাঁড়ালে নিজেকেও বড়ো মনে হয়। আমরা অধিকাংশ সময়ে দীন হয়ে থাকি কিন্তু যখন কোনো ক্লেদহীন মানুষের সামনে এসে দাঁড়াই তখন আমরাও মুক্তি পাই। এই কথাই নন্দিনী বলেছে যে, বিশুর কাছে এসে দাঁড়ালে সে একটি বাইরের জগৎকে দেখতে পায়। বিশুর চারপাশে কোনো আড়ষ্টতা নেই। নন্দিনী যখন বিশুর কাছে আসে তখন বিশুর নিজেকে অনেক বড়ো মনে হয়। বস্তুত এটিই হচ্ছে পারস্পরিক সান্নিধ্যের আনন্দ। বিশুর মনে একটা আত্মপ্রত্যয় জেগেছে। বিশু একটা ব্রত নিয়ে আছে এবং সেই ব্রতকে উৎসাহ ও সাহস দিচ্ছে নন্দিনী। নন্দিনী যে বিশুর মধ্যে

একটা আলো দেখছে এখবরই বিশুকে প্রেরণা দেয়। অর্থাৎ তারা পরস্পর পরস্পরের প্রেরণা। এভাবে তাদের মধ্যে একটি সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আবার একদিকে বিশুর সাহচর্যে নন্দিনী তার মধ্যে আলো দেখতে পায়, অন্যদিকে বিশুর মধ্যে একটা ক্লান্তি ও দুঃখের ভাব রয়েছে। এর মূল অনুসন্ধানে দেখা যায় যে নন্দিনী ও বিশুর কথোপকথনের সময় নন্দিনী বিশুকে বলেছে যে এই যক্ষপুরীতে কেবল তার আর বিশুর মাঝখানেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বিশুর বক্তব্য— সেই আকাশ আছে বলেই সে নন্দিনীকে গান শোনাতে পারে। বিশুর গানের পরা নন্দিনী বিশুকে বলেছে 'যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি'। বিশুর কথাবার্তা থেকে নন্দিনী বুঝেছে যে বিশুর মধ্যে কোনা একটা ক্লান্তি ও দুঃখের রেশ রয়েছে। কিন্তু নন্দিনী দুঃখের কথা আগে শোনেনি। রঞ্জনের কাছ থেকে দুঃখের কথা আগে কখনো শুনেছে কিনা বিশুর এই প্রশ্নের উত্তরে নন্দিনী যা বলেছে তাতে জানা যায় যে সে রঞ্জনের কাছ থেকে জীবনের দুঃখের দিকের কোনো পরিচয় পায়নি; এরপর রঞ্জনের কথা প্রসঙ্গে নন্দিনী তার গ্রামের স্মৃতিতে চলে গেছে, যেখানে রঞ্জন তাকে জয় করে নিয়েছিল। নন্দিনীর চারপাশে আরো অনেকে ছিল, যাদের মধ্যে ছিল বিশুও, এদের মধ্য থেকেই রঞ্জন তাকে জয় করে নিয়েছে। এই কথাটি মনে পড়ায় নন্দিনী বিশুকে বলেছে— "একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে। কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তারপর কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।" এখানে অনেক দিনের পুরোনো প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা এতদিন তারা ভুলে ছিল। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বিশু এড়িয়ে যায়নি। গানের মাধ্যমে বিশু উত্তর দিয়েছে। বিশু গায়— 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে'। বিশু যেন দুঃখের প্রান্তরে পৌঁছে গেছে। সে যখন গায়— 'আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে'। তখন নন্দিনী তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে এবং যে অস্ফুট কথা বিশুর মনে চাপা পড়েছিল গানের সঙ্গে সঙ্গে তাও স্পষ্ট হয়েছে। বিশু অজানা কোনো জগতে গিয়েছিল। সেই অচেনার ঘাট থেকে যক্ষপুরীতে কেউ তাকে টেনে এনেছে। তখনই বিশুর জীবনের গল্প শোনা যায়। একটি মেয়ে তাকে এখানে টেনে এনেছে। এখানে যে বিশুকে আমরা পাই সেই বিশুর জীবনে একটি সময় ছিল যখন সে চরিত্রচ্যুত হয়েছিল, তার জীবনের আদর্শ থেকে দূরবর্তী হয়েছিল। লাভ-ক্ষতি-হিসাবের জগতে একটি মেয়ে তাকে টেনে এনেছে— সঞ্চয়ের, দৈনন্দিন গ্লানির জগতে নিয়ে এসেছে। নন্দিনী প্রশ্ন করেছে কে সেই মেয়ে। বিশু বলেছে— 'তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়'। তৃষ্ণার জল হল নন্দিনী। সে আশার অতীত বলে বিশু সরে গেছে। তখন মরীচিকা অর্থাৎ অন্য একটি নারী এসে বিশুকে ভুলিয়েছে। বিশুর ছিল কল্পনার স্বপ্ন আর এই মেয়েটির ছিল সোনার স্বপ্ন, সে দেখেছে সোনার চূড়া। সেই মেয়ে বিশুকে সোনার চূড়ায় নিয়ে যেতে বলেছে। এভাবেই সেই নারীর মাধ্যমে বিশু আত্মধ্বংসের পথে গিয়েছিল। সে যে এক সময় যক্ষপুরীতে সর্দারের কাজ নিজে এসেছিল তা ফাগুলাল-চন্দ্রাদের কথা

থেকে জানা যায়। সে ছিল গুপ্তচর।

যক্ষপুরীতে বর্তমান সমাজের একটি ছবি আছে। সর্দারদের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের ছবিটি পাওয়া যায়। তেমনি অধ্যাপক, মোড়ল সবার দ্বারাই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ছবি ফুটে উঠেছে। তেমনি একটি স্তর হল গুপ্তচরদের যার সর্দার ছিল বিশু। সে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল। কিন্তু একদিন তার ঘোর ভাঙে এবং সে নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে শ্রমিক হয়ে যায়। সবাইকে সে এখন মুক্ত করতে চায়।

'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে'— এই গানটিকেও আগের গান ও সংলাপের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই গানের আগের সংলাপে বিশু নন্দিনীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। নন্দিনী বুঝতে পারে বিশুর ব্যথা কোথায়। এরপর বিশু যখন নিজের কাজে যেতে চেয়েছে তখন নন্দিনী তার কাছে পথ চাওয়ার গান শুনতে চেয়েছে। রঞ্জনের পথ চেয়ে আছে নন্দিনী— এই গান বিশুকে গাইতে হবে, যে নন্দিনীকে ভালোবাসে। বিশু গানের মাধ্যমে নন্দিনীর মুখের কথাই বলতে চাইছে কিন্তু কার্যত যেন গানটি হয়ে দাঁড়ায় চির প্রতীক্ষিত বিশুর অন্তরের গান যার মনের মানুষ কোনোদিন আসবে না, এটি বিশুরই চিরকালীন পথ-চাওয়ার গান হয়ে দাঁড়ায়। গানটি শেষ হলে বিশুর অন্তরের শূন্যস্থানের কথা নন্দিনীর কাছে ধরা পড়েছে। সে তখন বলে 'পাগল যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয় অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।' এর উত্তরে বিশু বলেছে 'তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে প'রে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।' নন্দিনী বুঝতে পেরেছে যে বিশুকে তার কিছু দেবার ছিল। এ বেদনা সে অনুভব করেছে। কিন্তু একথা বিশুর কাছে অপমানকর। সে রঞ্জন ও নন্দিনীকে স্নেহ করে, করুণার পাত্র সে নয়। তাই সে বলেছে তার গান সে বিক্রি করবে না। এই বিনিময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বিশু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বিশুর চরিত্রের এই দুঃখ ও বেদনাকে বরণ করে নেওয়ার সঙ্গে অর্থাৎ তার দুঃখতত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নন্দিনীর প্রসঙ্গ। সে নন্দিনীকে প্রশ্ন করেছে রঞ্জনের কাছে সে দুঃখের কথা শুনেছে কিনা। রঞ্জন ও নন্দিনী সত্যিকারের জীবনকে স্পর্শ করে একে অপরকে ভালোবাসে এটাই বিশু ভেবেছে। সত্যিকারের জীবনের স্পর্শে আনন্দ আছে দুঃখও আছে। অর্থাৎ জীবন কেবল সুখের আশ্রয় নয়, দুঃখও আছে জীবনে। বিশু ভেবেছে রঞ্জন ও নন্দিনীর প্রেম তাদের সম্পূর্ণ জীবনসত্যে উপনীত করেছে। কিন্তু দেখা গেল জীবনের দুঃখের দিকটি নন্দিনীর এখনো জানা হয়নি। নাটকে বিশু চরিত্রটি বস্তুত নন্দিনীকে জীবনের দুঃখের দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আর তখনই বোঝা যায় নাটকে বিশু ও রঞ্জনকে নিয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্র তৈরি হয়েছে। এবং তখন এও বোঝা যায় যে বিশু সত্যিই রঞ্জনের ওপিঠ, —যেখানে রয়েছে অন্ধকার। আর এপিঠে আছে রঞ্জনের আলোর জগৎ। নন্দিনীর প্রেমের আলো পড়েছে রঞ্জনের জগতে,

তাই রঞ্জন আলোকিত। কিন্তু বিশুর জগতে সে আলো পড়েনি। তাই বিশু যখন বলে 'না রাজা আমি রঞ্জনের ও-পিঠ'— তখন বোঝা যায় এতে কৌতুক থাকলেও গভীর সত্যও আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত না পাওয়া নিয়েও যে মানুষ বড়ো হতে পারে, দুঃখকে বরণ করে নিয়েও যে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারে তা বিশুর চরিত্রে দেখা যায়। তাই বিশুর মধ্যে একটা মানবিক রূপ রয়েছে। বিশুর দুঃখ কিন্তু তাকে কর্তব্য থেকে বিরত করেনি। নন্দিনীকে ভালোবাসলেও নন্দিনীর ভালোবাস সে পায়নি। কিন্তু বিশু নন্দিনীর ভালোবাসা কেড়ে নিতে চায়নি। সে নিজেকে সংযত করে রেখেছে। ভালোবাসার একটি সুন্দর শ্রী দেখা যায় নন্দিনী ও বিশুর মধ্যে।

নাটকের প্রথম দিকেই রয়েছে বিশুর একটি গান— 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে'— এই গানের মধ্যে মধ্যে চন্দ্রার সংলাপ রয়েছে। গানটির মধ্যে একটি কল্পনামূর্তির কথা আছে। চন্দ্রা গানের কথার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে চলেছে। 'তোর সুদূর ঘাটে চল রে বেয়ে' —শুনে চন্দ্রা বলে— 'তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।' বিশুর স্বপনতরীর নেয়ে যে নন্দিনী চন্দ্রা এই ইঙ্গিতই করেছে। চন্দ্রা যেভাবে কথা বলছে তাতে বোঝা যায় সে নন্দিনীর ওপর সন্তুষ্ট নয়। কারণ সে সুন্দরীপনা করে বেড়ায়। আসলে চন্দ্রারা যেভাবে চলে নন্দিনী সে রকম নয়। তাই তারা তাকে পছন্দ করে না। অস্বাভাবিকের জগতে নন্দিনী স্বাভাবিক তাই তারা তাকে ভালোবাসে না। তার কাছে আসে না। চন্দ্রাও বিশুকে নন্দিনী সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। গানের নাবিক যে নন্দিনী, এটাও চন্দ্রা বোঝে। এই তথ্যের মানদণ্ডে বলা যায় এটিও নন্দিনীর জন্য গাওয়া গান। কিন্তু আসলে তা নয়, —কারণ চন্দ্রা যেভাবে নাবিকের সঙ্গে নন্দিনীকে সমীকরণ করেছে তা সম্ভব নয়। চন্দ্রার কথার উত্তরে বিশু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে। বিশু বলেছে— 'বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তো তাকে দেখনি।' এর পর বিশু দুটি গান গেয়েছে। 'তোর প্রাণের রসতো শুকিয়ে গেল ওরে' এবং 'তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ' —এই দুয়ো গানে রয়েছে দ্ব্যর্থকতা। সাধারণত দেখা যায় গান বা কবিতার মধ্যে প্রায়ই 'আমি', 'তুমির' কথা থাকে। কখনো বলা হয় এই তুমি 'ঈশ্বর' বা 'প্রেমিকা'। এই 'তুমি'টি কে, তা জানার সঙ্গে সঙ্গেই কবির জীবনের রহস্যটি জানা যাবে, এরকম একটা ধারণা পাঠকদের থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 'তুমি'র কোনো বাস্তব অবয়ব থাকে না, সে আসলে কবিরই অন্তর্গত 'আমি' যার সঙ্গে কবির লীলা চলে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এই 'তুমি'র কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের 'তুমি'কে ধরে নেওয়া হয় ঈশ্বররূপে আর প্রেম পর্যায়ের 'তুমি'কে কল্পনা করা হয় প্রেমিকারূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূজার গানকে অনেক সময় প্রেমের বা প্রেমের গানকে পূজার গান বলে মনে হয়। আসলে গানের অর্থের মধ্যে ব্যক্তির চিহ্নটি প্রায়ই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক সময় প্রেমের গানকে পরে পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই 'তুমি' বস্তুত আত্মপ্রস্তুতির 'তুমি', আত্মনিবেদনের 'তুমি'। আত্মনিবেদন রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবধর্মের চূড়ান্ত রূপই হচ্ছে 'তুমি'। এই 'তুমি'র কাছেই 'আমি' যেতে চায়, এই 'তুমি'ই

'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় সুন্দরী বা 'সোনারতরী'-র নেয়ে হিসাবে কল্পিত। কবির অন্তর্গত সত্তাই যেন 'তুমি'রূপে পরিব্যাপ্ত। বিশুর দুখজাগানিয়াও সেই 'তুমি'। এই গানের সঙ্গে নন্দিনী নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে ও বিশুকে বলেছে— 'তুমি আমাকে বলছ দুখজাগানিয়া?'

রবীন্দ্রনাথের মতে কখনও কখনও কোনো নারীর উপস্থিতি কোনো ব্যক্তিকে তার চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। বিশুও নন্দিনীকে বলেছে যে তাকে দেখে সে বুঝেছে যে তার নিজের মধ্যেও একটি আলো দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ নন্দিনী বিশুকে একটি অন্তর্গত বৃহত্তর জগতে যেতে সাহায্য করেছে।

বিশুর গাওয়া বিভিন্ন গান থেকে সেই বিশুকে পেলাম— যে বিশু প্রেমিক, নেতা; বহির্মুখী আবার অন্তর্মুখী— এই দুই-এর মধ্যের সত্তাকে বোঝার জন্য সাহায্য করেছে গানগুলি। এদিক দিয়ে এই নাটকের গানগুলি বিশুর মানসচরিত্র অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"বিশুর দুঃখ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বেরই এক অবিচ্ছিন্ন দিক। চন্দ্রা-ফাগুলালদের সঙ্গে বিশুর আলাপনে যে প্রয়োজনের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নিসর্গ জগতের অপ্রয়োজনের জগতে প্রস্থানের প্রসঙ্গ আছে, সেটা বিশুর সৌন্দর্যতত্ত্বের এক অংশ; নন্দিনীর সঙ্গে দুঃখতত্ত্বের আলোচনায় ধরা পড়েছে তার জীবনের অপরাংশ। দুই অংশের বিশুকে এক করে নিতে হবে। চন্দ্রা-ফাগুলালদের সঙ্গে আলোচনার সয় বিশু 'মরণে'র কথা তুলেছিল। এই 'মরণ' তার দুঃখতত্ত্বেরই অপর এক দিক। বিশুর নিরাসক্তিময় দুঃখতত্ত্ব, মরণ-প্রসঙ্গ, অপ্রয়োজনের জীবনতত্ত্ব— সবই রঞ্জনের মধ্যে পরিশেষে উদাহৃত হয়েছে।' রঞ্জন মরণের মাধ্যমে এক অনির্দেশ্য সঙ্কেত, যুগ-যুগ ধরে এমনি করেই সে মানুষের মনে নীলকণ্ঠ পাখির পালকের খোঁজ দিতে থাকবে; আর বিশুরা রক্তকরবীর কঙ্কণের 'বাঁধন বিহীন সেই সে বাঁধন', তাই স্বীকার করে অনাসক্তভাবে জীবনের কর্ম করে চলবে। এই জন্যেই বিশু একদিকে সকলকেই লড়াইয়ে যেতে আহ্বান জানায়, অর্থাৎ কর্মকে স্বীকার করে; অপরদিকে সেই যাত্রাকে একলা 'মহাযাত্রা' বলে, এক নিরাসক্তিকে অঙ্গীকার করে।

কিন্তু প্রারম্ভ থেকেই বিশু এই পূর্ণতা পায় নি। তাকেও জীবনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পতন ও ব্যর্থতা ব্যতীত রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো চরিত্রই পূর্ণতা লাভ করে নি। বিশুকেও একদিন দাম্পত্য-জীবনের সঙ্কীর্ণ বন্ধন ও স্বার্থময় জগৎকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। আক্ষেপ করে সে বলেছিল, তীরবেঁধা পাখির মতো তখন তাকে ভূপতিত করে ফেলা হয়েছিল। বিশুর তখনো জানা ছিল না, এই পতন আসলে উত্থানের ভূমিকা।"

[রবীন্দ্রনাথ : রক্তকরবী— নির্মলেন্দু ভৌমিক]

পরিশেষে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে বিশু নন্দিনীরই আর একটি দিক। এই দুটি চরিত্র উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল। বিশু দুঃখতত্ত্বের প্রতীক, কিন্তু সে বলে, নন্দিনীর মধ্যেই যে সেই 'চির দুঃখের আলোটি', দেখতে পায়। নন্দিনী যেমন প্রাকার অতিক্রম করতে বিশুর কাছে এসেছিল, নন্দিনী তেমনি বিশুকে আশ্বাসও দিয়েছে যে সেই তাকে যক্ষপুরী থেকে বের করে নিয়ে যাবে।

যক্ষপুরীর অন্ধকার নিবাসী কারিগরদের জীবনের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি বিশুর কাছেই ধরা পড়েছে। বিশুর দ্বারাই সেই ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সর্দারের সমস্ত চালাকি তার কাছে ধরা পড়েছিল। বিশুর প্রয়াসের ফলেই নাট্যশেষে ফাগুলাল প্রমুখ সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

বিশুর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কী তথ্য জানা যায়? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বিশু নিজেকে কেন 'রঞ্জনের ওপিঠ' হিসাবে অভিহিত করেছে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

বিশুর মুখে প্রযুক্ত গানগুলির সাহায্যে বিশু চরিত্রের একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা প্রস্তুত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৮.২.২ কিশোর

রক্তকরবী নাটকটি শুরু হয়েছে কিশোর আর নন্দিনীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কিশোরকে সম্পূর্ণ নাটকের মধ্যে কয়েকবার দেখা যায়। কিশোর নব আগন্তুক খোদাইকর। যক্ষপুরী এখনও তাকে গ্রাস করেনি সম্পূর্ণভাবে। তাই সে নন্দিনীর প্রতি প্রীতির টান অনুভব করে। সেই টানেই সে নন্দিনীকে রক্তকরবী ফুল জোগায়। যন্ত্রের জগতে এসেও কিশোরের মন থেকে সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়নি। তাই যে নন্দিনীকে বারবার নাম ধরে ডাকে। নন্দিনীকে নাম ধরে ডাকার মাধ্যমেই সে সুন্দরের পূজা করেছে। নন্দিনী প্রাণশক্তি— প্রাণশক্তির আরাধনাতেই কিশোরের আনন্দ।

কিশোর চিরনবীন, চিরসবুজ। সে নন্দিনীকে ভালো বাসে। নন্দিনীর প্রতি ভালোবাসায় তার মধ্যে সজীবতা এসেছে। দুর্গম স্থান থেকে নন্দিনীর জন্য রক্তকরবী আহরণ করতে গিয়ে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এবং সেই কষ্টেই তার তৃপ্তি। নন্দিনীর প্রতি ভালোবাসায় সে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা করেনি। বস্তুত নন্দিনীর সৌন্দর্য কিশোরের কাছে শুধু আকর্ষণ মাত্র নয়— তা একধরনের প্রেরণা। সেই প্রেরণাতেই সে তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং নন্দিনীর প্রেমিকের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

নাটকের সূত্রপাতে কিশোরের কয়েকটি সংলাপে মনে হয় সে বয়সেও কিশোর, নন্দিনীকে বারবার ডাকতে ও রক্তকরবী ফুল এনে দিতে সে ভালোবাসে। যক্ষপুরীতে রক্তকরবীর গাছ সহজপ্রাপ্য নয়। কিশোর অনেক খুঁজে একস্থানে জঞ্জালের পেছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েছে। গাছটির সন্ধান নন্দিনীকে সে দিতে চায় না। সে নিজে সেই ফুল নন্দিনীকে এনে দেবে, এতেই তার আনন্দ। যক্ষপুরীর জানোয়াররা তাকে শাস্তি দেয়, সেই দুঃখ কিশোরের ভালো লাগে। সে এমন একটি কাজ করছে যা নন্দিনীকে আনন্দ দেয়। সেই কাজ যতই কঠিন হোক, তার মধ্য দিয়ে সে তৃপ্তি পায়। ভালোবাসার ব্যক্তির জন্য নিজের অহংকেও মানুষ নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিতে পারে। কিশোর নন্দিনীকে ভালোবাসে এবং নন্দিনীকে আনন্দ দেবার জন্য সে যথাসর্বস্ব এমনকি প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে প্রস্তুত। তাই সে নন্দিনীর জন্য হাসিমুখে সব দুঃখকষ্ট সহ্য করে।

নাটকের শুরুতেই একটি স্নিগ্ধ ভালোবাসার রূপ দেখা যায়। একটি কিশোর তার থেকে বড়ো একটি মেয়ের মধ্যে নিজের সমস্ত আনন্দ উজাড় করে দিতে চায়। একটি সুন্দর সকাল ও ফুল দিয়ে নাটকের ঘটনা শুরু হয়েছে। কিশোর ও নন্দিনীর আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতির আনন্দ মিশে গেছে। কিন্তু একটি পেলব আনন্দ দিয়ে সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যক্ষপুরীর জানোয়ারদের হাতে কিশোর শাস্তি পাবে এই বার্তার মাধ্যমে একটি অশুভ সংকেত ধরা পড়ে, অমঙ্গলের একটি অস্পষ্ট ছায়া ভেসে ওঠে। অর্থাৎ একটি সুন্দর মুহূর্ত দিয়ে কাহিনি শুরু হলেও তার আড়ালে ছড়িয়ে আছে একটি অশুভ ইঙ্গিত।

কিশোরে চরিত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হয় সে খুব সাহসী। তার কথাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে সে নন্দিনীর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হবে না। বস্তু কিশোর নির্ভীক।

নাটকের মধ্যে যখন প্রহরীরা বিশুকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে তখন আবার কিশোর সেখানে উপস্থিত হয়। ততদিনে নন্দিনী যক্ষপুরীর স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। বিশুও বুঝতে পেরেছে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় প্রহরীরা তাকে বন্দী করেছে। নাটকের মধ্যে এখানে কিশোরকে দ্বিতীয়বার দেখা যায়। এখানে সে অল্প কয়েকটি কথা বলেছে। কিন্তু এই কথা কয়েকটির মধ্যেই তার এখানে গুরুতর ভূমিকার ইঙ্গিত আছে। নাটকের প্রথমে তার সংলাপের মধ্যে একটি ছোটো অভিমান ভরা উক্তি ছিল— 'বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমার নিজের ফুল।' অর্থাৎ নন্দিনী গান শুনতে ভালোবাসে বলে বিশু তাকে গান শোনায়। নন্দিনীর ভালোলাগার উৎসটি বিশুর মধ্যে আছে, কিশোরের নেই তাই সে ফুল এনে দেবে। ফুলটি এখানে গানের সমান্তরাল রূপে এসেছে। অর্থাৎ বিশুর গান নন্দিনীর ভালো লাগে, কিশোর নন্দিনীকে ফুল এনে দেবে এটাও তার ভালো লাগে। তাছাড়া বিশু ও নন্দিনীর মধ্যে যে একটি ভালোবাসার সম্পর্ক আছে তা কিশোর জানত। তাই সে বিশুকে নিয়ে অন্য পথে যাবার জন্য প্রহরীকে অনুরোধ করেছে, যাতে নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর দেখা হয়। এর থেকে বোঝা যায় কিশোরের আগের কথাটি অভিমানের নয়, ত্যাগের। এই মনোভাবের জন্যই সে ভেবেছে অন্তত একবার বিশুর সঙ্গে নন্দিনীর সাক্ষাৎ ঘটুক। নন্দিনী যে বিশুর জন্য কাতর হয়েছে তা সে তাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছে। তাই সে বিশুর বদলে কারাগারে যেতে চেয়েছে। যে কারাগারে গেলে বিশু মুক্তি পাবে এবং নন্দিনী খুশি হবে। অর্থাৎ সে সব সময় নন্দিনীকে খুশি করতে চায়। এই কিশোর ছেলেটির মন ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। এটি কিশোরের বয়ঃসন্ধির কাল, যখন প্রকৃতি ও জীবনের দিকে তাকালে সবকিছুকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। যা এতদিন অস্পষ্ট ছিল তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছেলেদের মধ্যে এই সময় নারীদের সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হয় যা সে তার সামনের কোনো পাত্রীকে অর্পণ করে। নতুন জানা বিস্ময়ে সে তার ভালোবাসা কোনো নারীর কাছে অর্পণ করে। কিশোরের বয়ঃসন্ধিকালের ভালোবাস নন্দিনীতে অর্পিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। সে যে একদিন নন্দিনীকে বলেছিল 'একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী' —এটা তার স্পর্ধা মাত্র নয়, তার অন্তরের কথা, —তা তার আচরণের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। আবার তার মধ্যে যে একটি ছেলেমানুষী রয়েছে তাও বোঝা যায় যখন সে বিশুর বদলে কারাগারে যেতে চেয়েছে। অন্যের হয়ে কারাগারে যেতেন চাওয়ার মধ্যে তার ছেলেমানুষী আচরণটি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিশু কিশোরকে কারাগারে যেতে দেয়নি। সে বুঝেছে যে কিশোর একটি কঠিন কাজ করতে চাইছে। সংকটের মুহূর্ত উপস্থি হলে সকলেই কিছু করতে চায়, কিশোরও চেয়েছে। বিশু কিশোরকে বলেছে তার একটি কঠিন দায়িত্ব আছে, রঞ্জনকে কিশোরের খুঁজে বার করতে হবে। অর্থাৎ বিশু চলে গেলে কাজের দায়িত্ব নেবে রঞ্জন। রঞ্জনকে খুঁজে বার করার মধ্যে বিপদ আছে। কিন্তু সে কাজ করতে কিশোর অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছে। সে নন্দিনীর কাছ থেকে রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে রঞ্জনের খোঁজে গেছে। এর থেকে কিশোরের কর্মোদ্যম-স্পৃহা প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিশোরের মতো এরকম কিশোর বয়সী পুরুষের আত্মত্যাগের উদাহরণ রবীন্দ্রসাহিত্যে আরো আছে। যেমন 'শ্যামা'র উত্তীয়। সে শ্যামাকে সুখী করার জন্য বজ্রসেনের অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়েছে। এই ধরনের আত্মত্যাগের মধ্যে একটি ভালোবাসার সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা আছে, একটি শুচিতা রয়েছে। তবে শ্যামা উত্তীয়কে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কিন্তু নন্দিনী কিশোরকে ব্যবহার করেনি।

নাটকের শেষে কিশোর আবার ফিরে এসেছে, যদিও শারীরিকভাবে নয়। কিন্তু সেখানে তাকে দিয়ে একটি গুরুতর কার্য সিদ্ধ হয়েছে। রঞ্জনের মৃতদেহ দর্শনের পর নন্দিনী রাজাকে কিশোরের কথা জিজ্ঞাসা করেছে এবং যখন শুনেছে রাজা কিশোরকেও হত্যা করেছেন। তখন ধৈর্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে রাজাকে বলেছে— 'রাজা এইবার সময় হল। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।" নন্দিনী দেখেছে প্রহরীরা বিশুকে মারতে মারতে নিয়ে গেছে, রঞ্জনের কথা সে স্পষ্টভাবে জানতে পারছে না, পুরোনো বন্ধুদের জীর্ণ চেহারা, চরিত্রও সে দেখেছে। নন্দিনী এখন শেষবারের মতো রাজাকে বলতে এসেছে যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। রাজা দরজা খোলার পর সে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখতে পেল। যে রঞ্জন নন্দিনীর জীবনে সব, যার জন্য সে যক্ষপুরীতে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে হাসিমুখে দিন কাটিয়েছে সেই রঞ্জনের মৃতদেহ দেখার পর অনুমান করা যায় নন্দিনী উপলব্ধি করতে পারবে রাজা কতখানি অশুভের প্রতীক। কিন্তু মৃতদেহ দেখার পরও নন্দিনী ধৈর্য হারায়নি বা স্পর্দ্ধাভরে রাজাকে বলেনি যে এবার তার সঙ্গে নন্দিনীর লড়াই হবে। একথা সে তখনই বলেছে যখন কিশোরের মৃত্যুসংবাদ শুনেছে। রঞ্জনের মৃত্যু নন্দিনীকে যতটা আঘাত দিয়েছে তার থেকে বেশি আঘাত দিয়েছে কিশোরের মৃত্যু। এই থেকে নাটকে কিশোর চরিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

নাটকে কিশোরকে খুবই অল্পসময় দেখা গেছে। তার সংলাপও অল্প এবং নাটকের শেষে অপরের মুখে তার কথা শোনা যায়। রাজা তার সম্পর্কে বলেছেন 'বালিকার মতো তার কচি মুখ'। কিশোরের সংলাপেও তার যে অল্পবয়স সেটা ধরা পড়েছে কিন্তু অল্পবয়সী হলেও রঞ্জনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে সে নিজের শক্তির কথা না ভেবে রাজার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং শেষপর্যন্ত সে সত্যিই নন্দিনীর সুখের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিশোর চরিত্রটিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কিশোরের মধ্য দিয়েই তিনিই সমাজের দুর্বিষহতাকে তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। যে সমাজ প্রতিমুহূর্তে নিরপরাধীকে হত্যা করে সে সমাজ দূষিত। নাটকে যখন কিশোরকে রাজার হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল তখনই নন্দিনী জেগে উঠল এবং বুঝল যে এবার প্রতিরোধের সময় এসেছে। কিশোরের মধ্য দিয়ে সমাজের এই ভয়াবহতাকেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন— এটাই এই নাটকে কিশোরের ভূমিকা।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

নন্দিনীর প্রতি কিশোরের ভালোবাসার স্বরূপ কী? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কিশোরের মৃত্যু নন্দিনীকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

নাটকের বক্তব্যের দিক থেকে কিশোর চরিত্রের অবতারণা নাট্যকারের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে?

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৮.২.৩ অধ্যাপক

যক্ষপুরীর সংগ্রহশীল রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি বস্তুবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধি। অধ্যাপক তারই ধারক ও বাহক। তাঁর সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি এই বিজ্ঞানদৃপ্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শাসনের কৌশল এবং তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত। বস্তুতন্ত্র জড়শক্তির উপাসনায় নিরত বিজ্ঞানবুদ্ধি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অবিশ্বাসী; এই দুয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্রও মানুষের অন্তরতম সত্তাকে অস্বীকার করে। বস্তুতন্ত্রের স্বরূপ হল কোনো কিছুকে শুধুমাত্র বস্তু হিসাবে জানা ও লাভ করা।

অধ্যাপক নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, দিনরাত পুথির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চলাই তাঁর কাজ। এই বস্তুজ্ঞানসাধনার আড়ালে অধ্যাপক অন্তর্হিত হয়েছিলেন। নন্দিনীর আবির্ভাবেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। জীবনের আনন্দময় স্বরূপের আভাস তিনি নন্দিনীর মধ্যে লাভ করেন। অধ্যাপক যক্ষপুরীর তত্ত্বজ্ঞের কাজ করেছেন। যক্ষপুরীর চারপাশের জীবনের চেহারাটি নন্দিনীকে অধ্যাপকই চেনাতে চেষ্টা করেছেন।

ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে কৃষি সভ্যতার যে চিরন্তন লড়াই, তা রামায়ণের যুগেও যেমন ছিল, বর্তমান কালেও ঠিক তেমনি গভীরতার এবং বাস্তবতার সঙ্গে বিদ্যমান। এই পুঁজিবাদী শক্তির শোষণ ক্ষমতার শাখায় প্রশাখায় জড়িয়ে পড়েছে শুধু বিশুপাগল বা ফাগুলালের মতো শ্রমিকরাই নয়, জ্ঞানমার্গের পথিক অধ্যাপক চরিত্রটিও। নাটকে কিশোরের পরেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রসঙ্গই উল্লেখযোগ্য নাটকের পূর্বপাঠগুলিতে অধ্যাপক ও নন্দিনীর সংলাপেই নাট্যকাহিনির সূচনা, কিশোর সেখানে অনুপস্থিত।

দ্বান্দ্বিকতাময় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই অধ্যাপকের দৃষ্টি শ্রমিকদের মতো অস্বচ্ছ নয়। মস্তিষ্কজাত জ্ঞান এবং হৃদয়জাত অনুভূতি— উভয়বোধই সময়ে সময়ে তাঁর প্রাণকে স্পন্দিত করে। এই স্পন্দনের ফলস্বরূপ তাঁর মুখে আমরা বিভিন্ন সময়ে যে সংলাপ শুনি সেগুলিও নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ— চোখের জলে সিক্ত, হৃদয়ের শোণিতে রঞ্জিত। যক্ষপুরীর গতানুগতিক অত্যাচার এবং নিপীড়নের প্রবাহে কিশোরের আর্তি, নন্দিনীর আহ্বান এবং বিশুপাগলের গান যেমন আমাদের কাছে জীবনের একেকটি দিগন্ত উন্মোচিত করে; আলোচ্য অধ্যাপক চরিত্রটির বিভিন্ন দৃশ্যে বিধৃত সংলাপের মধ্য দিয়েও আমরা তেমনি কিছু ঘটনা এবং কিছু চরিত্র সম্পর্কে নতুন চিন্তায় আলোকিত হই। বস্তুত অধ্যাপককে যক্ষপুরীর তত্ত্বভাষ্যকার রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

কিশোরের আবেগাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নন্দিনীর প্রাণ-সৌন্দর্যকে আমরা যেভাবে অনুভব করি, অধ্যাপক নন্দিনীকে এবং তার অন্তরাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে অধ্যাপকের কণ্ঠে উচ্চারিত সংলাপের মাধ্যমে আমরা একই সঙ্গে নন্দিনীর আনন্দসত্তা এবং অধ্যাপকের ব্যক্তিগত অসহায়জনিত বেদনার পরিচয় পাই। নন্দিনীর উপস্থিতি অধ্যাপকের বিদ্যাচর্চায়, জ্ঞাননিষ্ঠায় উদভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নন্দিনী ক্ষণে ক্ষণে চমক জাগিয়ে চলে যায়— অধ্যাপকের মনে দোলা লাগে এবং তাঁর মনে হয় নন্দিনী যেন দেওয়ালের ফাটল দিয়ে আসা আচমকা আলো। নন্দিনী অধ্যাপকের নিশ্ছিদ্র জ্ঞানচর্চার মধ্যে হঠাৎ একটা অজ্ঞাতপূর্ব মুক্তির হাওয়া এনে দেয়। অধ্যাপক বলেন তিনি যেন 'নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ'। সেই অবকাশহীনতার মধ্যে সন্ধ্যাতারার মতো নন্দিনীকে দেখে অধ্যাপকের জীবন স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তিনি চান নন্দিনী তার আনন্দ দিয়ে অধ্যাপকের জীবনের শূন্যতাসমূহ পূর্ণ করে তুলুক। নন্দিনীর কাছে অকপট তাঁর স্বীকারোক্তি— 'জান নন্দিনী আমিও আছি একটা জালের পেছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।' মনুষ্যত্বের হানি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন অধ্যাপকের এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর মনুষ্যত্বটুকুই ধরা পড়েছে সব থেকে বেশি।

রাজা যেমন চেয়েছিলেন বাহুবলের দ্বারা রঞ্জনকে জয় করতে, অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা তেমন ছিল না। তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা জানতেন এবং জানতেন বলেই তিনি নন্দিনীর হাতের কঙ্কণ থেকে একটিমাত্র রক্তকরবী নিয়েছেন। সেই রক্তকরবীতে অধ্যাপক

শুধু মাধুর্য দেখেননি, তিনি অনুভব করেছিলেন তার 'রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে।' রক্তকরবী ফুলটি এখানে ভাবী পরিবর্তনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে অধ্যাপকের সংলাপে।

রঞ্জনের আগমন-সংবাদে যক্ষপুরীর স্থিতিশীলতা শান্তি ও শৃঙ্খলা যখন অনেকটাই বিপর্যস্ত, তখন দ্বিতীয়বার পুরাণবাগীশের সঙ্গে অধ্যাপকের প্রবেশ ঘটেছে। অধ্যাপকের সংলাপে এখানেও ধরা পড়েছে নন্দিনী সম্পর্কে তাঁর পূর্বতন ব্যাকুলতা। ধানীরঙের শাড়ি পরা দূরের নন্দিনীকে দেখে সবার থেকে আলাদা অনুভূতি হয়েছে অধ্যাপকের— যেন 'সুর-বাঁধা তম্বুরা'। রাজা সম্পর্কেও কয়েকটা মূল্যবান তথ্য এখানে তাঁর মুখ দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে। অধ্যাপক বলেছেন যক্ষপুরীর নেপথ্যচারী রাজার প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে। তাঁর নিজের কথা 'আমি ওকে ভালোবাসি'।

নাটকের শেষের দিকে অধ্যাপকের উপস্থিতি সংক্ষিপ্ততম। রাজার দুয়ারে আগত রঞ্জনকে রাজা তাঁর রথচক্রে পিষ্ট করে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে নন্দিনীর হাতে হাত রেখে যখন অজানার দিকে পা বাড়িয়েছেন, সেই মুহূর্তে দ্রুতবেগে অধ্যাপকের প্রবেশ ঘটেছে। ফাগুলালের কথা থেকে জানা যায় রাজা নন্দিনীর ডাক শুনে মৃত্যুর অভিমুখে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু অধ্যাপকের কথার সুরে এর বৈপরীত্য— তাই অধ্যাপক সঙ্গ নিতে এসেছেন রাজার, কারণ একদিনে রাজা তাঁর 'চরম প্রাণের সন্ধান' পেয়েছেন।

যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ থেকে বহির্গত শ্রমিকদের দুরবস্থা লক্ষ করে নন্দিনী যখন আকুলভাবে আর্তনাদ করেছে তখন অধ্যাপক এগিয়ে এসেছেন তাঁর তত্ত্বকথা নিয়ে। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ও তত্ত্বে হয়তো কিছু শ্লেষ আছে, কিন্তু সেই অলংকারের অন্তরালে আধুনিক সভ্যতার স্বরূপটি গোপন থাকেনি। অধ্যাপক এই নাটকে কবি-কল্পিত তত্ত্বটীকাকারই শুধু নন, তিনি যক্ষপুরীর ভাষ্যকারও বটে। তাই তিনি জানিয়েছেন মরা ধনের প্রেতের শক্তির মতোই রাজারও অমিতশক্তি। রঞ্জনকে কেন আনা হল না, নন্দিনীর এই ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বলেছেন সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। এখানেও যক্ষপুরীর একটি পরিচয় আমরা পাই। রাজার সঞ্চয় সরোবরে নাড়া লেগেছে— শঙ্খিনী নদীর জলের তোড়ে যেমন পাহাড় ধ্বসে পড়েছে— রাজারও সে রকম ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের পুঁজিবাদী সমাজে সঞ্চিত ধন ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হলে তা সবার মধ্যে অর্থাৎ সর্বসমাজে ছাড়িয়ে পড়বে অধ্যাপকের মুখে প্রযুক্ত উপমা একথাই ব্যঞ্জিত করেছে। অধ্যাপক নন্দিনীকে 'বড়ো হবার তত্ত্ব' জানিয়েছেন এবং বলেছেন কোনো তত্ত্ব ভালোও নয়, মন্দও নয়। অধ্যাপকের এই সংলাপের মধ্যে আমরা তাঁর অনাসক্ত এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বটির পরিচয় পাই। সত্যকে গ্রহণ করবার জন্য যে শক্তি থাকা প্রয়োজন আমাদের আলোচ্য চরিত্র অধ্যাপকের মধ্যে সেই শক্তিটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

অধ্যাপক চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে ব্যক্তিচরিত্র ও শ্রেণিচরিত্র রূপে

এঁকেছেন। তার মধ্যে একটা স্ববিরোধ, একটা আত্মসংঘাত আছে। চরিত্রটির পূর্বাপর উক্তি এবং কর্মের কিছু অসংগতি কিঞ্চিৎ পীড়া দেয়। কিন্তু একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে তিনিও দোষগুণে গড়া রক্তমাংসের মানুষ। সর্বোপরি ধনতন্ত্রের জালে বাঁধা পড়া অসহায় অগণিত শ্রমিকদের মতোই তিনিও একজন নগণ্য কর্মজীবী। সুতরাং সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর চিত্তেও এই দোলাচলতার বিদ্যমানতা চরিত্র হিসাবে অধ্যাপককে বাস্তবমুখী করে তুলেছে বলেই আমাদের মনে হয়। তত্ত্ব জ্ঞান এবং রোমান্টিক আবেগের টানাপোড়েনে দ্বন্দ্বময় এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি। কিন্তু যক্ষপুরীর এমনি আবহাওয়া যে তাহার বুদ্ধিটা নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সর্দার প্রভৃতির মতো সে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয় নাই। কেননা, নন্দিনীকে দেখিয়া তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তি জন্মায়। নন্দিনীকে দেখিয়া সে বলিল—

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও দুটো কথা বলি।

সে বলে—

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

যক্ষপুরীর সময় কাজের চাপে ভরাট, কোথাও ফাঁক নাই। নষ্ট করিবার মতো সময় যাহার আছে, বুঝিতে হইবে সর্বতোভাবে নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া সে পড়ে নাই।

বস্তুবাগীশ ও অধ্যাপকের তুলনায় পুরাণবাগীশ লোকটা এখানে নবাগন্তুক। সে এখানকার হালচাল ভালো বুঝিতে পারে না। অধ্যাপক তাহাকে বুঝাইয়া বলে—

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু এ একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।

অধ্যাপকের বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল এখানে থাকিলেই পুরাণবাগীশ যক্ষপুরীর জনতার মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া যাইবে।"

[রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ : প্রমথনাথ বিশী]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অধ্যাপককে যক্ষপুরীর তত্ত্বভাষ্যকার কেন বলা হয়েছে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

অধ্যাপকের কাছে নন্দিনী কী রূপে প্রতিভাত হয়েছে? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

নাট্যক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধ্যাপক চরিত্রের সক্রিয়তা প্রতিপন্ন করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে এবারে আসুন আমাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক। এই অধ্যায়ে আমরা 'রক্তকরবী' নাটকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ করেছি। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনীকে ঘিরে আমাদের আলোচ্য চরিত্র তিনটি আবর্তিত হয়েছে। তিনটি চরিত্রের উপরই নন্দিনী চরিত্রের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার এই তিনটি চরিত্রের কাছ থেকে অর্জন করা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নন্দিনীও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

বিশু চরিত্র সম্পর্কে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বিশু অনেকটা গ্রিক নাটকের কোরাস জাতীয় চরিত্র। নাটকে সে অনেকাংশে নাট্যকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। যক্ষপুরীর স্বরূপ তার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। তার সাধনা দুঃখের মাধ্যমে সে আনন্দকে লাভ করেছে। নন্দিনী ও বিশু একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। তারা পরস্পরের প্রেরণাস্বরূপ। বিশু নন্দিনীরই আর এক দিক। যক্ষপুরীর কারিগরদের জীবনের ট্র্যাজেডি বিশুর মাধ্যমেই পাঠক-দর্শকের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে।

নিষ্পাপ-সারল্যের প্রতিনিধি কিশোর ও নন্দিনীর কথোপকথনের মাধ্যমে 'রক্তকরবী' নাটকটি শুরু হয়েছে। কিশোর যক্ষপুরীর খোদাইকর। নন্দিনীকে সে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার টানেই নন্দিনীকে সে ফুল জোগায়। নন্দিনী তার কাছে প্রেরণাস্বরূপ। সেই প্রেরণাতেই সে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কিশোরের মৃত্যু নন্দিনীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। বস্তুত কিশোরের নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়ার ফলেই যক্ষপুরীর দুর্বিসহ রূপ আরো স্পষ্টতর হয়েছে।

অধ্যাপক যক্ষপুরীর বিজ্ঞানবুদ্ধির ধারক ও বাহক। অধ্যাপকের দৃষ্টি শ্রমিকদের মতো অস্বচ্ছ নয়। এই স্বচ্ছ দৃষ্টির শক্তিতেই তিনি যক্ষপুরীর মূল স্বরূপ সম্পর্কে নন্দিনীকে অবহিত করেছেন। তিনি নিজেও নন্দিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। নন্দিনীর আবির্ভাবেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে তিনি যক্ষপুরীর তত্ত্বভাষ্যকারে পরিণত হয়েছেন।

৮.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

কোরাস : গ্রিক নাটকে কোরাসের গুরুত্ব খুব বেশি, কোরাস হল একদল গায়ক। তাদের দলবদ্ধ সংগীত নাট্যক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তারা নাট্যক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের সংগীত নাটকের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে নাটকে অখণ্ড ঐক্য গড়ে তোলে। সংগীতের স্থলে কোরাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অথবা অভিনেতার সঙ্গে কোরাসের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের রীতিও প্রচলিত ছিল। ইউরিপিডিসের সময় থেকে কোরাসের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা একাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

৮.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৯
রক্তকরবী
রক্তকরবী : সংগীত প্রয়োগ

বিষয় বিন্যাস

৯.০ ভূমিকা (Introduction)
৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৯.২ 'রক্তকরবী'র গান
৯.২.১ রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা
৯.২.২ 'রক্তকরবী' নাটকে সংগীত ব্যবহারের তাৎপর্য
৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৯.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৯.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৯.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৯.০ ভূমিকা (Introduction)

গ্রিক নাটকের বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সেখানে সংলাপের প্রাধান্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে কোরাসের ভূমিকা ততই গৌণ হয়ে পড়েছে। বস্তুত সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতে উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে এবং শেষপর্যন্ত খাঁটি নাটকের রসসৃষ্টিতে সংগীতের আসন শুধু গৌণ নয়। প্রায় অবাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গীতিনাটকে, গীতবহুল যাত্রা বা অপেরার ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন কুলীন নাটকের সভায় সংগীত অপাংক্তেয়— ভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন যুগের পরবর্তীতে যেসব নাটকে গানের মাধ্যমে রসসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে সেই সমস্ত নাটককে অনেকাংশেই মেলোড্রামার পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে সংলাপের মাধ্যমে যথেষ্ট মাত্রায় রসসৃষ্টি হয়নি সেখানে সুরের তীব্র আঘাতে রসোদ্রেকের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেই চেষ্টা অনেক সময়ই অনেকখানি কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। সংঘাত, ঔচিত্য ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে নাটকে গানের প্রয়োগ দুর্বলতারই পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু গান যেখানে নাটকের বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপনে সাহায্য করে, সংলাপের পরিপুষ্টি সাধন করে, স্থান-কাল-পাত্রোচিত হয়, —সেখানে নাটকে সংগীত ব্যবহারের প্রসঙ্গটি অবশ্যই নিন্দনীয় নয়।

কথা যেখানে পৌঁছতে পারে না সুর সেখানে অনায়াসে পৌঁছায়। কাব্যে-নাটকে

যেখানে চরিত্রের মাধ্যমে সমস্ত কিছু ব্যক্ত হয় না অথবা কথার দ্বারা সবকিছু প্রকাশ করা যায় না সেখানে সুর অর্থাৎ সংগীতের মাধ্যমেই স্রষ্টার ভাবকল্পনা পূর্ণতা লাভ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন দেবমহিমা প্রকাশ, প্রকৃতির রূপ বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় কথার পরিবর্তে সুরের অর্থাৎ সংগীতের মাধ্যমে অনায়াসেই প্রকাশিত হয়। পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে সংগীত একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দেবতার প্রশস্তি কথার মাধ্যমে ততটুকু ব্যক্ত করা যায় না, যতটুকু সংগীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়। আধ্যাত্মিক জগতের অতীন্দ্রিয় রহস্যের মহিমা বাস্তব জগতের প্রয়োজনের দ্বারা আবদ্ধ ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না কখনো। সেখানে উপনীত হতে হলে সুর ও ছন্দের প্রয়োজন। বাংলা নাটকের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাট্যরচনায় যাত্রা ও গীতাভিনয়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর নাটকে সংগীতের বহুল ব্যবহার সেই প্রভাব থেকেই জাত।

নাটকে সংগীত ব্যবহারের ঐতিহ্য এদেশে বহু প্রাচীন। যাত্রা-নাটকের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এদেশে নাটকে সংগীত প্রযুক্ত হয়েছে। নাটকে সংগীত যোজনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন বা দীর্ঘঘটনাবহুল দৃশ্যপরম্পরা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একঘেয়েমির মধ্যে সুরের মাধুর্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা, গাম্ভীর্যের মধ্যে ঈষৎ লঘুতা আনয়ন, সর্বশ্রেণির দর্শকদের আনন্দপ্রদান। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যতীত নাটকে পরবর্তী ঘটনার আভাস দানের জন্য, কখনো আসন্ন ঘটনার সংকটজনক পরিস্থিতির পটভূমি রচনার জন্য অথবা সংঘটিত ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য বা কোনো বিশেষ নাট্যসংস্থানকে অলংকৃত করার জন্য সংগীত প্রয়োগ করা হয়। সংগীত ব্যক্তিবিশেষে সংলাপের বিকল্প রূপ। যখন সাধারণ অর্থবান বাক্যের প্রকাশ সম্পূর্ণ ও শোভন হয়না, তখন সংগীতের ভাষা ও সুর তাকে উদ্দেশ্যস্পর্শী লক্ষ্যভেদী ও চরিত্রোপযোগী করে তোলে। রবীন্দ্রনাটকের গানগুলিও সাধারণভাবে উপর্যুক্ত মন্তব্য-সূত্রের পরিপোষকতা করেছে।

তবে রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রয়োগ প্রাচীন নাট্যধারার দ্বারা প্রভাবিত নয়, তা সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকে গানের ব্যবহার যতটা তাৎপর্য-মণ্ডিত অন্যত্র ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক পরিকল্পনার ইঙ্গিত প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাথমিক নাট্যচর্চায় সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রথানুবর্তন করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন যে— "...'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর গানের প্রয়োগে অনেক সময়েই তাঁর স্বকীয় প্রবর্তনা প্রায় দেখি না। এসব রচনায় গানগুলি প্রায়ই নিরুদ্দেশ্য, চারিত্র-বর্জিত, হয়তো মধ্যবর্তী কোনো অংশপূরণ মাত্র। ইলার প্রেমসংগীত তো নিয়মরক্ষা বটেই, এমন-কী অপর্ণার বিভোর গীতাবলিকেও মনে হয় একটা সরব আয়োজন...।" রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে গানগুলি নাট্যধর্মের পোষকতা করে। অনেক সময় নাটকে ব্যবহৃত গানগুলি পরাবাস্তবতার ব্যঞ্জনা বহন করে। সুরসঞ্চারী গীতিকবিতার

সঙ্গে তখন নাটকগুলির সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ঠ। নভোবিস্তারী সুরের আবহে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি অসাধারণ তাৎপর্যময়তায় বিধৃত হয়। বক্তব্যপ্রধান নাটকে গীতিপরিবেশ রচনার কারণেই সংগীতবহুলতা লক্ষ করা যায়।

৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আসুন পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। 'রক্তকরবী' নাটকে সংগীত প্রয়োগের প্রসঙ্গটি এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয়। আমরা আমাদের আলোচনা এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে—

- আপনারা নাটকের ক্ষেত্রে গানের ভূমিকা কী এবং কতটুকু সে সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের বহুল ব্যবহারের উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'রক্তকরবী' নাটকে প্রযুক্ত গানগুলির নাট্যোপযোগিতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৯.২ 'রক্তকরীব'র গান

'রক্তকরবী' নাটকে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নাটকের বক্তব্য প্রকাশের জন্য সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটক আরম্ভ হয়েছে যে নগরকে আশ্রয় করে তার নাম যক্ষপুরী। যক্ষপুরীর শ্রমিকদল মাটির তলা থেকে সোনা তোলার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা এক জটিল জালের আবরণে অবস্থান করেন। এই জাল তাঁকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রাণের লীলাভূমি থেকে নির্বাসিত রাজা অন্ধকারে অবস্থান করে তাঁর মানবীয় সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এই যক্ষপুরীতে নন্দিনী এসেছে পৃথিবীর মুক্তজীবন ও সৌন্দর্যের বাণী নিয়ে। তাকে পেয়ে শ্রমিকদের হৃদয় আন্দোলিত হয়েছে, কিন্তু যক্ষপুরীর রাজা আবরণের অন্তরালে তেমনি নির্বিকার হয়ে অবস্থান করেন। 'রক্তকরবী' নাটকে প্রযুক্ত গানগুলি এই প্রেক্ষাপটে বিচার্য।

'রক্তকরবী' নাটকে সর্বমোট আটটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলি হল—

(১) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে

(২) মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে

(৩) তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল।

(৪) তোমায় গান শোনাব

(৫) ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার

(৬) ভালোবাসি ভালোবাসি

(৭) যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে

(৮) শেষ ফলনের ফসল এবার

নাটকের শেষে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি আবার শোনা যায়। নাটকের শেষে গানটির তৃতীয় ছত্র 'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে' পাঠান্তরে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে'। এটি নবম গান হিসাবে বিবেচিত হবে না, কারণ এটি প্রথম গানেরই পুনরাবৃত্তি।

প্রথম গান নাটকে নেপথ্য-সংগীত হিচাবে প্রযুক্ত হয়েছে, এটি সমবেতকণ্ঠে গীত। নাট্যশেষেও এটি সমবেতসংগীত হিসাবে নেপথ্যে গীত হয়েছে। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম গান গেয়েছে বিশু চরিত্র। ৬ষ্ঠ গানটি গেয়েছে নন্দিনী।

উপর্যুক্ত তথ্যসূত্রগুলো মনে রেখে আমরা 'রক্তকরবী' নাটকে সংগীত ব্যবহারের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে পারি। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের ভূমিকার প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র পরিসরে আলোচনার দাবিদার।

৯.২.১ রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা

'তাসের দেশ' নাটকে সংগীত ব্যবহারের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকার প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনাতেও এই বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে। এবার এ বিষয়ে আরো দু-একটি প্রসঙ্গের উল্লখ করে আমরা পরবর্তী আলোচনার দিকে অগ্রসর হব।

রবীন্দ্রনাথের নাটক গান ব্যবহারের একটি প্রবণতা দেখা যায়। 'শারদ্যোৎসব' থেকে তাঁর নাটকগুলিতে দেখা যায় ঘটনাক্রম প্রকাশিত হয়েছে গানের মাধ্যমে। 'ডাকঘর' ছাড়া 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি সমস্ত নাটকেই গানের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। তবে 'শারদোৎসব' থেকে 'মুক্তধারা' পর্যন্ত নাটকে ব্যবহৃত গানের তুলনায় 'রক্তকরবী'তে গানের সংখ্যা কম। রক্তকরবীতে আটটি গান রয়েছ। গানগুলি বিশু, নন্দিনীর কণ্ঠে প্রযুক্ত হয়েছে।

নাটকে নন্দিনী, বিশু এবং সর্দার ও মোড়লের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে রঞ্জন আসছে, যার প্রতীক্ষা শুধু নন্দিনীর নয়, দর্শক ও পাঠকদেরও রয়েছে। তাদের

কথোপকথন থেকে রঞ্জন সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। রঞ্জনের অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য হল সে নিজেকে স্বতস্ফূর্তভাবে নাচে গানে মত্ত করে রাখে। রঞ্জন কোন গান গাইছে তা জানা যায় না, কোনো বিশেষ গানও শোনা যায় না। সাধারণত গানের ভাষার সাহায্যে একটি চরিত্রকে বোঝা যায়। কিন্তু রঞ্জনের মুখে কোনো বিশেষ গান শোনা যায় না। শুধু এই তথ্যই জানা যায় যে সে গান গায়। প্রশ্ন উঠতে পারে রঞ্জনের বর্ণনায় এই নাচ-গানের বিবরণ নাটকের পক্ষে বা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পক্ষে দরকারি কিনা। গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ছিল বলেই কি রঞ্জনও গান গাইছে না নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে গানের সম্পর্ক রয়েছে। নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল যক্ষপুরীর শ্রমিকদের জীবনে আনন্দ নেই, তারা তাদের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা নিজেদের জীবনেও অনেক সময় বাধ্য হয়ে অনেক কাজ করি যার সঙ্গে আমাদের মনের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে সে কাজ দুর্বহ হয়ে পড়ে। কর্মের সঙ্গে মনের একটি সংযোগের প্রয়োজন রয়েছে। যক্ষপুরীতে কাজ থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেও শ্রম থেকে শ্রমিককে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। যক্ষপুরীর এই বিচ্ছিন্নতাটি ফাগুলালদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন কাজের সঙ্গে শারীরিক ছন্দের একটি সম্পর্ক আছে। এর সঙ্গে সুর, শিল্পেরও সম্পর্ক রয়েছে। কাজের মধ্যে চাই ছন্দ ও সুর। সমস্ত শিল্পের আদিতে যে ছন্দ আর সুর রয়েছে তার উৎস হল কাজ। সেই ছন্দকে বাদ দিলে কাজটি সুস্থভাবে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু বর্তমান জীবনে সমস্ত কিছুই ফলভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের খবর রাখার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। কর্মীর সঙ্গে চাই কর্মের সংযোগ। এটা বোঝাবার জন্যই নাটকে রঞ্জন এসেছে। নিষ্প্রাণ শ্রমিকদের প্রাণবন্ত করার একটি পথ তৈরি করেছে রঞ্জন। এই ছন্দোময় কাজের ধারাই হল রঞ্জনের গানের ভূমিকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রসঙ্গ আসার একটি কারণ হল নাট্যবিষটিকে বোঝানো।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন তার একটা বড়ো অংশ ছিল গানের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক তৈরি করা। শান্তিনিকেতনের বাইরে গেলেও বারবার চিঠিতে জানিয়েছেন গানের পরিমণ্ডল যেন সেখানে তৈরি করা হয়। জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনি গানের কথা বলেছেন। 'রক্তকরবী'তে গান ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য কারণ হল সেখানে চারদিকে জীবনকে বাধার আয়োজন চলছে। বাধার আয়োজন 'অচলায়তন'-এও আছে বলে সেখানেও রয়েছে প্রচুর গান। অচলায়তন বা যক্ষপুরীর চারপাশের প্রাকারটি রয়েছে আমাদের মনে, সেটা ভেঙে ফেলাই হল উদ্দেশ্য এবং সেটা ভাঙার জন্যই গানের প্রয়োজন। জীবনের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর জন্যই ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদারা গান গেয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

নাটকে সংগীত ব্যবহৃত হলে সাধারণত তা কী তাৎপর্য বহন করে? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রয়োগ প্রাচীন নাট্যধারার তুলনায় কোন অর্থে পৃথক? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৯.২.২ 'রক্তকরবী' নাটকে সংগীত ব্যবহারের তাৎপর্য

'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলিতে অধিক গান ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ নাটকের মূল বিষয়টিকে ধরিয়ে দেবার মতো একটি গান ব্যবহার করেছেন। আবার কিছু বিশেষ ধরনের নাটকে চারপাশে একটি যোগ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য কিছু আবহসঞ্চারী গান সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি পরিবেশটিকে ধরে রাখে। সুতরাং দেখা গেল রবীন্দ্রনাটকে দুই ধরনের গান রয়েছে, —বক্তব্যসঞ্চারী ও আবহসঞ্চারী।

নাটকের সূচনায় ও শেষে গীত 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি নাটকের মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। এটি যেন নাটকটিকে বৃত্তাকারে বেঁধে রেখেছে। এই গান পৌষের গান, ফসলের গান। নন্দিনীর কথায়— 'পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।' এই গান আনন্দের, প্রাণের জীবনানুরাগের।

যক্ষপুরীতে খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে যে ধন নিয়ে আসে, সে সব ধলোর নাড়ির ধন— সোনা। রাজা তাঁর বিপুল শক্তি দিয়ে সেই সোনার তালগুলোকে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু সোনার পিণ্ড রাজার হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয় না, যেমন দিতে পারে ধানের খেত। তাই নন্দিনী রাজাকে মাঠে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে পৌষের রৌদ্র পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিয়েছে। মাঠের বাঁশি শুনে আকাশ যখন

খুশিতে মেতে উঠেছে তখন রাজাই বা তাঁর অদ্ভুত জালের আড়ালে বন্দী থাকবেন কেন! পৃথিবীর বুক চিরে ধন সংগ্রহের অভিসম্পাত থেকে রাজাকে আলোতে, মাটিতে বের করে আনার আকুল আহ্বান গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে 'আয়' শব্দের একাধিক প্রয়োগে। এই গান মরা-সোনার রাজ্য থেকে রাজাকে পাকা-সোনার দেশে আকর্ষণ করতে চায়। বস্তুত এই গানের মাধ্যমে নন্দিনী রাজাকে বলতে চেয়েছে যে তাঁর পরিশ্রমের ফসল আজ পরিপক্ক হয়েছে, এবার তাঁর ছুটি নেবার সময়। একটা যুগ শেষ হয়েছে, এবার তার ফসল তুলে আবার নতুন যুগের ফসল বোনা হবে। কিন্তু রাজা টিকে থাকবার জন্য মরিয়া, তিনি কোটরাগত ব্যাঙের কাছ থেকে টিকে থাকবার রহস্য শিখে নিতে চান।

যক্ষপুরীর মানুষগুলো প্রকৃতি থেকে দূরে সরে এসেছিল। গানটি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন সেইসমস্ত মানুষকে প্রকৃতির বাণী শুনিয়েছে— পরিপূর্ণতার বাণী শুনিয়েছে। এই গান বারবার ধ্বনিত হওয়ার ফলে যক্ষপুরীর নিষ্পেষিত মানুষগুলির মধ্যে মুক্তির আকাঙক্ষা দৃঢ়তর হয়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকে একেদিকে যন্ত্র মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে প্রাণ বিজয়ী হতে চেয়েছে। যন্ত্র ও প্রাণের পার্থক্যকে এই গান স্পষ্ট করেছে। অবরুদ্ধ যন্ত্রজীবন থেকে মুক্ত হয়ে অবাধ প্রান্তরের মধ্যে বাধা-বন্ধহীন জীবনযাপনের আহ্বান এই গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে। এই গান অসাড়চিত্ত মানুষগুলোর মনের ভিতরটাকে নাড়া দিয়েছে। আনন্দময় রঞ্জনের আগমনের পথটাও প্রশস্ত করেছে।

'রক্তকরবী' নাটকে এই গানটির মধ্য দিয়ে বসন্তের আগমনী ধ্বনিত হয়েছে। নাটকের এই গানটি অতীতের আবর্জনারাশি, মানুষের সমস্ত গ্লানি ও ভ্রান্তি মুছে ফেলতে চেয়েছে। শীতের কাজ ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা দিয়ে প্রাচুর্যের অধিকার সৃষ্টি করা। 'রক্তকরবী' নাটকে সেই ইঙ্গিতটাই প্রধান, —আর গানের মধ্যে দিয়ে তার আভাস পাওয়া গেছে।

নাটকের শেষে পৌষের গান আবার যখন শোনা গেছে— রাজার আত্মা তখন সম্পূর্ণ মুক্ত। অসীমের আহ্বান শুনে আত্মা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বলেই 'ধুলার আঁচল'ও আজ 'পাকা ফসলে' পরিপূর্ণ। নাটকের সূচনাংশে যে ফসলের কথা শোনা গেছে তার মধ্যে ছিল পাকা ধানের সোনার লাবণ্য। কিন্তু উল্লেখ্য যে, নাটকে এই সমাপ্তি সংগীতের ঠিক আগেই রঞ্জনের মৃতদেহ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে— 'ধুলায় রক্তের রেখা'। এবং নন্দিনীর রক্তকরবীর কঙ্কণও ধুলায় লুণ্ঠিত। উভয়ত্রই রঙটি লাল এবং তা ধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যৌবনের প্রাণের আত্মবলিদানের রক্তেই বসুন্ধরা সৃষ্টিশীলা হয়েছে। আর সেই বসুন্ধরার আঁচল থেকেই আহরিত হয় প্রেমের কঙ্কণ, যে প্রেম দুঃখের অভিঘাতে তপঃস্নিগ্ধ হয়ে আত্মার জাগরণ ঘটায়। মানুষ তার আরেক নতুন জন্মের জন্য এক আনন্দঘন মহাযাত্রার দিকে অগ্রসর হয়। কোনো ব্যক্তির আত্মিক রূপান্তর যেহেতু এক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা তাই দেখা যায় ধুলার আঁচলে রক্তের রেখা, রক্তকরবীর রক্তিমাভা। সমাপ্তি-সংগীত হিসাবে গানটির এখানে এক অন্য তাৎপর্য সূচিত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজা জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেলেন, আর সেই অর্থের সম্পদেই তিনি নন্দিনীর

অনুগামী হয়ে শেষ মুক্তির দিকে অগ্রসর হলেন। যে বসুন্ধরার আঁচল তারই আপন দানে ভরে ওঠে তা আজ জীবনের দানেও ভরে উঠল।

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটির মধ্যে একটি স্পষ্ট মাটির আহ্বান আছে। নন্দিনী রাজাকে এই গানের আহ্বানে বেরিয়ে আসতে বলেছে। কিন্তু রাজার জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসাই গানটির মূল বক্তব্য নয়। পৌষ, ফসল, মাঠ এগুলি একটি আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। নাটকের শেষেও এই গানটি আবার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাটকে গানটির গুরুত্ব আছে। 'রক্তকরবী'র বহু পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে নাটকের শেষে বিশুর গলায় এই গান ছিল। কিন্তু পরে আবার সমবেতকণ্ঠে এই গানটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিশুর কণ্ঠ থেকে গানটি সরিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক, কারণ নাটকের নায়ক বিশু নয়। বিশু ও নন্দিনীর মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকলেও এটিই নাটকের মূল কথা নয়। তাই বিশুর গাওয়া গানের মাধ্যমে শেষ হলে নাটকটি সম্পূর্ণ হত না। তাই নাটকের শেষে গাওয়ার সময় গানের কথার পরিবর্তন ঘটেছে। নাটকের প্রথমে গানের তৃতীয় পংক্তির 'ডালা যে তার' কথাটি শেষে গাওয়ার সময় 'ধুলার আঁচল'-এ পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ এর মধ্যে একটি অগ্রগতি রয়েছে। নাটকের কথা থেকে বোঝা যায় 'ডালা'র 'ধুলার আঁচল'-এ পরিণত হওয়া অনিবার্য। শেষদিকের কথোপকথন থেকেও তা বোঝা যায়। নাটকের শেষমুহূর্তে ফাগুলাল বলেছে ধুলায় নন্দিনীর রক্তকরবীর কঙ্কণ লুটচ্ছে। সেই মুহূর্তেই শোনা যায় গান—

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে,

আয় আয় আয়।

ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,

মরি হায় হায় হায়।'

এই গানটি শোনার আগে দুবার 'ধুলা' শব্দটি পাওয়া যায়। একবার ফাগুলাল বলেছে 'ধুলায় দেখছ ঐ রক্তের রেখা?' আর একবার নন্দিনী সম্পর্কে বলেছে 'ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ।' এরপরই গানের মধ্যে পাই 'ধুলা' শব্দটি। এগুলির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। প্রথম 'ধুলা'র মধ্যে রয়েছে রক্ত। এই রক্ত রঞ্জনের, এটি অবসানসূচক, তা দুঃখ দেয়। কিন্তু এই রক্ত বেদনা জাগালেও নৈরাশ্য জাগায় না, কারণ এই রক্ত বৃথা যায়নি, এতে লুটচ্ছে 'রক্তকরবীর কঙ্কণ।' তখনই এটি জীবনের দ্যোতক হয়ে ওঠে। কঙ্কণটি নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। তাই মৃত্যু এখানে একটি ব্যক্তিজীবনের অবসান হলেও সমাজের মৃত্যু নয়। এই মৃত্যু অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছে। সমস্ত শ্রমিকরা লড়াইয়ের জন্যে ছুটে যাচ্ছে। তখনই বলা হয়েছে 'ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে।' এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নতুন ফসল আসবে। ধুলার আঁচলের সঙ্গে এজন্যই ফসলের সম্পর্ক আছে। এভাবেই নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে এই গানটি জড়িয়ে রয়েছে।

'ভালোবাসি ভালোবাসি— এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি'— গানটি নন্দিনীর কণ্ঠে গীত হয়েছে। বিশু তাকে গানটি শিখিয়েছে। রাজা চরিত্রের যে পরিচয় নাটকে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, যে বস্তুকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায় তার ওপরে রাজার কোনো দরদ নেই। ভালোবাসা তো সেইভাবে বাহুর জোরে লাভ করা যায় না। অথচ রাজাও ভেতরে ভেতরে ভালোবাসারই কাঙাল। নন্দিনী তা বুঝতে পেরেছে। রাজার ভেতরকার সেই সুপ্ত ভালোবাসাকে নন্দিনী এই গান দিয়েই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। কারণ তাহলে সেই প্রেমের জাগরণের মধ্য দিয়ে রাজার ভেতরকার মানুষটাও জাগবে। নাটকে রাজার চরিত্র রূপয়নের ক্ষেত্রে গানটির তাই এক তাৎপর্যময় ভূমিকা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কিছু কিছু গান হল বক্তব্যসঞ্চারী। এই নাটকের এই গানটিকেও বলা যায় নাটকটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ এই গানটির মধ্য দিয়ে যে সমস্যা দেখিয়েছেন তা একান্তই আধুনিক কালের ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্যা যা মানুষকে স্বাভাবিক পথে যেনে বাধা দিচ্ছে। এই সমস্যা অর্থাৎ যক্ষপুরীকে ভেঙে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাটাই হল 'রক্তকরবী'র বক্তব্য। এই সংকল্পের বড়ো কথা হল মুক্তিপথের সন্ধান। নাটকের কয়েকটি সংলাপে মুক্তির কথা আছে, শেষে একটি সংগ্রামও দেখা যায়। কিন্তু সংগ্রামটি বাইরের পথ। কোনটি যোগ্য জীবনের ধারণা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বলার চেষ্টা করেছেন, —তা হল সংযোগের ধারণা। বিচ্ছিন্নতা যেখানে সেখানে পথ হল সংযোগ। একজন ব্যক্তির সঙ্গে আর একজন ব্যক্তিকে যুক্ত করে, পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সংযোগ তখনই সম্ভব যখন চারপাশের পরিবেশের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সবকিছুর মূলীভূত উপায় হল ভালোবাসা। নন্দিনীর গানেও এই কথাই আছে। তবে তার গানকে বিশ্লেষণ করলে আরো বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এখানে নর-নারীর ভালোবাসার একটি ছবি রয়েছে। এই গানটি নন্দিনী রাজাকে শুনিয়েছে। গানের কথার মধ্যে যে বেদনা আছে তা বিশুরই বেদনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। বিশু তার অতীতজীবনকে হয়তো মনে করার চেষ্টা করছে। গানের কথাগুলির মধ্য দিয়ে বিশুর কণ্ঠস্বর যেন ফুটে উঠেছে। কিন্তু নন্দিনী যখন গাইছে তখন তাতে ব্যক্তিগত দুঃখের প্রকাশ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এটি কেবল প্রেমের গান নয়। 'ভালোবাসি ভালোবাসি / এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি' —এই অবস্থা তৈরি হয় মনের পরিপূর্ণ অবস্থায়। ভালোবাসা মানুষকে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। দুইজন মানুষ যখন একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখন তাদের মনে হয় সমগ্র বিশ্ব যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত প্রেমে গভীরতর অর্থে সমগ্র জীবনের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। ফলে জীবনের প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধও জাগে। নন্দিনীও রাজার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগাবার জন্যই তাঁকে গানটি শুনিয়েছে। যে রাজার সামনে জাল রয়েছে, যিনি সবার কাছ থেকে নিজেকে হরণ করে রেখেছেন, সেই রাজাকে নন্দিনী গান শোনাচ্ছে। প্রথমে নন্দিনী রাজাকে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি গাইতে বলেছে; প্রকৃতির মধ্যে তাঁকে নামতে বলেছে। আর 'ভালোবাসি ভালোবাসি' গানটির

মধ্যে রাজাকে বলতে চেয়েছে যে তিনি যেন জল, স্থলের সমস্ত ভালোবাসা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় রাজা যাতে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন এটাই এই গানের বক্তব্য এবং গুরুত্ব।

রাজার কাছে বিশু নিজের সম্পর্কে নিজেই একটি মন্তব্য করেছে 'আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।' বিশু তির্যক ভাষায় তার আত্মপরিচয় দিয়েছে। এতে তার চরিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রা ও ফাগুলালকে সে বলেছে নন্দিনী তাকে 'ভুলিয়েছে দুঃখে'। এই দুঃখ শব্দটিও বিশুর গুরুত্বকে বুঝিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ নাটকে যক্ষপুরীর যে জীবনযাত্রা দেখা যায় সেটি একটি নষ্ট জীবনধর্ম। এর মধ্যে নন্দিনী ও রঞ্জন তাদের যৌবন-চাঞ্চল্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নন্দিনী নাটকে প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে আর তার মুখ থেকে রঞ্জনের কথা শুনি আমরা রঞ্জনের সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারি। সে ধারণার মধ্যে আছে একটি সুখের, উল্লোসের ছবি। বিশু তার বিপরীত দিকের কথা বলেছে। বিশুর জীবনধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে সে দুঃখের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনযাত্রার মধ্যে এই কথাটিই নিহিত ছিল যে সত্যিকারের জীবনযাপন করতে হলে অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয়। কবি তাঁর শেষ কবিতাতেও বলেছেন জীবনকে যে ঠিকভাবে জানতে পেরেছে, সে ছলনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জীবন কেবল সুখের আশ্রয় নয়, জীবনে অনেক প্রতিকূলতাকে সহ্য করতে হয়। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল কথাই হল জৈবিকতা বা যান্ত্রিকতা থেকে মানবিকতায় উত্তীর্ণ হবার কথা।

আমাদের শরীর কিছু স্বাচ্ছন্দ্য চায়। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে বৃহত্তর কারণে সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে আমরা বিসর্জন দিতে পারি। এই বিসর্জনের মধ্যে একটি সুখ আছে। রবীন্দ্রনাথ যখনই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তখনই সেই ধরনের মানুষদের এনেছেন যারা ব্যক্তিগত ক্ষতি সহ্য করে এগিয়ে গেছে। এরাই হল সেই ব্যক্তিরা যারা মানবধর্মে অনেক অগ্রসর। একেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে রূপায়িত করেছেন। তাই তাঁর নাটকগুলিতে একদিকে থাকে জৈবিকতায় আক্রান্ত নঞর্থক দিক, আর অন্যদিকে থাকে এর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ, সদর্থক দিক। সেই পথে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একটি ভরসা থাকা চাই। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী হচ্ছে সেই ভরসা। কিন্তু নন্দিনী যক্ষপুরীর মানুষ নয়, সে বাইরে থেকে এসেছে। বাইরে থেকে এই আনন্দধারাকে রক্ষা করা যায় কিন্তু যক্ষপুরীর এই জীবনসংকটে জীবনের আনন্দকে রক্ষা করা কষ্টকর। এই জীবনসংকটের মুহূর্তেও যে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে সে হল বিশু। সে আছে জীবনযুদ্ধের মধ্যে এবং সমবেতভাবে এ থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছে। তার সমস্যাটি একার নয়, সবার।

বিশুর মতো চরিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকে আরো পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাটকে এ ধরনের চরিত্র প্রায়ই থাকে যারা বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে জড়িত, নিজের কথা তারা ভাবে না। সব ছেড়ে দিয়ে এই জীবনের মধ্যে তারা রয়েছে যেমন, —'প্রায়শ্চিত্ত', 'পরিত্রাণ' ও

'মুক্তধারা'য় রয়েছে একটি চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'রাজা' ও 'ডাকঘর'-এ আছে ঠাকুরদা, 'ফাল্গুনী'তে বাউল। এই চরিত্রগুলির সাধারণ লক্ষণ হল এরা ব্যতিক্রমী ধরনের মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করেও এরা পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্ত নয়। স্বতস্ফূর্তভাবে তারা গান গেয়ে নেচে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। সবাইকে মাতিয়ে তোলার পদ্ধতিটা 'ডাকঘর' ছাড়া আর সব নাটকেই হল গান পাওয়া। 'জীবনস্মৃতি'র কিছু চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মনে রেখেছেন, যেমন শ্রীকণ্ঠ সিংহ, অক্ষয় চৌধুরী। এঁরা হলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁদের সান্নিধ্য আনন্দদায়ক। তারাও গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। এঁদের চরিত্র কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের সান্নিধ্যে আসার পরবর্তীতে ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পদ্মাতীরে। তখন তিনি বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখেছেন। তাদের যে কবি কতখানি পছন্দ করতেন তার প্রমাণ বিধৃত আছে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসংগীতগুলিতে। এরপর ১৯০১ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন সময়ে কবি দেখেছেন বাউলদের। এই সমস্ত আপনভোলা মানুষদের কবি মনে রেখেছেন। যার ফলে নাটকে এ ধরনের চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। 'শারদোৎসব' থেকেই এই ধরনের চরিত্রদের আনাগোনা শুরু হয়। কবি তাদের বহু সময় বৈরাগী বা বাউল নামেই চিহ্নিত করেছেন। আবার কখনো চিহ্নিত করেছেন ঠাকুরদা নামে, যাদের বৈশিষ্ট্য বাউলের মতোই। ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই ধরনের স্বতস্ফূর্ত আনন্দময় টাইপ চরিত্র দেখা যায়। সকলের সঙ্গেই রয়েছে এদের আত্মিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সূত্রেই এরা অনায়াসে সকলের নেতা হয়ে উঠতে পারে। জোর করে যারা সিংহাসনে বসতে চায় অনেক সময় তারা স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু ভালোবাসার মানুষকে সকলে রাজা বলে মানে। ঠাকুরদার মতো মানুষদের ওপরে সকলে নির্ভর করে, তাঁকে মানে। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী সেরকমই একজন নেতা। সুতরাং দেখা যায় আনন্দময় সত্তা ছাড়াও তাদের অন্য একটি স্বরূপ রয়েছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বকে প্রায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মর্যাদা দেওয়া যায়।

'রক্তকরবী'তে বিশুকে দেখে প্রথমেই মনে হতে পারে যে সেও এই বিশেষ শ্রেণির চরিত্রদেরই অন্তর্গত একটি চরিত্র। কারণ তার মধ্যেও রয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে গান গাওয়া এবং নেতৃত্বদানের ধরন। কিন্তু বহু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বিশু বৈরাগী বা বাউল শ্রেণির চরিত্র নয় কারণ বাউল বা বৈরাগী চরিত্রদের যে আনন্দময় সত্তা সেটি বিশুর মধ্যে অনুপস্থিত। যেমন 'রাজা'র ঠাকুরদা সব সময়ই উৎফুল্ল। পাঁচটি পুত্রের অকাল মৃত্যুর দুঃখকে তিনি প্রকাশ করেন না। কিন্তু বিশু সেরকম নয়, তার গানের ধরন থেকে তার দুঃখের স্বরূপটি বোঝা যায়। তার অনুগত বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকেও বোঝা যায় যে বিশুর মধ্যে একটি অস্পষ্ট চাপা বেদনা আছে। এখানেই সে আলাদা। তার মধ্যেও আনন্দ আছে; কিন্তু তা স্বতস্ফূর্ত নয়। তাছাড়া বাউল শ্রেণির চরিত্রদের কোনো ব্যক্তিগত চেহারা আমাদের সামনে নেই, তারা সকলের। তাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ইতিহাস জানতে আমাদের আগ্রহ হয় না। কিন্তু চন্দ্রার সঙ্গে বিশুর কথাবার্তার পর তার ব্যক্তিগত কথা জানতে আমরা আগ্রহান্বিত হই এবং তা পরে জানাও যায়। এই ব্যক্তিগত চেহারাটি

না জানলে বিশুকে বোঝা যায় না এবং তাকে ধনঞ্জয় বৈরাগী বা ঠাকুরদা শ্রেণির চরিত্র বলে মনে হয়। সুতরাং দেখা গেল বিশু চরিত্রের দুটি দিক রয়েছে— একটি হল ব্যক্তিগত বিশু আর অপরটি হল সামাজিক বিশু, যে সকলের জন্য কাজ করে। এখানে একটি সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। বিশু কাজ করেছে শ্রমিকদের সঙ্গে, অনেক শ্রমিকের সঙ্গে সেও শ্রমিক। কিন্তু পার্থক্য এই যে বিশু শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশি বুঝতে পারে, তার চারপাশের সংকটের চেহারাটি সে অনুভব করতে পারে। সকলেই জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারে না, কাউকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। নাটকে বিশু এই বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছে।

বিশু একসময় ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের একজন। সে সর্দার শ্রেণির ছিল। তাকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে কাজ ছেড়ে দিল এবং নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করে শ্রমিকে পরিণত হল। সে যেহেতু সর্দার স্তরে ছিল তাই সে অত্যাচারের ধরনটি বোঝে এবং শ্রমিকদের এর বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। নাটকের মধ্যে দেখা যায় শ্রমিকদের আন্দোলনের একটি প্রস্তুতি চলছে। বিশুকে বন্দী করা হলে সে নেতৃত্বের ভার রঞ্জনের ওপর দিয়ে যায়। এইভাবে বিশু এদের আন্দোলনকে গঠিত করছে কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে হবে ও তার জন্য তৈরি হতে হবে। তাই ফাগুলাল অতর্কিতে আক্রমণ করতে চাইলে বিশু তাকে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু এসব ছাড়াও বিশুর অন্তরে আর একটি গভীর স্তর আছে যেটি মাঝে মাঝে নন্দিনীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার অপূর্ণ প্রেমের পরিচয়। বিশুর গানের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের এই গভীর দিকটিকে বোঝা যায়। বিশুর আত্মপ্রকাশের একটি বড়ো উপায় হল তার গান। যার মাধ্যমে তাকে বোঝা যায়।

বিশুর কণ্ঠে নাটকে সবমিলিয়ে ছয়টি গান প্রযুক্ত হয়েছে। এই ছয়টি গানকে দুটি স্তরে সাজানো যায়। একটি স্তরে রয়েছে 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল' এবং 'শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি' —এই গান দুটি। এর বিপরীত স্তরে রয়েছে 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে', 'তোমায় গান শোনাব', 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার' ও 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে' —এই চারটি গান। প্রথম স্তরের গানদুটির মধ্যে ধরা পড়েছে নেতা ও কর্মী বিশুর চেহারাটি, অন্যদিকে বাকি চারটি গান প্রেমিক বিশুর অন্তরাত্মাকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে।

সম্পূর্ণ নাটকে বিশুর যে বিশেষ চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে তাকে বোঝার জন্য তার কণ্ঠে গীত গানগুলি সাহায্য করে। বিশুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হল সে কর্মী, শ্রমিক। সমগ্র নাটকে সে সবাইকে জাগ্রত করতে চাইছে, এখানে তার ভূমিকাটি নেতার। যে শ্রমিকরা বুদ্ধির অভাবে বুঝতে পারছে না যে তারা কী পরিস্থিতিতে আছে, বিশু তাদের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করে বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছে। চারপাশে কী ঘটছে, গোঁসাই-এর উদ্দেশ্য কী, সর্দার কেমন— এসব সে ফাগুলালদের বোঝায়। সে কখনো সংলাপের

মাধ্যমে নানা বিশ্লেষণের সাহায্যে ফাগুলাল, চন্দ্রাদের বোঝায় আবার কখনো কখনো গানের মাধ্যমে বলে। গান তখন সংলাপের ভূমিকা নেয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রায়ই গান সংলাপ হয়ে ওঠে। এই নাটকেও এই রীতি দেখা যায়। এটি কথা বলারই একটি অন্য পদ্ধতি। সেরকমভাবেই শ্রমিকদের সামনে বিশু দুবার গান গেয়েছে। একস্থানে চন্দ্রা ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি কিন্তু ফাগুলাল কিছুটা বুঝতে পেরেছে। সে নিজে বুঝিয়ে বলতে না পেরে বিশুকেই বলতে বলেছে। 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে' গানটি শুরু হবার আগে চন্দ্রা যে সুরে কথা বলছিল গানটি অর্ধেক হবার পর তার কথার সুর পালটে গেছে। গানটি সম্পূর্ণ না বুঝলেও তার ভাষায় ও সুরে এমন কিছু আছে যা চন্দ্রার বুকের তন্ত্রীতে আঘাত করেছে। সবকিছু সবসময় বুদ্ধিদিয়ে বোঝা যায় না। কিন্তু গান মাঝে মাঝে হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে আমাদের জাগিয়ে তোলে। কেন ফাগুলাল মদ খায় তা সে নিজেই বোঝাতে পারে না, তাই বিশুকে বুঝিয়ে দিতে বলে। কিন্তু বিশু অলংকৃত ভাষায় তা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। সে বলেছে মন ভোলানোকেই বলে মদ। আমরা যখন কাজে ঠাসা দিন কাটাই তখন মাঝে মাঝে অবকাশটাই হল মদ। যদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে সহজ আনন্দের উপকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় তবে সেটাই মদ। শিল্প, প্রেম, প্রকৃতি সেই মদের কাজ করে। কিন্তু বর্তমান কৃত্রিম জীবনযাত্রায় সেগুলিকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাই বর্তমান জীবনে না আছে কাজ, না আছে অবকাশ। তাই এখন মন ভোলাবার জন্য এক কৃত্রিম মদ সৃষ্টি করতে হয়। মন ভোলাবার প্রাকৃতিক উপকরণ যখন ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখনই কৃত্রিম মদের নেশার দরকার হয়। এটাই বিশুর স্পর্ধিত আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি। কিন্তু সে জানে এর ফল ভালো নয়। তাই সমস্ত বক্তব্যকে সুরে বেঁধে সে যে কথা বলে তার গূঢ়তাকে বুদ্ধি দিয়ে চন্দ্রারা বোঝে না, কিন্তু তাদের হৃদয়ে তা আঘাত করে। বিশু জানে তার কার্যকলাপ বুঝলে শ্রমিকরা তাকে সরিয়ে দেবে, তাই সে আকার-ইঙ্গিতে তার বক্তব্য পরিবেশন করেছে। এই গানটির মধ্যে একটি আহ্বান আছে। 'তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে' অর্থাৎ আমাদের মরণের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এর সঙ্গেই যুক্ত আছে সেই কথা যে, আহ্বান ছিল মরণরসের কিন্তু এখনও সম্মুখযুদ্ধে নামার সময় হয়নি। অর্থাৎ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি, তাই বিশু ফাগুলালদের ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা দিয়েছে। পরে দেখা যায় সর্দাররা বিশুর আন্দোলনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাকে কারাগারে বন্দী করেছে। তখন বিশু নেতৃত্বের দায়িত্ব রঞ্জনের ওপর অর্পণ করেছে। অর্থাৎ এখন বাইরের কাজ করবে রঞ্জন। কারাগারে যাবার সময় প্রহরীদের সামনেই বিশুরা গোপন তির্যক ভাষায় কথা বলছে।

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি—

বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক তা মাটি।।

এই গানটি গাইতে গাইতে বিশু কারাগারে গেছে। অর্থাৎ সে শ্রমিকদের একটা আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। শেষ ফলনের ফসল কেটে নিতে বলছে। এইভাবে সম্পূর্ণ নাটকে নেতা, কর্মতৎপর বিশুর চেহারাটি ধরে রেখেছে এই দুটি গান। কিন্তু এটাই বিশুর সম্পূর্ণ

পরিচয় নয়। এই অংশটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা প্রভৃতি চরিত্রদের প্রভেদ নেই, যদিও সংলাপ বা পরিবেশে পার্থক্য রয়েছে।

তবু এই স্তর পর্যন্ত তারা সমান, কিন্তু বিশু তার ব্যক্তিগত স্ফুরণে রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকের চরিত্রদের থেকে আলাদা। এখানে নেতা বহির্মুখী বিশুকে নয়, এখানে পাই প্রেমিক অন্তর্মুখী বিশুকে। এটি প্রকাশ পায় নন্দিনীর সঙ্গে তার কথোপকথনে। অন্য কাউকে সে এসব বলতে চায় না। বিশুর গাওয়া 'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ / ওগো দুখজাগানিয়া।' গানটি শুনতে শুনতে নন্দিনী বিশুকে বলেছে 'যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাই নি।' নন্দিনীর প্রশ্ন 'কোথায় তুমি গেলে বলো তো।' এর উত্তরে বিশু একটি গান গেয়েছে, 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।' এর পরের সংলাপে দেখা যায় নন্দিনী ও বিশুর মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বিশু তখন প্রসঙ্গটি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হঠাৎ রাজার প্রসঙ্গ এনেছে, যার দরকার ছিল না। আগে দেখা গেছে রাজা এগিয়ে এলে নন্দিনী সরে গেছে। আর এখানে দেখি কিছুটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ওঠার পর বিশু থেমে গেছে। এই বলা না বলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত বিশুর মানস-চরিত্রটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

বিশুর গানগুলি প্রেমের গান। নন্দিনীর প্রতি বিশুর প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তার সবকটি গানে। বিশুর গাওয়া প্রথম গান 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।' এই গান শুনে চন্দ্রার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জানা যায় যে বিশুর স্বপনতরীর নেয়ে নন্দিনী। তাকে ছেড়ে বিশু চলে যায় সুদূর ঘাটে আনন্দ থেকে অনেক দূরে। সেই আনন্দ-দূতীর সংস্পর্শে ফিরে এলেই মুক্তি ঘটবে বিশুর। বিশু যখন গায় 'ঘোমটা খুলে দাও' তখন নন্দিনীর প্রতি তার আবেদন তার প্রেমের ও প্রাণের উৎস নন্দিনীর স্বরূপকে যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করে।

'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ' —এই গানের পটভূমিতে আছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাস ও প্রাণের টান। বিশুর কাছে নন্দিনী 'ঘুমভাঙানিয়া', একইসঙ্গে 'দুখজাগানিয়া।' বিশু তার গানে নন্দিনীকে বলেছে ঘুমভাঙানিয়া, দুখজাগানিয়া, বলেছে সমুদ্রের অগম পারের দূতী' নন্দিনী আনন্দের দূতী, সুধারসের বাহিকা। তাই তার স্পর্শে বিশুর প্রাণ সুধারসে ভরে উঠেছে। নন্দিনীর প্রেমে বিশু জীবনের কোনো একটি বাণী, কোনো একটি সত্য খুঁজে ফিরছে।

'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে' —এই গানটি বিশুর জীবনের দুই প্রান্তে সংবাদ বহন করে এনেছে। বিশুর জীবনের অতীত কাহিনি এখানে গানর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। বিশুর জীবনের অতীত অধ্যায়ের শেষে কী হল আর কোন পথে সে গেল, তার অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। নন্দিনীর প্রেমের কোলে তার যে জীবনতরী বাঁধা ছিল যেখানে থেকে বিচ্যুত হয়ে ঠিকানাবিহীন গতিপথে আবর্তিত হতে হতে সে একদিন যক্ষপুরীতে এসেছে। তার মধ্যে যে অপ্রাপ্তির বেদনা সে বহন করে চলেছে তখনই নন্দিনীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কিন্তু তার ও নন্দিনীর মধ্যে আজ দুস্তর

ব্যবধান। নন্দিনীরূপ চাঁদ আজ তার জীবনের নদীতে আবার কান্নার জোয়ার এনে দিয়েছে।

'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে', বিশুর এই গান নন্দিনীর চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে এই গান নাট্যঘটনাকে স্পর্শ করে হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক আর আগামী ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। গানটির ধ্রুবপদ 'সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।' এই পদে নন্দিনীর ভালোবাসা আলোড়িত হয়ে উঠেছে। 'আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে রাতে মুখর আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।' এখানেই গানটি আগামী ঘটনার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'রক্তকরবী' নাটকে সূচনা এবং সমাপ্তিসংগীত হিসাবে একই গান কেন ব্যবহৃত হয়েছে? (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নন্দিনীর কণ্ঠে 'ভালোবাসি ভালোবাসি' গানটি কী উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বিশুর কণ্ঠের গানগুলিকে কীসের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) রবীন্দ্রনাটকে গানের ব্যবহার আমাদের কাছে কী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) 'রক্তকরবী' নাটকে ব্যবহৃত সংগীতগুলি নাটকের বক্তব্যের দিক থেকে কতটুকু সহায়ক হয়েছে এবং উপযোগী ভূমিকা পালন করেছে তা বিশ্লেষণ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার শেষে এবারে আমাদের সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করব। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটকে সংগীতের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাটকে সংগীতের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সংগীত নাটকের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু বিশ্লেষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বাক্যে যখন সমস্ত কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয় না সংগীত তখন তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক জাতীয় নাটকগুলিতে সংগীতপ্রয়োগ প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই জাতীয় নাটকে ব্যবহৃত গানগুলি নাট্যধর্মের পোষকতা করেছে। বক্তব্যপ্রধান নাটকে গীতিপরিবেশ রচনার জন্যই সংগীতের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়।

'রক্তকরবী' নাটকে নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশের জন্য সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এই নাটকে সর্বমোট আটটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের সূচনা এবং সমাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে একই গান, যা নাটকের মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। এই গান পৌষের গান, ফসলের গান। এই গানের মাধ্যমেই রাজার চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে। নন্দিনীর কণ্ঠে প্রযুক্ত গানটি ভালোবাসার মূল রূপটিকে প্রকাশ করেছে। বিশুর তত্ত্বকে প্রকাশের জন্য তার কণ্ঠে নাটকে ছয়টি গান গীত হয়েছে। এই গানগুলির মধ্যদিয়ে একদিকে বিশু চরিত্রের নেতা ও কর্মী রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে বিশুর ব্যক্তিজীবন, অন্তরাত্মা, তার দুঃখতত্ত্ব— সব মিলিয়ে প্রেমিক বিশুর চেহারাটি স্পষ্ট হয়েছে।

৯.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

মেলোড্রামা : যে ট্র্যাজেডিতে বাস্তবতা ও ঔচিত্যের অভাবের ফলে রসের বিকৃতি ঘটে এবং স্বভাবহানি হয়, সেই স্বভাবভ্রষ্ট ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২) : সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালক ও নাট্যকার। তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জীবন বাংলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাংলা নাট্যমঞ্চের সিদ্ধি ও সার্থকতা তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল। তিনি আশিটিরও বেশি নাটক রনা করেছেন। ১৮৮৯ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে তাঁর নাট্যপ্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ। সমকালের বহু রসিকজন তাকে শেক্সপিয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন, জনা, প্রফুল্ল, সিরাজউদ্দৌলা ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক।

অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) : ইনি সাহিত্য-সেবক। অক্ষয় চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রকে তাঁর বাল্য বয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা বলে উল্লেখ করিছেন। সংগীত ও কাব্য রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার ভিত্তি স্থাপনের মূলে তাঁর অন্যতম ভূমিকা ছিল।

ধ্রুবপদ : পঁচালিজাতীয় গানে যে অংশ পুনঃপুন উচ্চারিত হয় তাকে প্রাচীনকালে ধ্রুবপদ বা ধুয়া নামে আখ্যায়িত করা হত। তবে সাধারণভাবে প্রসারিত অর্থে ধ্রুবপদ বলতে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বোঝায়, —যা বারবার উচ্চারিত হয়ে বা গানের মধ্যে ঘুরেফিরে প্রযুক্ত হয়ে গানের মর্মবাণীটিকে শ্রোতার কাছে অর্থবহ করে তোলে।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ : রবীন্দ্রনাথের বাল্য বয়সের বয়স্য স্বরূপ। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এরঁ কথা উল্লেখ করেছেন। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ সিংহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

পরাবাস্তব পরাবাস্তববাদ : বিশ শতকের একটি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের ধারা। এই ধারায় মনোনিহিত বিষয়কে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের মতো উপস্থাপন করা হয়।

৯.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

৯.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-১০
রক্তকরবী
রক্তকরবী : ভাষা ও সংলাপ

বিষয় বিন্যাস

১০.০ ভূমিকা (Introduction)

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.২ রক্তকরবী-র ভাষাভঙ্গি

১০.২.১ রবীন্দ্রনাট্য-ভাষার বিবর্তন

১০.২.২ রক্তকরবী-র ভাষা : প্রসঙ্গ অলংকার প্রয়োগ

১০.৩ রক্তকরবী : নাট্য-সংলাপ

১০.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১০.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১০.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১০.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১০.০ ভূমিকা (Introduction)

সংলাপ নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। যে কোনো নাটকেরই মূল শক্তি নির্ভর করে সংলাপের উপর। নাটকে নাট্যকারকে থাকতে হয় নেপথ্যে। ঔপন্যাসিকের মতো তাঁর নিজের কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। তাঁকে হতে হয় আত্মনির্লিপ্ত। নাটকে বর্ণনার কোনো স্থান নেই। নাট্যকারের মূল বক্তব্যটি দর্শক বা পাঠকের নিকট ঘটনা বা বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমেই পৌঁছে দিতে হয়। অবশ্য আধুনিক কালে কোনো কোনো নাট্যকার তাঁদের সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তাভাবনাকে ঔপন্যাসিকের মতো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে এধরনের চেষ্টা অবশ্যই ব্যতিক্রমধর্মী। নাটক বস্তুত দৃশ্যকাব্য। অভিনয়ের সাহায্যেই এর রস সঠিকভাবে আস্বাদন করা যেতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তাভাবনা— যা অনেক সময়ই চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপের মধ্যে ধরা পড়ে না— নাট্যকার যতই বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করুন না কেন, তা দর্শকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র নাটকের পাঠকের পক্ষেই তা অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু নাটক তো শুধু পাঠযোগ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নাটকের পাঠযোগ্যতা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু যে নাটক অভিনয়যোগ্য নয় সে তার সধর্ম থেকে বিচ্যুত। তখন সেই নাটকের সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক W. H. Hudson-এর মতে নাটক এবং উপন্যাসে সংলাপের প্রধান কাজ চরিত্রবর্ণনায় সাহায্য করা। তবে উপন্যাসের সংলাপ এবং নাট্যসংলাপের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। উপন্যাসের সংলাপ চরিত্রবর্ণনার পাশাপাশি 'analysis and commentary'-তে সাহায্য করে। কিন্তু নাটকে সংলাপের গুরুত্ব আরো বেশি।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্য-সংলাপ দুরকমভাবে কার্যকরী হয়। প্রথমত কোনো চরিত্রের অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় তার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে দিয়ে তার সম্পর্কে আমরা ধারনা করতে পারি। দ্বিতীয়ত সেই চরিত্র সম্বন্ধে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মন্তব্য থেকেও আমরা সেই চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংলাপই নাটকের প্রাণ। সংলাপ শুধু নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের পরিস্থিতিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায় না, উপরন্তু ভাবী পরিণতির ইঙ্গিতও প্রদান করে। নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন বলে সমস্ত কিছুর ভার সংলাপকেই বহন করতে হয়। কাহিনি রচনা, তার অগ্রগতি, চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশ সমস্ত কিছুই সংলাপের দায়িত্ব।

নাটকের সংলাপকে সাধারণতে দুরকম ভাবে বিভক্ত করা যায়— গদ্য-সংলাপ এবং পদ্য-সংলাপ। নাট্যকাব্যে পদ্য-সংলাপ ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু গদ্য-নাটকে কবিত্বময় সংলাপ ব্যবহার নাটকের নাট্য-সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করে। আধুনিক কালের নাটকে বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার চাহিদার সঙ্গে ঔচিত্যবোধ জড়িত। তাই যে জীবন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে সেই জীবনের উপস্থাপনায় ছন্দের ব্যবহার স্বাভাবিকতার পরিবর্তে কৃত্রিমতাই সৃষ্টি করে। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটকে কবিত্বময় গদ্য-সংলাপ বা পদ্য-সংলাপ ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক জীবন অবলম্বনে রচিত নাটকে স্বাভাবিকতার দাবিতেই গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করা উচিত। গদ্য-নাটকে কবিত্বময় সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে নাট্যকারকে সংলাপ সম্পর্কে এত বেশি সচেতন থাকতে হয় যে, তাঁর পক্ষে নাটকের অন্যান্য দিকে বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। এতে নাট্যগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আধুনিক কালে কবিত্বময় গদ্য-সংলাপে রচিত নাটকের সংখ্যা ক্রমশই কমছে। এই প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়ট দুজন বিদেশি নাট্যকার সিন্‌জ ও মেটারলিঙ্কের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সিন্‌জের নাটকে কাব্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে স্বতঃসিদ্ধভাবে কিন্তু মেটারলিঙ্কের নাটকগুলি আধুনিক কালে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। কারণ এই নাটকগুলি তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির নাট্যগুণ রয়েছে, তাঁর চরিত্রগুলিও অনুজ্জ্বল নয়। কিন্তু সিন্‌জের নাটকে যেরূপ স্বাভাবিকভাবে কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে মেটারলিঙ্কের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

কবিত্বময় সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের সংলাপগুলি কবিত্বময় হওয়ার কারণ তিনি ছিলেন মূলত কবি। অ-কবির

হাতের কবিত্বময় গদ্য-সংলাপ খুব কম ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হয়। সংলাপে চেষ্টাকৃত কবিত্বের আরোপের জন্য নাট্যকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে তাঁর নাটকের সংলাপগুলি স্বাভাবিকতা হারায় এবং নাটকের গতি ব্যাহত হয়।

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় 'রক্তকরবী' নাটকে প্রযুক্ত ভাষা ও সংলাপ। ভাষা অর্থে এখানে নাটকের সংলাপের ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ নাটক মাত্রেই সংলাপনির্ভর। 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পর্বে আমরা আমাদের আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে—

- আপনার রবীন্দ্র-নাটকের ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারনা লাভ করতে পারবেন।
- 'রক্তকরবী' নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের ভাষা-ভঙ্গির রূপরেখাটি অনুধাবন করতে পারবেন।
- 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষ প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

১০.২ 'রক্তকরবী'র ভাষাভঙ্গি

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ গুলিতে আমরা নাটকে সংলাপের গুরুত্ব, গদ্য-সংলাপ ও পদ্য-সংলাপের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচিত কথাগুলো মনে রেখে এবারে আমরা 'রক্তকরবী' নাটকের ভাষায় কাব্যময়তার প্রকাশ কতটুকু ঘটেছে তা অনুসন্ধান করব, আলোচনা করব 'রক্তকরবী'র ভাষায় অলংকারবাহুল্যের প্রসঙ্গটিও। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাটকের ভাষার বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত এবং প্রাথমিক পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

১০.২.১ রবীন্দ্র-নাট্য-ভাষার বিবর্তন

রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম যুগ হচ্ছে গীতিনাট্য রচনার যুগ। এই সমস্ত নাটকে গদ্য-সংলাপ ব্যবহারের অবকাশ ছিল না। এই সব নাটকের মধ্যে তিনি যে ভাষা ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা গীতিকবিতার সমশ্রেণির। তা গদ্যও নয়, কাব্যও নয়। কবিতার রীতি অনুযায়ী এখানে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। নাট্য-কাব্যের যুগে সংলাপের পরিবর্তন ঘটেছে আবার। এতদিন ধরে সংলাপে যে সংগীতের প্রাবল্য ছিল 'রুদ্রচণ্ড'-এ এসে তার

ব্যতিক্রম দেখা গেল। এখানেই গীতি-সংলাপে প্রথম মিত্রাক্ষরের বেড়ি ভেঙে অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কিন্তু এতে যে অমিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছিল তা নিতান্তই দুর্বল। তবে পরবর্তীকালের নাট্যকাব্যের সংলাপের বীজ এর মধ্যে নিহিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সর্বপ্রথম গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় যে স্বাভাবিকতা ধরা পড়েছে তার সূচনা এখানেই। কাব্য-সংলাপের পাশাপাশি গদ্য-সংলাপ ব্যবহারের প্রবণতা এই যুগের সমস্ত নাটকেই উপস্থিত। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'মালিনী' পর্যন্ত এই যুগের বিস্তার। এই যুগের নাট্য-কাব্যগুলির সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবির হাতের সংলাপ হওয়ার জন্যই এই যুগের নাট্য-কাব্যগুলির কাব্য-সংলাপ এত সমৃদ্ধ। তবে 'লিরিকের প্লাবন' এই যুগের নাটকগুলিকে দুর্বল করেছে সন্দেহ নেই।

এই যুগের নাটকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সমস্ত নাট্য-কাব্য রচনার প্রথম দিকে সংলাপের ভাষায় কাব্য এবং গদ্য পাশাপাশি স্থান গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালের নাট্য-কাব্যগুলিতে গদ্য-সংলাপের ব্যবহার ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'মালিনী'তে গদ্য-সংলাপ একেবারেই নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ শেক্সপিয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কিন্তু প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা বা নাটকীয়তার অভাবে এবং রবীন্দ্রানাথের একান্ত গীতি-প্রবণতার প্রভাবে এই নাট্য-কাব্যগুলির সংলাপে শৈথিল্য দেখা যায়।

রূপক-প্রতীক নাটক রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের ঘাতা', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' নামে কয়েকটি কৌতুক-নাটক রচনা করেন। এগুলি গদ্য-নাটকের আদর্শে রচিত। আমাদের পরিচিত নাগরিক জীবনের পরিবেশ নাটকগুলিতে অঙ্কিত হওয়ায় নাগরিক জীবনের শিষ্ট কথ্যভাষাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবানুগ চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক কথাবার্তা প্রযুক্ত হওয়ায় এই নাটকগুলির আবেদন সহজেই পাঠক-দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। পরবর্তীকালের রূপক-প্রতীক নাটকের গদ্য-সংলাপে যে রহস্যময়তা, অস্পষ্টতা বা আলো-আঁধারি লক্ষ করা যায় তা এই পর্যায়ের গদ্য-নাটকে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নাটকগুলির ভাষা স্পষ্ট-স্বচ্ছ এবং ঋজু।

এই পর্যায়ের কৌতুক নাটকগুলি থেকেই রবীন্দ্রনাট্যে কাব্য-সংলাপের স্থান গ্রহণ করল গদ্য-সংলাপ। কৌতুক-নাট্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রহসনের ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাটক পর্যায়ের গদ্য-ভাষা বিশেষত্বহীন। তবে এই পর্যায় থেকে যে গদ্য ভাষার ব্যবহার শুরু হয়, 'শারদোৎসব' ও 'প্রায়শ্চিত্ত'-তে এসে তার মধ্যে কাব্যধর্মিতা ও অলংকারবাহুল্য লক্ষ করা যায়। রূপক বা প্রতীক নাটকে এসে এই ভাষা গভীর অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীক নাটকের গদ্যভাষা এবং সংলাপের একটি বিশেষ গুণ হল এর মিতভাষণ। 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্যে এই

বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর এই পর্যায়ের নাটকগুলির ভাষায় ব্যক্ত অংশের চেয়ে অভ্যক্ত অংশের গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়। এই পর্যায়ের নাটকগুলির সংলাপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— "রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য-ভাষার সূক্ষ্মতম বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ্য এই যুগের নাটকীয় সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগের সংলাপের প্রতিটি বাক্য সুগভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাময়। কেবলমাত্র কানে শুনিলেই ইহাদের দায়িত্ব শেষ হয়না, অন্তরের মধ্যে সুগভীর উপলব্ধি ব্যতীত ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায় না। ... রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকীয় সংলাপের অতিভাষণ এই যুগে আসিয়া এই মিতভাষণে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাব এখানে গভীর বলিয়াই ভাষা এখানে সংযত হইয়াছে।" 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'র মধ্যে এই 'সূক্ষ্মতম বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ্য' পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এনেক ক্ষেত্রে কাব্যধর্মিতা এই বাগবৈদগ্ধ্যকে আচ্ছন্ন করেছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক 'বাঁশরী'তেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সংলাপের পরিণততমরূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব কী? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কবিত্বময় গদ্য-সংলাপ নাটকের ক্ষেত্রে কী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'মালিনী' নাটক পর্যন্ত যুগের সংলাপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাটকগুলির ভাষার বিশেষত্ব কী? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

অন্যান্য ধারার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীক পর্যায়ের নাটকের ভাষার বিশেষত্ব কোথায়? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

১০.২.২ 'রক্তকরবী' ভাষা : প্রসঙ্গ অলংকার প্রয়োগ

'রক্তকরবী'তে যেসব চরিত্র দেখা যায় তাদের বাস্তবতা বা ভাবনাচিন্তাগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তাদের কথাগুলি বাস্তবসম্মত কথা কিনা, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সংলাপের সঙ্গে এই চরিত্রগুলির সংলাপের কতটা সাদৃশ্য আছে, —এই দিক্‌গুলিও এ প্রসঙ্গে বিচার্য। সাধারণত বলা হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের সংলাপে খুবই কবিত্ব ব্যবহার করেন। আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্র-নাট্য সম্পর্কে এই অভিযোগটি সত্য বলে মনে হয়। 'রক্তকরবী' নাটকের চরিত্রদের সংলাপের অলংকরণের দিক্‌টি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তারা যে ভাষায় কথা বলে তা নিঃসন্দেহে প্রতিমাকল্প। কাব্য হিসাবে পাঠ্য হতে পারে, কিন্তু নাটক হিসাবে নয় 'রক্তকরবী' সম্পর্কে এ ধরনের একটি অভিযোগ উঠেছে।

কোনো বিশেষ চরিত্রের মুখের ভাষা অলংকৃত হলে আপত্তি নেই। শুধু দেখা দরকার যে, যে ধরনের অলংকার প্রয়োগ করছে তা প্রয়োগ করার যোগ্যতা চরিত্রটির আছে কি না। সাধারণত বলা হয় অলংকার প্রয়োগের যোগ্যতা শিক্ষিত ব্যক্তির বেশি থাকে। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। সাধারণ ব্যক্তিও অলংকৃত কথা বলতে পারে এবং তার মধ্যে সেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার জগতের ছাপ থাকে।

এই কথাগুলি মনে রেখেই 'রক্তকরবী'র প্রতিটি চরিত্রের মুখের ভাষাকে বিচার

করতে হবে। তাদের অলংকারপ্রয়োগ এক কি না তা জানতে পারলেই বোঝা যাবে 'রক্তকরবী'র সংলাপ তার নাটকীয়তাকে কীভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে অথবা সমৃদ্ধ করেছে।

'রক্তকরবী'র সংলাপের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে সেখানে প্রত্যেক চরিত্রই কিন্তু অলংকৃত ভাষায় কথা বলেনি। গোকুল, চন্দ্রা, ফাগুলালদের ভাষার সঙ্গে রাজা, অধ্যাপক, বিশু প্রমুখ চরিত্রদের ভাষার একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে। রাজারা যে ভাষায় কথা বলেন তা প্রতিমাকল্প ও অলংকারবহুল।

বিশু যে ভাষায় চন্দ্রাদের সঙ্গে কথা বলে তা কিন্তু চন্দ্রারা সব সময় বোঝে না। চন্দ্রা যখন বিশুকে প্রশ্ন করে 'কোন সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই।' এখানে সুখ কথাটি কিন্তু চন্দ্রার সচেতন চিন্তা থেকে জাত নয়। এটাকে বলা যায় কথার কথা, যেখানে বক্তা সব শব্দের মানে ভেবে নিয়ে বলে না। চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু বলেছে 'ভুলিয়েছে দুঃখে।' চন্দ্রা সরলার্থে যা বলেছে তার উত্তরে বিশুর কথা কিন্তু সরলার্থে নয়। সে তির্যক উত্তর দিয়েছে। নন্দিনী তাকে সুখে নয় দুঃখে ভুলিয়েছে। যে মুহূর্তে বিশু একথা বলল তখনই চন্দ্রা তাকে বলেছে, 'বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।' অর্থাৎ সে ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি। তখন বিশু এখানে কথাটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। এখানে বোঝা যায় যে নাটকে চরিত্রদের ভাষার দুটি স্তর আছে। শ্রমিকরাও বিশু, রাজার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না, কিন্তু এদের মধ্যে ক্রমশ একটি সংযোগসূত্র বের করে নিচ্ছে। ভাষার এই যে দুটি স্তর তার একটিতে রয়েছে স্পষ্ট কথাবার্তার ধরন। অপরটি কিন্তু ততটা স্পষ্ট নয়। ভাষার এরকম বিভিন্ন স্তর রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকেও দেখা যায়।

চন্দ্রারা অন্যদের কথা বুঝতে পারছে না, কিন্তু তারাও মাঝে মাঝে এরকম ভাষায় কথা বলে। চন্দ্রার, বিশেষত ফাগুলালের কথায় কিছু কিছু অলংকার পাওয়া যায়। বিশুর কথাবার্তার নির্ভরে সেও কখনো কখনো বিশুর সাজানো কথাগুলি বলে ফেলে।

গোকুলের ভাষায় সাধরণত অলংকারের প্রয়োগ দেখা না গেলেও একবার গোকুল অলংকারময় ভাষা ব্যবহার করেছে, —যখন নন্দিনীকে সে বলেছে 'দেখে মন হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল।'

বিশু, ফাগুলাল ও চন্দ্রারা যখন কথা বলে তখন সাজানো ভাষা বিশুর মুখেই শোনা যায়। যেমন সে একবার বলেছে 'তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।' কিন্তু একবার চন্দ্রার মুখেও একটা উপমা শোনা যায়। সে বলেছে 'আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতো কিছুই নেই?' তার এই সংলাপ থেকে বোঝা যায় তুলনায় সামান্য হলেও কখনো কখনো শ্রমিকদের মুখেও অলংকৃত কথা শোনা যায়। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে চন্দ্রা গ্রামের মেয়ে, ধান, তুঁষ ইত্যাদির সঙ্গে যে আজন্ম পরিচিত, তার মুখে ধানের গায়ে তুঁষের উপমার কথা উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়। তেমনি যে গোকুল সব সময় খনির মধ্যে মশাল নিয়ে কাজ করছে তার মুখেও

'রাঙা আলোর মশাল' উপমাটি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আবার অধ্যাপক নন্দিনীকে যে বলেছেন সে যেন 'ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি', —তাকে দেখলে অধ্যাপকের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে; এই কথাটি হয়তো শ্রমিকদের মুখে অস্বাভাবিক শোনাত কিন্তু জ্ঞানমার্গের পথিক অধ্যাপকের মুখে এই কথা স্বাভাবিক।

লক্ষণীয়, এই নাটকে রক্তকরবীর লাল রঙটি বোঝাবার জন্য বিভিন্ন চরিত্রের মুখে একাধিক উপমা প্রযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক একে বলেছেন 'সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি।' গোকুল বলেছে 'তুমি রাঙা আলোর মশাল।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের উপমাই তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই সমস্ত প্রসঙ্গই নাটকের চরিত্রদের সংলাপের স্বাভাবিকতাকে ইঙ্গিত করছে।

এই নাটকে ফাগুলাল, চন্দ্রাদের মতো অনেক চরিত্র আছে যাদের সংলাপে অলংকার নেই। অর্থাৎ 'রক্তকরবী'র সংলাপ সর্বতোভাবে অলংকারবহুল নয়। তবে চরিত্রগুলির মধ্যে ভাষাগত যে একটি স্তরভেদ আছে তা নাটকের সংলাপ থেকে বোঝা যায়। যে চরিত্রগুলির ভাষা অলংকৃত যেমন রাজা, বিশু, অধ্যাপক— তাঁদের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি না, এই প্রসঙ্গে তা বিচার্য। রাজা, বিশু ও অধ্যাপকের মধ্যে চরিত্রগত প্রভেগ থাকলেও একটি শ্রেণিগত সামঞ্জস্যও রয়েছে। বিশু শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু এটা তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। আমরা জানি সে একদিন ছিল পুথি-পড়া জগতের লোক। অর্থাৎ বিশু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেছে। যদিও সে এখন শ্রমিকদের শ্রেণিভুক্ত, কিন্তু তার একটি বিশুদ্ধ মন রয়েছে। অধ্যাপকও এই পুথি-পড়া জগতের লোক। তিনি নিজেকে পুথির মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছেন। নন্দিনী রাজাকে বলেছে 'জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পারবে না।' এখানে চশমা শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে এটিকে একটি অলংকার বলে মনে হয়। অর্থাৎ রাজা খোলা চোখে দেখছেন না। কিন্তু 'রক্তকরবী'র দশটি পাণ্ডুলিপির একটিতে চশমাপরা রাজার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ এটি নিছক অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। রাজার পুথির জগতের পরিমণ্ডল বোঝাবার জন্যেই চশমার প্রসঙ্গ এসেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশু, অধ্যাপক, রাজা তিনটি চরিত্রই পুথির জগতে বিরাজমান। তাই তাঁরা কিছুটা মার্জিত, অলংকৃত ভাষায় কথা বলেন। বিশুদের অপরদিকে রয়েছে শ্রমিকরা আর মধ্যবর্তী স্তরে আছে সর্দার, গোঁসাই, নন্দিনীরা। ফাগুলালের সংলাপে অলংকার থাকলেও অধ্যাপকদের সংলাপের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। বিশুরা বলে ভারি কথা, শ্রমিকরা বলে একদম হালকা কথা আর মধ্যস্তরে রয়েছে নন্দিনীরা।

রাজা প্রমুখের সংলাপে ব্যবহৃত অলংকারের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অলংকার প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততা ও নাটকের সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকটি বিবেচ্য। এগুলি কাব্যিক অলংকার, নাট্যিক নয়। সংলাপের অলংকারকে নাটকীয় হতে হলে তাকে নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে ভিতরকার সংযোগে যুক্ত হতে হয়। এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই বলা যায় নাটকে অলংকার ব্যবহারের যুক্তিযুক্ততা আছে। কয়েকটি সংলাপকে বিশ্লেষণ করে এর যুক্তিযুক্ততা বিচার

করা যেতে পারে।

নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম সংলাপে অধ্যাপক বলেছেন 'দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো! আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা- কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ীর ধন— সোনা।' এর মধ্যের মূল কথা হল সুড়ঙ্গ থেকে খোদাইকররা উঠে আসছে, তাদের উপমা দিয়েছেন অধ্যাপক 'কীটের মতো' শব্দটি ব্যবহার করে। যে মুহূর্তে অধ্যাপক বললেন 'কীটের মতো', তখন তিনি কেবল বর্ণনা করছেন না, এর মধ্যে উঠে এসেছে তাঁর মূল্যবোধ। এই সংলাপ সাধারণভাবে যত কথা বলে 'কীট' শব্দটি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অনেক বেশি বলা হয়েছে। এর সঙ্গে আর একটি জিনিসও বোঝা যাচ্ছে, এর মধ্যে অধ্যাপকের ঘৃণা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এই সংলাপের মধ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ও বিচ্ছেদ-ভাবনা কাজ করেছে। তিনি নিজেকে তাদের থেকে দূরের মানুষ বলে মনে করছেন। অধ্যাপক নিজেও যক্ষপুরীতে স্বচ্ছন্দ নন। তাই তাঁর নিজের প্রসঙ্গেও আবার কীটের কথা এসেছে। নন্দিনী অধ্যাপককে বলেছে 'তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিন রাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?' এখানে নন্দিনী অধ্যাপককে কীটের সঙ্গে তুলনা করেছে। অর্থাৎ বাইরের মানুষের চোখে শ্রমিক ও অধ্যাপকের পার্থক্য নেই। অধ্যাপকও নন্দিনীর কথার সূত্র ধরে অলংকারকে বাড়িয়ে তুলে বলেছেন 'আমরা নিরেট-নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি।' অধ্যাপক নিজেকে পতঙ্গ বলেছেন অর্থাৎ যে ইমেজটি একটু আগে বলা হয়েছে (কীট) সেটাই আবার বলা হল অর্থাৎ ইমেজটি গতিপ্রাপ্ত হল। এই দুটি কথার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এইভাবে যে, ওরা যদি কীট অন্যরা তবে পতঙ্গ। অধ্যাপক একটি জায়গায় নিজেকেও শ্রমিকদের সঙ্গে এক করে ভাবছেন। একটি সময় তিনি শ্রমিকদের ধিক্কার দিয়েছেন কিন্তু পরে বোঝা যায় এটি বাইরের ধিক্কার, ভেতরের নয়। অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেছেন 'তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।' পতঙ্গের ডানা আগুন দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানেও এই ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠা কথাটির মধ্যে একটি মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে। সেটি হল পতঙ্গবৃত্তির মৃত্যু বা জৈবতার মৃত্যু। জীবনের যথার্থ স্ফূর্তি বা প্রকাশের দিকে তাকালে জৈবতার বা তুচ্ছতার মৃত্যু ঘটাতে ইচ্ছা করে। পতঙ্গ বা বুড়ো ব্যাঙের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আসল মানুষটি জেগে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায় কীভাবে অলংকার ব্যবহার নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

নন্দিনী অধ্যাপককে বলেছে 'আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো।' শঙ্খিনী যক্ষপুরীরই একটি নদী। উপমা সাধারণত পরিচিত জগৎ থেকেই ব্যবহৃত হয়। নাটকের মধ্যে একই উপমা কয়েকবার ব্যবহৃত হবে তা আশা করা যায় না। কিন্তু শঙ্খিনী নদীর কথাটি আবার নাটকের শেষে ফিরে এসেছে অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের

কথায়। অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে বলেছেন 'আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল। শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত।' আগে নন্দিনী অধ্যাপককে শঙ্খিনী নদীর কথা বলেছে, এখন আবার অধ্যাপক অন্যকে বলছেন। অধ্যাপকের সংলাপে সমস্ত কিছুকে পালটে দেবার কথা আছে। আগে অধ্যাপক বলেছিলেন যক্ষপুরীতে পাথর টলে না, এখন বলছেন পাথর কাত হয়ে পড়েছে। রাজা যেভাবে নিজেকে পুনর্বিচার করেছেন তারই ফলে বলা হয়েছে 'পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল।' রাজার পরিবর্তনের কথাটি সরাসরি না বলে প্রতিমাকল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা গেল সাধারণভাবে এই অলংকৃত ভাষা চরিত্রদের ভেতরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে, নাটকের অগ্রগতিতেও সাহায্য করেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

বিশু অধ্যাপক এবং রাজা এই তিন চরিত্রের মুখের ভাষা থেকে তাদের কী সামঞ্জস্য ধরা পড়ে? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

অধ্যাপক নিজেকে 'নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ' হিসাবে উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

১০.৩ 'রক্তকরবী' : নাট্য-সংলাপ

রবীন্দ্রনাট্যের সংলাপ স্বাভাবিকভাবেই নানা বিশেষত্বমণ্ডিত, 'রক্তকরবী-র সংলাপও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও সমালোচকগণ এই নাটকের সংলাপকে বিশেষ সাধুবাদ দেননি। তাঁরা এই নাটকের সংলাপের ত্রুটি হিসাবে কাব্যময় আলংকারিকতা এবং নানা অস্পষ্টতার জটিলতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'রক্তকরবী'র সংলাপে বৈচিত্র্যহীনতার

পাশাপাশি সমালোচকগণ লক্ষ করেছেন যে এই নাটকের সমস্ত চরিত্রই যেন একই ভাষায় কথা বলেছে।

বস্তুত মানুষের চরিত্রের সূত্রটি বোঝা যায় তার কথা থেকে। নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রদের বোঝার জন্য তাদের সংলাপের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। সংলাপের স্বাতন্ত্র্যই মূলত চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে সূচিত করে। আসুন উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে রেখে 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপের বিশেষত্ব বিচার করা যাক। সংলাপের বিশেষত্ব কীভাবে চরিত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকেও ফুটিয়ে তুলেছে তাও এই পর্বে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব।

নাটকের সূচনার তুলনায় শেষের দিকে আবেগের প্রাধান্য বেশি থাকায় বাক্যগঠনে নানা বিশেষত্ব এসেছে, ঘটেছে পুনরাবৃত্তি। কিশোর নন্দিনী সম্পর্কে একটি বিশেষ আবেগ পোষণ করে। আবেগের মাত্রানুসারে একই বাক্যে সম্বোধনের মাত্রান্তর ঘটে— 'শুনতে পাস জানি ... আর ফুল চাই তোমার?' পরপর তিনবার নন্দিনীর নাম উচ্চারণ করেই নাটকে তার প্রবেশ ঘটেছে। তার বাগ্‌বিশেষত্ব সম্পর্কে রাজা মন্তব্য করেছেন— 'বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য।' সাধারণভাবে সে নন্দিনীকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে, কিন্তু আবেগের আতিশয্যে তা 'তুই' তে পরিবর্তিত হয়।

অধ্যাপক যদিও নিজেকে বস্তুবাগীশ বলে আসলে তিনি রোমান্টিক। তাই তাঁর বাক্য ছন্দোময়। তাঁর সংলাপে কখনো পাওয়া যায় ছেকানুপ্রাসের ছন্দ— 'যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে।' কখনো সমান ওজনের দুটি বাক্যখণ্ড দিয়ে ছন্দ সৃষ্টি হয়— 'যেও না— ফিরে চাও।' কখনো একই শব্দের প্রথমে বিশেষণ যোগ করে ছন্দ-নির্মাণ— 'এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।' কখনো একই শব্দ দিয়ে প্রতিটি বাক্যাংশ সমাপ্ত— 'এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে— সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে।' তাঁর সংলাপে যথেষ্ট Maxim বা সারগর্ভ উক্তির ব্যবহার রয়েছে। তাঁর সংলাপ উপমা-নির্ভর। 'সোনা'কে তিনি বলেন 'ধুলোর নাড়ীর ধন'। মাটি থেকে সোনা খুঁড়ে আনাকে বলেন 'মরা ধনের শবসাধনা করা।' 'মরা' শব্দের আসঙ্গ এখানে অধ্যাপকের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'জাল' এবং 'পাখি' এই দুটি উপমান তাঁর সংলাপে শুধু প্রাধান্যই পায়নি, তাঁর চরিত্রের পরিণতিকেও নির্দেশ করেছে।

বিশুর সংলাপের একটি বড়ো বিশেষত্ব তার গান। তার গানের ভাবাংশই তার সংলাপে রূপলাভ করেছে। তার গানের মধ্যে নদী-নৌকো-হাল-পালের ইমেজ প্রাধান্য পেয়েছে। তার সংলাপে 'নেশা' শব্দটি একাধিকবার পাওয়া যায়। 'নেশা', 'মদ' প্রভৃতির নতুন অর্থও সে আবিষ্কার করেছে। তার সংলাপের মধ্যে একদিকে আছে একটি সহজ রসিকতা, অন্যদিকে নির্মম নিরাসক্তি। তার অনেক সংলাপই শেষ হয়েছে এক একটি

Maxim দিয়ে। এটি তার জীবনঅভিজ্ঞতার একটি দিক। যেমন 'মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়', 'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।' অধ্যাপকের মতো তার বাক্যও ছন্দোময়।

রাজা চরিত্রের সংলাপ বিচার্য নন্দিনীর পটভূমিকায়। তাঁর সংলাপের বৈশিষ্ট্য হল— আত্মবিশ্লেষণ, সেই বিশ্লেষণের মধ্যেই তাঁর দ্বন্দ্বের প্রতিফলন, একদিকে তাঁর দৃঢ়-মহৎ ব্যক্তিত্ব, অপর দিকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বাক্যগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রকারে প্রখর। রাজার মতোই তা আদেশ-ব্যঞ্জক। তাঁর সংলাপে কখনো ব্যক্ত হয়েছে রাজার মতোই গর্ব বা অহংকার।

রাজা নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত উপমান ব্যবহার করেছেন (পাহাড়, সরোবর, ঝরনা, মরুভূমি), এগুলি পরস্পরের বিপরীত। এই বৈপরীত্য তাঁর চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত— তাঁর চরিত্রেরই বৈপরীত্য। রাজার অনেক সংলাপই প্রশ্নবোধক বাক্য। এই সমস্ত প্রশ্নবোধক বাক্য তাঁর নিজেরই প্রতি নিজের প্রশ্ন। যেমন তিনি নন্দিনীকে বলেন 'সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে?' সহজেই বোঝা যায় যে তিনি তা পারেন না। রাজার সংলাপে এই সমস্ত বিশেষত্ব কখনোই দৃষ্টি এড়ায় না।

রাজা যথেষ্ট চিন্তাশীল। নন্দিনীকে কেন পাওয়া যাচ্ছে না, কোন পথে কীভাবে যথার্থই তাকে আয়ত্ত করা যাবে, এ বিষয়ে তাঁর কোনো ভুল পদক্ষেপ ঘটল কিনা, সবই যেন তাঁর জানা। এইজন্যই তাঁর সংলাপে 'সময়', 'লগ্ন', 'উজান-ভাঁটির' কথা শোনা যায়। আজ যে এক চমকপ্রদ 'বিপদ' ঘটতে চলেছে, তাও তাঁর সংলাপে পরিস্ফুট। রাজার সংলাপে নিজের চরিত্র এবং নাট্যঘটনার বিবর্তন দুই-ই ধরা পড়েছে।

রাজার সংলাপও ছন্দপ্রধান। এখানেও নাট্যকার নানাভাবে ছন্দ নির্মাণ করেছেন। অনেক সময়ই তাতে থাকে দুটি সমান ভাবনার অর্ধাংশ। যেমন— 'আসতে দেবনা— কী বলবে শীঘ্র বলো।' 'তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল বলেই কঠিন।' একই শব্দ বা পদগুচ্ছের আবর্তন ঘটিয়ে ছন্দ সৃষ্টির প্রবণতাও রাজার সংলাপে সুলভ— 'যাও যাও— এখনই যাও', 'আমি ক্লান্ত— ভারি ক্লান্ত'। কখনো আছে ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি— 'আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব।'

নন্দিনীর সংলাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, সব চরিত্রের সঙ্গেই তার যোগাযোগ, কাজেই তার সংলাপে বৈচিত্র্যও সর্বাধিক। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে সংলাপে নন্দিনীর বিভিন্ন মাত্রা ধরা পড়েছে। রাজার সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি বিচিত্র— সম্ভ্রম, ভয়, বিস্ময়, বিরুদ্ধতা এবং প্রীতি মিশ্রিত। সেই ভাবানুযায়ী সেখানে তার সংলাপ রচিত। বাক্যভঙ্গিও তদনুযায়ী।

অধ্যাপক বিশু এবং রাজা এই তিনজনের সঙ্গে সংলাপে নন্দিনীর বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে। বিশুর সঙ্গে তার সংলাপ পরিমাণে বেশি এবং সেই পরিমাণেই

অন্তরঙ্গতার দ্যোতক। রাজার সঙ্গে নন্দিনীর প্রথম সাক্ষাতের সময় তার সংলাপে একটি সম্ভ্রম প্রকাশক দূরত্ব ছিল। তাই তার সংলাপে অন্তরঙ্গ ভাষাভঙ্গি ফোটেনি। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে নন্দিনী রাজার মনের আরো কাছাকাছি গেছে বলেই তার সংলাপে তা ধরা পড়েছে। শেষ সাক্ষাৎকারে নন্দিনী আরো বেশি শঙ্কাহীন অবস্থায় উপস্থিত। আগের তুলনায় এখানে নন্দিনী অনেক বেশি assertive, সেজন্যই তার ভাষাভঙ্গি দ্রুত-মিশ্র-সংক্ষিপ্ত-স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। তার উক্তি— 'বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।' নন্দিনীর এই তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা রঞ্জনের মৃতদেহ দর্শনমাত্র প্রশমিত হয়ে এসেছে। রাজার ঘরে ঢোকার আগে ও পরে নন্দিনীর ভাষাভঙ্গির এই পার্থক্য লক্ষণীয়। রাজার প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করতে সে পুনরুক্তির আশ্রয় নেয়— 'রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।' (দুবার 'জাগিয়ে দাও' তার নমনীয়তার দ্যোতক) আবেগের অনুরোধে বাক্যে তার শব্দ-সজ্জা পাল্টে যায়— 'বীর আমার' (প্রত্যাশিত রীতি— আমার বীর)।

সামগ্রিকভাবে দেখা গেল 'রক্তকরবী' নাটকে চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত সংলাপ সেই চরিত্রের মানসপ্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নাট্যঘটনা পরিবর্তনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া চরিত্রগুলির মুখে প্রযুক্ত সংলাপে ধরা পড়েছে এবং নাট্য-উৎকণ্ঠা প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অধ্যাপক এবং বিশুর সংলাপে কীভাবে Maxim বা সারগর্ভ উক্তির প্রকাশ ঘটেছে? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রাজার সংলাপে তাঁর চরিত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপকে অনেকেই বলেছেন অলংকারবহুল। এই মন্তব্যের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার নিজস্ব মতামত যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) 'রক্তকরবী'র সংলাপ চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং নাট্যগুণ প্রকাশে কতদূর সহায়ক হয়েছে আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

১০.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আসুন আমাদের সামগ্রিক আলোচনার দিকে একবার পেছন ফিরে তাকানো যাক।

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সংলাপ নাটকের প্রধান অঙ্গ। নাটকে সংলাপের প্রধান কাজ চরিত্র বর্ণনায় সাহায্য করা। নাটকে কাহিনি রচনা, চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশ সব কিছুই সংলাপের উপর নির্ভরশীল। সংলাপকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়— গদ্য-সংলাপ ও পদ্য-সংলাপ। নাট্য-কাব্যে পদ্য-সংলাপ ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু গদ্য-নাটকে ব্যবহৃত কবিত্বময় সংলাপ নাটকের নাট্যগুণ ক্ষুণ্ণ করে।

রবীন্দ্রনাটকে ভাষার বিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, তাঁর নাট্যধারার প্রথম যুগ গীতিনাট্য রচনার যুগ। তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে প্রথম গদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হয়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'মালিনী' পর্যন্ত নাট্য-কাব্যগুলির সংলাপ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তাঁর কৌতুক-নাট্যগুলির সংলাপ বাস্তবানুগ এবং স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের রূপক প্রতীক নাটকের ভাষায় ব্যক্ত অংশের চেয়ে অব্যক্ত অংশের গুরুত্ব বেশি। এই পর্বের 'রক্তকরবী' নাটকে সমালোচক-কথিত 'সূক্ষ্মতম বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য' পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে।

'রক্তকরবী' নাটকের ভাষা অলংকারবহুল হলেও চরিত্রোপযোগী হয়েছে। চরিত্রের মুখে প্রযুক্ত অলংকারসমূহ তাদের পরিচিত জগৎ থেকে উঠে এসেছে। চরিত্রের মুখের ভাষাভঙ্গি প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপের আলোচনায় দেখা গেল প্রত্যেকটি চরিত্রের মানস-প্রতিক্রিয়া তাদের মুখে প্রযুক্ত সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে। বেশিরভাগ চরিত্রের সংলাপে এক ছন্দোময়তা প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপগুলি চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতিকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করছে। 'রক্তকরবী' নাটকের সংলাপ নাট্যগুণে ভরপুর। এই নাটকের সংলাপসমূহ নাটকের পরিণতির ভাবী ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

১০.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

শেক্সপিয়র : ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি প্রথম জীবনে ইংল্যান্ডের এক নাট্যশালায় কাজ করতেন, পরে নাটক লেখা শুরু করেন। বিশ বৎসরে তিনি ৩৬ টি নাটক লেখেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'টেম্পেস্ট' নাটক। তাঁর বিয়োগান্তক নাটকগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি কিছু সনেট রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি নাটক মঞ্চসফল।

সিন্‌জ (১৮৭১-১৯০৯) : আয়ারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা লাভের পর প্যারিসে প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন। কবি ইয়েটসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কবির পরামর্শে তিনি আইরিশ কৃষকদের জীবন সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'The Shadow of the Glen', 'The Playboy of the Western World' ইত্যাদি অন্যতম।

মেটারলিঙ্ক (১৮৬২-১৯৪৯) : বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। তাঁকে বেলজিয়ামের শেক্সপিয়র বলা হয়ে থাকে। ১৯১১ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করে। ১৯৩২ সালে তিনি কাউন্ট উপাধি প্রাপ্ত হন।

১০.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১০.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

একাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-১১
রক্তকরবী
রক্তকরবী : নামাকরণ ও শ্রেণিবিচার

বিষয় বিন্যাস

১১.০ ভূমিকা (Introduction)
১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১১.২ 'রক্তকরবী' : নামকরণের তাৎপর্য
১১.৩ 'রক্তকরবী' : শ্রেণিবিচার
১১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১১.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
১১.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১১.০ ভূমিকা (**Introduction**)

রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, নিজের নাট্যকর্ম বিষয়ে তাঁর এক অতৃপ্তি ছিল চিরদিনের। তাঁর নাটকগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে সেগুলিতে নানা রূপান্তর সাধিত হয়েছে। নাটকগুলির নাম নিয়ে অন্য রচনার তুলনায় তাঁর একটু বেশি অস্থিরতা ছিল। একাধিকবার কোনো নাটকের নাম পালটানো রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই এক সাধারণ ব্যাপার। আলোচ্য নাটকের 'রক্তকরবী' নাম প্রদানের পূর্বে তিনি পাণ্ডুলিপিতে এই নাটকের নাম দুবার পরিবর্তন করেছেন। পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় এই নাটকের প্রথমে নাম ছিল 'যক্ষপুরী', তারপর 'নন্দিনী' এবং শেষে এই দুটি নামই খারিজ করে রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেন 'রক্তকরবী'। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই 'যক্ষপুরী' নামটিকে অধিক সার্থক বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে 'রক্তকরবী' নামটি অধিকতর কবিতাময়। অনেকে আবার 'যক্ষপুরীর' তুলনায় 'রক্তকরবী' নামটিকেই শ্রেষ্ঠতর বলে মন্তব্য করেছেন। তবে বেশিরভাগ সমালোচকই 'রক্তকরবী' নামকরণের সার্থকতার পক্ষে মত প্রদান করেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম পরিবর্তনের প্রবণতাকে অনুসরণ করলে এই নাম পরিবর্তনের পেছনে তাঁর এক সচেতন উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়।

'গীতাঞ্জলি'র যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে বিশেষ ধারার সূত্রপাত হয়েছে সেই নাটকগুলি সম্পর্কে সমালোচকগণ Allegory, Symbolism এবং Expressionism ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপন করেছেন, যদিও সমালোচকগণ এই প্রসঙ্গে কোনো

ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে বেশিরভাগ সমালোচক রূপক-সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে রূপক-সাংকেতিক এই অভিধাই বেশি প্রযুক্ত হয়। কোনো কোনো সমালোচক এই শ্রেণির নাটকগুলিকে তত্ত্বনাটক নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণির নাটকগুলির কোনোটি সাংকেতিক বা প্রতীক, কোনো কোনোটি রূপক এবং কোনো কোনোটি সমস্যামূলক। কিন্তু এর কোনো একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ করতে পারবে। এসমস্ত নাটককে প্রমথনাথ বিসী তত্ত্বনাট্য নামে অভিহিত করে এই নামকরণের সপক্ষে জানাচ্ছেন— "তত্ত্বনাট্য' বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণির নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনীপ্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, সেই সঙ্গে আরও বুঝি যে এক শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণীগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, তত্ত্বনাট্যের বেড়াজালে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদই ধরা পড়িবে...।" 'রক্তকরবী' নাটকটিও এই সমস্ত বিতর্কের বাইরে নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলির অন্তরঙ্গ বিচারে দেখা যায় যে এই সমস্ত অভিধার কোনোটিই নাটকগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয় না। এই নাটকগুলিকে সামগ্রিকভাবে তত্ত্বনাট্য বলার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। এই নাটকগুলিকে তত্ত্বনাটক বললে তত্ত্বের বিষয়টিই সেক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠে। যে অভিনব শিল্পীরীতিকে অবলম্বন করে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধু তত্ত্বনাট্য হিসাবে এই নাটকগুলিকে চিহ্নিত করলে সেই শিল্পরীতির দিকটি উপেক্ষিত হয়, নাটক বিচারের ক্ষেত্রে নাটকের আঙ্গিক, সংলাপ, চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি বিচারকের মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গসূত্রগুলি মনে রেখে আমরা 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে পারি এবং সেই সঙ্গে এই নাটকে রূপক-প্রতীক সাংকেতিকতা অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের ছায়াপাতের প্রসঙ্গটি বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারি।

১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'রক্তকরবী' নাটক আলোচনার ক্ষেত্রে সপ্তম এবং সর্বশেষে অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণ ও এর শ্রেণিবিচার প্রসঙ্গদ্বয়। আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে—

- আপনারা 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য ও সার্থকতাকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- আপনারা নাটকটির শ্রেণিচরিত্র চিহ্নিত করতে পারবেন অর্থাৎ রূপক-সাংকেতিকতা-প্রতীক এবং অভিব্যক্তিবাদ— এগুলির মধ্যে কোনটির দ্বারা 'রক্তকরবী' নাটকটি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তা অনুধাবন করতে পারবেন।

১১.২ 'রক্তকরবী' : নামকরণের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ব্যাপারে নাম নিয়ে তাঁর অন্য রচনার তুলনায় একটু বেশি অস্থিরতা ছিল। তাঁর বিভিন্ন নাটকের নাম ও রূপের নানা সময় পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন 'শারদোৎসব' হয়েছে 'ঋণশোধ', 'রাজা' হয়েছে 'অরূপরতন', অচলায়তন' হয়েছে 'গুরু', 'প্রায়শ্চিত্ত' হয়েছে 'পরিত্রাণ'। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের অবতারণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই নাম পরিবর্তনের মধ্যে দুটো প্রবণতা আছে—

(১) নেতিবাচক থেকে ইতিবাচকে চলে যাওয়া,

(২) সাধারণ থেকে তাত্ত্বিক নামে যাওয়া।

কিছু নাটক থাকে যেখানে বক্তব্যের সঙ্গে নামের সাদৃশ্য থাকে। আবার কিছু নাটকে বক্তব্যের তাত্ত্বিক কথাটি নামের মধ্যে ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় প্রবণতাটিই রবীন্দ্রনাথের বেশি ছিল। 'অচলায়তন'-এ দেখি গুরু এসে প্রাচীর ভেঙে দিলেন। যান্ত্রিক সমাজে আলো-হাওয়া প্রবেশ করল। এখানে দেখি নাটকের নাম প্রথমে ছিল 'অচলায়তন' অর্থাৎ যা আছে অথচ যাকে ভাঙা যায় না এবং যা নেতিবাচক রূপকে ধরে রাখে। যাকে গ্রাহ্য করতে চাই না তাকে ভেঙে দিলে নতুন জিনিস আসবে, গুরু তা এনে দিয়েছেন। সুতরাং দেখি প্রথমে ছিল যাকে ভাঙতে হবে সেই নাম। দ্বিতীয়বারে যিনি ভাঙলেন তাঁর নাম দিয়ে নাটকের নামকরণ হল। 'রক্তকরবী'তেও দেখি প্রথমে ছিল নেতিবাচক নাম 'যক্ষপুরী'। একে ভাঙবার প্ররোচনা দিয়েছে নন্দিনী, তাই 'নন্দিনী' নামকরণের তাৎপর্য হল নেতি থেকে ইতিতে আসা।

সাধারণ থেকে তাত্ত্বিক নাম :

রাজা > অরূপরতন; শারদোৎসব > ঋণশোধ।

'ঋণশোধ' নামটি সম্পূর্ণ নাটকের বক্তব্যটিকে ধরিয়ে দিয়েছে। 'অরূপরতন', 'ঋণশোধ' ইত্যাদি নাম দেখেই বোঝা যায় এগুলি তাত্ত্বিক নাম। তেমনি 'নন্দিনী' থেকে 'রক্তকরবী' নামকরণটিও যেন সাধারণ থেকে তত্ত্বের দিকে গেছে। 'রাজা ও রানী'তে গল্পটি পড়ার আগে বোঝা যায় না কী ধরনের সম্পর্কের ওপর নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে। এটি একবার 'ভৈরবের বাণী' নামে নামান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই নামে একটি নেতিবাচক দিক আছে বলে পরে এর নাম হয় 'সুমিত্রা' অর্থাৎ নাটকটি ব্যক্তিনামে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রকাশকালে এর নাম হয় 'তপতী'। অর্থাৎ যার চরিত্রে তপঃশক্তি আছে। যখনই তপঃশক্তিময় মানবীকে দেখতে পাই তখনই নাটকের মূল বিষয়টি পরিষ্কার হয়। 'রক্তকরবী'টিও তেমনি। 'তপতী' যেমন সুমিত্রার চারিত্রিক রূপ প্রকাশ করে 'রক্তকরবী'ও তেমনি নন্দিনীর চারিত্রিক রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু 'তপতী' বিশেষণ হলেও 'রক্তকরবী' বিশেষণ নয়। এটি ফুলের নাম— বিশেষ্য। কিন্তু এখানে 'রক্তকরবী' বিশেষ্য-স্বভাবে থাকছে না। এটি নন্দিনীর চরিত্রের প্রতীক বা দ্যোতক হয়ে উঠেছে এবং সে সূত্রে যক্ষপুরীরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফলে এটি বিশেষ্য থেকে বিশেষণ হয়ে উঠেছে।

যক্ষপুরীতে প্রাণের যে উল্লাস পৌঁছতে চাইছে রক্তকরবী তারই প্রতীক।

'যক্ষপুরী' এই নামের মধ্যে যে ভয়-ভীষণতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পাতালরাজ্যের চিত্র মনকে অধিকার করে, তাতে একটি আলোহীন ভয়মিশ্রিত পরাভূত মানবাত্মার ছবিই প্রধান হয়ে ওঠে। এ যেন মানুষের পরাভবের পটভূমি যেখানে মানবতার শক্তি ও দীপ্তির কোনো প্রকাশ নেই। তা একটি বিশেষ পরিমণ্ডলে বিশেষ সীমায় আবদ্ধ একটি জীবন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'যক্ষপুরী' নামটি রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকের শেষাংশে ফাগুলালের নেতৃত্বে সেখানকার যে বন্দীশালা ভেঙে ফেলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য— মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে কৃত্রিমতা-যান্ত্রিকতা ভয়ংকরতা— তার অবসান; মানুষের আত্মা যে নানা জটিল জালে বদ্ধ হচ্ছিল, তার মুক্তি, তাদের মধ্যে জীবনের মুক্ত হাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করে জীবনের এক নতুন দিগন্ত প্রদর্শন করা। 'যক্ষপুরী' নামের মধ্যে এই বৃহৎ ব্যঞ্জনার আভাস নেই।

'নন্দিনী' নামটি নন্দিনী চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত। নন্দিনীর কান্না, ছায়ামূর্তি এবং গজ্জুপালোয়ানের প্রতি তার সমবেদনা, ঈশানী পাড়ার কন্যারূপে তার পরিচয়— সবই তার মানবিকতার পরিচয়বাহী, কিন্তু শেষপর্যন্ত যে বাস্তবের লৌকিক পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক ভাবময়ী সত্তায় পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই নাটকের নাম যখন রাখা হয় নন্দিনী তখন সেই নন্দিনী কোনো প্রকৃত বাস্তব নারী নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে আছে রূপ ও প্রাণের নৃত্য, যেখানে আছে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সহজ সৌন্দর্যের।' নন্দিনী যদি মূল চরিত্র হয়, নাটকের মূল কথাও তবে সেই 'সহজ সুখের সহজ সৌন্দর্যের' হওয়া উচিত। 'যক্ষপুরী' নামের মধ্যে সেকানকার অধিবাসীদের দুর্গত আত্মার ক্রন্দনের চিত্রটি উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু নন্দিনীর আনীত 'সহজ সুখের সহজ সৌন্দর্যের' প্রতিবেশটি পাওয়া যায় না।

'যক্ষপুরী' নামের তুলনায় 'নন্দিনী' নাম অবশ্যই ব্যঞ্জনাময়, এর গভীরতাও অনেক বেশি। 'যক্ষপুরী' নাম বড়ো বেশি স্পষ্ট, বেশি প্রত্যক্ষ। অর্ধেক মানবী, অনেক কল্পনা রূপে নন্দিনী আমাদের মনে অনেক বেশি সৌন্দর্যের আবহ নির্মাণ করে। 'নন্দিনী' নামটি নাটকের মূল ভাবনার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। কিন্তু 'নন্দিনী' নামটি যতই মনোরম হোক, 'রক্তকরবী' নাম সুন্দরতর। তাছাড়া নাটকের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যক্তি নন্দিনী একটি বস্তুপ্রতীকতায় এখানে উল্লিখিত, —নাটকের মধ্যে এই বিশেষ সাংকেতিকতার দিকটিই বস্তুত ব্যাপকতর হয়ে 'রক্তকরবী' নামে পরিবর্তিত। নাটকে 'রক্তকরবী' কখনো ফুলবিশেষ— সেই ফুলের মালার উল্লেখ আছে, কখনো গুচ্ছ, কখনো তা মঞ্জরী। নন্দিনীর দেহের এক এক স্থানে এক এক রূপে রক্তকরবীর অবস্থান। লক্ষণীয় যে ফুলটির নির্দিষ্ট একটিমাত্র রূপ বা অবয়ব নেই, এবং শরীরের কেবল একটিমাত্র স্থানেই তা প্রযুক্ত নয়, আর তাই এটি প্রতীক সংকেতের গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে। এক-একজন ব্যক্তির কাছেও রক্তকরবীর এক-একটি গুণ ও প্রতিষ্ঠা ধরা পড়েছে। রক্তকরবীকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম প্রতীকতায় গ্রহণ করেছেন রাজা। তিনি চেয়েছেন রক্তকরবীর রক্তিম আভাসটুকু

ছেঁকে নিয়ে তাঁর নয়নের অঞ্জন করতে। রাজা যে এই বিমূর্ত সত্তারূপে রক্তকরবী ফুলকে দেখেছেন, নন্দিনীর পরিণামের মধ্যেও সেই বিমূর্ত দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যাপকের কাছে যে রক্তকরবী কোনো আশঙ্কাজনক চিত্র অংকনের তুলিকা (সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছেন বিধাতা), গোকুলের কাছে তাই 'রাঙা আলোর মশাল', বিশুর কাছে তা এক নবভাবনার 'অরুণোদয়'। স্বয়ং নন্দিনীর কাছে রক্তকরবীর রক্তিমাভা তার সিঁথির সিঁদুর হয়ে গোধূলির রক্তিমাভা হয়ে যায়। এই রঙ রঞ্জনের অনুরাগের রং, কিন্তু রঞ্জনও তাকে 'কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী'। নাটকের সূচনায় কিশোর নন্দিনীকে যে ফুল উপহার দেয়, অবশ্যই তা 'রক্তকরবী'। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই কিশোর যখন বলে, 'সেই ব্যাথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে' —তখন তা আর প্রকৃত ও বাস্তবিক কোনো রক্তকরবী ফুল থাকে না। নন্দিনীর যারা স্ব-গোষ্ঠীর ফুলটিকে তারা দেখে এক দৃষ্টিতে, আর বিরুদ্ধে-গোষ্ঠীর লোকেরা দেখে ভিন্ন দৃষ্টিতে। কেউ স্বেচ্ছায় তার কাছে ফুল চায়, আবার কাউকে সে নিজের থেকে ফুল দেয়। নাটকের সবকটি চরিত্রকে এই ফুল একসঙ্গে বেঁধেছে, সকলেই কোনো না কোনোভাবে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রক্তকরবীর এই প্রাধান্যের মানদণ্ডেই 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণ সার্থকতা অর্জন করেছে ও সুপ্রযুক্ত হয়ে উঠেছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"এবারে রক্তকরবী পুষ্প বলিতে কবি কি বোঝেন দেখা যাক। আগেই বলিয়াছি যে, নন্দিনী ও রক্তকরবী অভিন্ন। দুয়ের স্বরূপ এক, কিংবা বলা চলে যে নন্দিনীর প্রতীক রক্তকরবীর পুষ্পগুচ্ছ।

এবিষয়ে একখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাইতেছে—

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন— দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নাই। উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, ভয় ছিল জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যতসব মানুষের রচনা কৃত্রিম অসত্য বস্তু। রক্তকরবীতে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাই নি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ ক'রে একটি সুকুমার করবীশাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী', 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্তি হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।"

[রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ : প্রমথনাথ বিশী]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'গীতাঞ্জলি'র যুগ থেকে শুরু হওয়া রবীন্দ্র-নাট্যধারাকে 'তত্ত্বনাটক' নামে অভিহিত করার কারণ কী? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকের ক্ষেত্রে 'যক্ষপুরী' ও 'নন্দিনী' এই নাম দুটি পরিবর্তনের কারণ কী? (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

রক্তকরবী ফুলটি নাটকে কীভাবে নন্দিনীর বিমূর্ত সত্তা হয়ে উঠেছে? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

১১.৩ 'রক্তকরবী' : শ্রেণিবিচার

'রক্তকরবী' নাটক প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় রূপক-প্রতীক-সাংকেতিক ইত্যাদি অভিধাগুলো প্রযুক্ত হয়েছে। উপস্থাপনরীতির ভিত্তিতে আমরা রূপক-প্রতীক-সংকেত ইত্যাদি প্রসঙ্গের স্বরূপ ও সীমানা নির্ণয় করে 'রক্তকরবী' নাটকের শ্রেণিচরিত্র অনুধাবন করতে পারি।

বাংলায় একটি বিশেষ অলংকারের নাম রূপক। এই অলংকারে উপমা ও উপমেয় এই দুটি ভিন্ন বিষয় একেবারে কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু রূপক নাটক বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে রূপক অলংকারের সম্পর্ক নেই। যদিও উৎসটি এক। অনেক সময় আমরা কোনো কথা বলতে গেলে তার মূল শুকনো কাঠামোটিকে ঢেকে রেখে তারই

তুল্য একটি সাজানো সুন্দর কথা দিয়ে তাকে প্রকাশ করি, এটিই হল রূপক। রূপকের এই সাজটি মূল বক্তব্যের সঙ্গে প্রতি বিন্দুতে মিলে থাকে। বক্তব্যের এই যে আড়ালটি, একে সরিয়ে দিলে যে কথাটি পাই সেটিই মূল কথা। ভেতরে রয়েছে রূপ, বাইরে রূপক। যা রূপকে আড়াল করে রাখে তাই হল রূপক। রূপকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Allegory। এটি সাহিত্যের একটি বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি। বহুদিন ধরেই সাহিত্যে এই ব্যবহারের রীতি চলে আসছে। দান্তের Divine Comedy-তে প্রেতলোক, শুদ্ধিলোক ও স্বর্গলোক এই তিনটি অংশ আছে। কবি যেন এই তিনলোকে এক যাত্রায় চলেছেন। এই যাত্রার বর্ণনাটি আসলে আমাদের জীবনেরই কিছু অভিজ্ঞতার কথা। একে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের রূপকে বলা হয়েছে। জোনাথন সুইফ্‌ট-এর 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্' ও একরম একটি বিখ্যাত রূপক গল্প। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকের ইউরোপের সমাজের এক গুরুতর সমালোচনা এই গল্পে রূপকের সাহায্যে বলা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' যেটি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলায় 'বোধেন্দুবিকাশ' নামে অনুবাদ করেছিলেন, একটি যথার্থ রূপক গ্রন্থ। দয়া, মায়া, ক্ষমা ইত্যাদিকে এখানে রূপকে আভাসিত করা হয়েছে। যাত্রায় সব সময়ই বিবেক নামে একটি চরিত্র থাকে, সে আসলে কোনো ব্যক্তি নয়, সে হল মানুষের মনের ভাবনাচিন্তার রূপক। অক্ষয় দত্তের 'স্বর্গদর্শন' প্রবন্ধ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'ও একরকমই রূপক কবিতা। রবীন্দ্রনাথও কিছু রূপক কবিতা ও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'সাগরিকা' কবিতাটি রূপক। এনে ভারতবর্ষের সঙ্গে জাভা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধকে কবি নরনারীর প্রেমের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর রূপক গল্পের মধ্যে 'তোতাকাহিনী' উল্লেখযোগ্য। এর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটি হল শিক্ষা ব্যবস্থার রূপক। 'তাসের দেশ'ও সেরকম একটি রূপক নাটক। সেখানে হরতন, চিড়েতন প্রভৃতির আড়ালে আমাদের শুকনো নিয়মতান্ত্রিক প্রাণহীন সমাজকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যেও রূপকের উদাহরণ আছে।

রূপকের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে—

(১) রূপ ও রূপকের প্রতিটি বিন্দু মিলে থাকে।

(২) সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটিকে ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝতে হয়। এর আবেদন বুদ্ধির কাছে।

(৩) প্রায়ই রূপক বুঝিয়ে দেয় যে সে রূপক। যেমন— যে মুহূর্তে 'তাসের দেশ'-এর হরতন, চিড়েতন-রা কথা বলে তখনই বোঝা যায় যে এটি স্বাভাবিক নয়। এর মধ্য দিয়ে অন্য কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ রূপক স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় যে সে অন্য কথা বলতে চাইছে। পাঠকও সচেতনভাবে তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝে নেন। এই হল রূপক।

রূপক নাটক বলতে বোঝায় বিশেষ এক ধরনের রচনা, যাতে কাহিনি, পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতি উপায় বা উপলক্ষ মাত্র, এবং লক্ষ্য হচ্ছে কোনো ভাব বা বস্তু।

রূপকে সাধারণত দুটি অর্থ লক্ষ করা যায়— একটি উপাখ্যানের এভং অপরটি উপাখ্যানোতীত ভাবের। রূপকে বাইরের উপাখ্যানটি উপলক্ষ মাত্র। এই উপাখ্যানের অন্তরালে আরেকটি প্রচ্ছন্ন আখ্যানভাগ থাকে এবং সেটিই আসল অর্থ। রূপক রচনার উদ্দেশ্য কোনো নীতিকথা প্রচার অথবা কোনো ভাব বা কোনো তত্ত্বকে সরসভাবে রূপদান করা।

বাংলা কাব্য, নাটকের আলোচনায় অনেক সময় সমালোচকরা প্রতীক, সংকেত এগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন না। যেমন অনেক সময়ই রূপক অর্থে প্রতীক নাটক ব্যবহার করেন। কিন্তু রূপক ও প্রতীক সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতীক ও সংকেত এই শব্দ দুটি সমার্থক। ইংরেজিতে একে বলা হয় Symbolic। কবিতা নাটক এমনকি গল্প উপন্যাসও প্রতীক হতে পারে। যাকে সাংকেতিক বা প্রতীকীও বলা যায়।

রূপকে যেমন একটি বস্তুর ওপর আর একটিকে চাপানো হয়, প্রতীক তা নয়। প্রতীক একটি ইঙ্গিত করে কিন্তু তাকে সরানো যায় না। যেমন কাউকে ফুল উপহার দেওয়া হল, সামাজিক অর্থে ফুলটির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু ফুলের মধ্য দিয়ে তার আনন্দ-রূপটি ফুটে ওঠে। কিন্তু ফুলটিকে সরানো যায় না। অথচ এটি তার নিজস্ব বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তাকে অতিক্রম করে যায়। রূপক যেমন আমাদের সচেতনতার দিকে নিয়ে যায়, প্রতীক তেমন সচেতনতায় নিয়ে যায় না। সে মনের মধ্যে একটি আবহ সৃষ্টি করে। প্রতীক অসচেতনভাবে মনকে প্রভাবিত করে। 'রং' প্রায়শই প্রতীক হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল রং আনন্দের প্রতীক, চাপা রং বিষাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতীকের সাহায্যে একটি সামান্য বস্তুকে অসামান্য করে তোলা হয়, অথবা অল্প কথার দ্বারা বেশি কথাকে বোঝানো যায়। প্রতীককে বোঝার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোধ বা হৃদয়ের প্রয়োজন হয়। সাধারণত আমাদের একটি ধারণা রয়েছে যে যেখানে প্রতীক ব্যবহৃত হয় সেটাই প্রতীকী, কিন্তু তা ঠিক নয়। যতই দিন যাচ্ছে ততই সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। অল্প কথায় অনেক কথা বলা হচ্ছে। তরী বা নৌকা কীভাবে সমগ্র জীবন-সন্ধানের প্রতীক হয়ে ওঠে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায়। কিন্তু প্রতীক আছে বলেই সেগুলি প্রতীকী হয়ে যায় না।

একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে প্রতীক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে রোমাণ্টিক সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলে এর বিপরীতে Realism এল, আবার তার বিপরীতে এল Naturalism। তাতে যা ঘটছে তার হুবহু চিত্র পাওয়া গেল। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই হল প্রতীকবাদ। এভাবেই ১৮৮০-১৯১০ -এ ইউরোপে প্রতীকবাদের আন্দোলন শুরু হয়। প্রতীকবাদে মনে করা হয় সত্য আছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার বাইরে। রোমাণ্টিসিজমের সঙ্গে প্রতীকবাদের সাদৃশ্য আছে। তাঁরা বলেন সত্যকে ছোঁয়া যায় না। এই অধরা সত্যকে বোঝাবার জন্যই চাই চিহ্ন বা প্রতীক। সত্যকে বলার বা জীবনকে স্পর্শ করার একমাত্র অবলম্বন হল প্রতীক।

জীবনের সত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নয়, অধরা জগতে রয়েছে। বোধের জগতে সত্যের অধিষ্ঠান। এই সত্যকে স্পর্শ করার জন্যই প্রতীক দরকার। এটি একটি উপকরণ। যাঁরা মনে করেন প্রতীক ছাড়া বোধকে ছোঁয়া যায় না তাঁরা হলেন প্রতীকবাদী। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটককে প্রতীক নাটক বলা যায়। 'তাসের দেশ'-এ যেমন ওপরের কথাটিকে সরালে একটি অন্য বক্তব্যকে পাওয়া যায়, 'ডাকঘর'-এ কিন্তু সেরকম কিছু পাওয়া যায় না। রুগ্ন কিশোরের পৃথিবীকে ভালোবাসাটাই হল 'ডাকঘর'-এর মূল বক্তব্য। ডাকঘর, রাজা, রাজার চিঠি এসব হল প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এসব প্রতীকের সাহায্যেই আধ্যাত্মিক জগতে তিনি পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং দেখা গেল 'তাসের দেশ' হল রূপক, 'ডাকঘর' হল প্রতীক নাটক।

অনেক সমালোচক Symbol-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন সংকেত। কিন্তু সংকেত এবং প্রতীক সমার্থক নয়। কারণ সংকেত সর্বত্র নির্দিষ্ট অর্থেই শেষ হয় কিন্তু প্রতীকে সংকেতিত নির্দিষ্ট অর্থের পরও অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়।

রূপকে একটি অর্থ অপরটিকে সংকেত করে। তার দুটি অর্থই স্পষ্ট। কিন্তু প্রতীকে স্পষ্টার্থের অতিরিক্ত যে অর্থ তা অনেক সময় ব্যঞ্জনায় পর্যবসিত হতে পারে। এই জগৎ ও জীবন ব্যাপ্ত করে যে অসীম চিরন্তন সৌন্দর্য বিরাজিত, প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের অন্তরতম সত্তা তার স্পর্শ পায়। প্রতীকের সীমাবদ্ধ মাধ্যমে রূপলাভ করে অসীম বা অনন্ত আমাদের নিকটে আসে। ইয়েট্‌সের মতে প্রতীক জাতীয় রচনায় যে বক্তব্য তুলে ধরা হয় তা অনুধাবন করার জন্য সহজাত সংস্কার প্রয়োজন। আর রূপক-রচনার বক্তব্য বোঝার জন্য সঠিক জ্ঞানই যথেষ্ট। প্রতীকের আবেদন আমাদের অনুভূতির কাছে, কল্পনার কাছে। এই বস্তুজগতের বাইরে যে সত্য বিরাজমান তাকে রূপের মধ্যে ধরবার প্রয়াসই হচ্ছে প্রতীকের প্রধান কাজ। প্রতীক নাটকের আখ্যানভাগ, চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা নানা ইঙ্গিতে সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের আভাস আমাদের চিত্তে এনে দেয়।

প্রতীক রচনায় সবসময় আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বিত নাও হতে পারে। আধ্যাত্মিক বা পরাতত্ত্ব সাহিত্যের বিষয় না হলেও তা প্রতীক সাহিত্য হবে পারে। অনেক বাস্তবনিষ্ঠ নাট্যকারও তাঁদের নাটকে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। ইবসেন ও চেখভের নাটকে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেসব নাটকে প্রতীক প্রয়োগের বাহুল্য থাকবে এবং প্রতীক রীতি হিসাবে অপরিহার্য মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করবে সেই সব নাটককেও প্রতীক-নাটকের মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রতীক ব্যবহৃত হলেই বা প্রতীক প্রযুক্ত হলেই তা প্রতীক নাটক হয় না। কারণ অনেক রিয়ালিস্টিক বা বাস্তবনিষ্ঠ নাটকেও প্রতীকের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এজনই ইবসেনের 'The Doll's House'-এ প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও তা প্রতীক নাটক নয়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

রূপক এবং প্রতীক বলতে কী বোঝায়? (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

প্রতীক এবং সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

রূপক এবং প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য কী? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

রূপক, প্রতীক এগুলিকে 'রক্তকরবী'র ওপর ব্যবহার করা যায় না, কারণ এটি যদি রূপক হয় তবে বুঝতে হবে নাটকটির কাহিনি এবং চরিত্রদের কোনো স্বাভাবিক মানবিক অস্তিত্ব নেই, তারা অন্যকিছুর রূপক রূপে দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা নাটকটিকে রূপক বলেন তাঁদের কাছে রঞ্জন, নন্দিনীরা কোন হৃদয়বৃত্তির রূপক, তা বিবেচনার বিষয়। আমাদের জীবনের এক একটি ভাব নিয়ে যেন নাটকটি চলছে এবং সেসবের অনুষঙ্গ হল চরিত্রগুলি। তারা যেন যাত্রার বা বিবেক বা নিয়তির মতো। যাকে দেখা যায় না তাকে যেমন মানবরূপ দিয়ে দেখার একটা আয়োজন চলে বিবেকের মধ্যে, তেমনি রঞ্জন, নন্দিনী, বিশুরাও আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের চরিত্র নয়। রূপকের দিক থেকে বলা যায় রাজা হলেন মানুষের সঞ্চয়বৃত্তির রূপক, নন্দিনী আনন্দের রূপক, রঞ্জন যৌবনের রূপক, বিশু দুঃখময় জীবনের রূপক, সর্দাররা শক্তিময় জীবনের রূপক। কিন্তু এভাবে প্রতীক জীবন থেকে সরিয়ে নাটকটিকে একটি ভাবনার জগতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন যে নাটকটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি, কারণ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন নাটকটি কোনো রূপক বা তত্ত্বকথা নয়, আমাদেরই চারপাশ থেকে পাওয়া জীবনের ছবি। শুধু একটু অন্যভাবে সাজানো হয়েছে।

অনেকের মতে রঞ্জন ও রাজা একই ব্যক্তি। যাঁরা চরিত্রগুলিকে মানুষ বলে ভাবেন না তাঁরাই একথা বলেন। তাঁরা তাদের চরিত্র হিসাবে না দেখে একটি ধারণা বা আইডিয়া রূপে দেখেন। আসলে মানুষের মুক্ত স্বাভাবিক যৌবনের রূপ আছে রঞ্জনের মধ্যে আর

অবরুদ্ধ যৌবন অর্থাৎ নঞর্থক দিকটা আছে রাজার মধ্যে। রাজা যখন জীবনের ইতিবাচক দিকে এসে পৌঁছান তখন যৌবনের রূপটি তাঁর মধ্যে দেখা যায় বলেই তখন আর রঞ্জনকে দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রঞ্জন, রাজা দুজনেই যৌবনের প্রতীক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এই দুজনকে আলাদা চরিত্র আলাদা ঘটনা হিসাবে দেখা দরকার। তবে 'রক্তকরবী'তে অল্পস্বল্প রূপক নাটকের বৈশিষ্ট্য কোথাও কোথাও অবশ্যই আছে। রাজার সামনের জালের আবরণটি রূপক। সবাই জালের বাইরে থেকে রাজার সঙ্গে কথা বলছে। এর মধ্যে একটি অস্বাভাবিকতা আছে। রূপক সব সময়ই নিজেকে চিনিয়ে দেয়। জালটিও যে রূপক তা অধ্যাপকের 'আমিও আছি জালের আড়ালে'— এই কথা থেকে বোঝা যায়। নাটকের সব চরিত্রই কোনো না কোনো জালের আড়ালে আছে। কিন্তু জালগুলি দেখা যায় না। নাটকে মৃত ব্যাঙ রূপক হিসাবে এসেছে। যখন রাজা বলেন তিন হাজার বছর ধরে ব্যাঙটি টিকে ছিল তখন এতে রূপকের মাত্রা আরোপিত হয়। তিন হাজার বছর বলার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, এটিকে রূপক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এরকম দুএকটি রূপক থাকলেও সম্পূর্ণ নাটকটি রূপক নয়। এখানে যে কাহিনি ও চরিত্রগুলি আছে সেগুলির যদি নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে তবে তা রূপক নয় এবং সে অর্থে নাটকটিকে রূপক বলা যায় না।

সম্পূর্ণ নাটকটিতে প্রচুর প্রতীক আছে। অর্থাৎ এমন অনেক কথা বা বস্তুর উল্লেখ আছে যেগুলি একইসঙ্গে অনেকরকম ভাবনায় নিয়ে যায়। এমন ধারণা তৈরি হবার অনেক ইঙ্গিত নাটকে আছে। নন্দিনী যেদিন বিছানায় নীলকণ্ঠপাখির পালক পাবে সেদিনই বুঝবে যে রঞ্জন আসবে। এর মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তবু সে একথা ভেবে নিয়েছে, এটি তার ইচ্ছা। ইচ্ছার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই। নীলকণ্ঠপাখির মধ্যে একটি সৌন্দর্যের দ্যুতি আছে। অর্থাৎ নীলকণ্ঠের মধ্যে সৌন্দর্যের মুক্তি ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে অসম্ভবতা নেই। একে সরানো যায় না, কিন্তু এটি একটি বৃত্ত থেকে আমাদের মুক্তি দেয়, ছোটো জায়গা থেকে অনেক বড়ো জায়গায় নিয়ে যায়। নাটকে নীলকণ্ঠপাখির সঙ্গে বাজপাখিরও কথা আছে। নন্দিনী দেখেছে রাজা বাজপাখিকে আদর করছেন। নন্দিনী একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি অবসর সময়ে বাজপাখিকে আদর করে তার চরিত্রের জটিলতা ও ভয়ানক ভাবটি দ্যোতিত হয়ে ওঠে। এই ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছবিটির থেকেও অনেক বেশি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বাজপাখিটিও তেমনি একটি প্রতীক। আবার নন্দিনী আনন্দ করে ঘুরে বেড়ায়, তার সম্পর্কে অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে বলেছেন ধানী রঙের শাড়ি পরে সে যাচ্ছে। ধানী রং বলার সঙ্গে সঙ্গে ধান, মাঠ ইত্যাদির একটি ছবি ভেসে ওঠে। এটি একটি আবহ সৃষ্টি করেছে। তখনই ধানী রংটি একটি প্রতীক হয়ে ওঠে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'— গানটি মাঠের ছবি তুলে ধরেছে। একদিকে রাজার স্বর্ণভাণ্ডার অপরদিকে খোলা মাঠ— এগুলি চিহ্নিত করার জন্যই বহু টুকরো টুকরো প্রতীকচিহ্ন নাটকে এসেছে। নাটকের সবচেয়ে বড়ো প্রতীক হল রক্তকরবী ফুল। নন্দিনী বলেছে এর মানে সে জানে না। এই ফুল সে হাতে গলায় পরেছে, তার মধ্য দিয়ে সে রঞ্জনের ভালোবাসাকে অনুভব করেছে।

এটি যেন ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। নাটকের নামকরণও হয়েছে এই প্রতীক ফুল দিয়ে। কিন্তু বেশ কিছু প্রতীক থাকলেই তাকে প্রতীকী নাটক বলা যায় না। প্রতীকের একটি উদ্দেশ্য বা বক্তব্য থাকে। একটি বিশেষ গঠন থাকে। প্রকৃতির রহস্যে পৌঁছাবার উপায় হল প্রতীক। অধরাকে ছোঁয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতীক ব্যবহৃত হয়। 'ডাকঘর'-এ এর ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এদিক থেকে 'রক্তকরবী' কোনোভাবেই প্রতীক নয়। নাটকের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট। ১৯১৪-১৯১৮ পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীর সভ্যতার সংকটকে দেখাবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লিখেছেন। ফলে এ নাটকের উদ্দেশ্য, বিষয় বা বক্তব্য একেবারেই সমকালীন সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর মধ্যে কোনো আলোছায়ার ব্যাপার নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতীকী রচনার স্বাভাবিক ধর্মের অনেক বাইরে এর অবস্থান। সুতরাং দেখছি এটি রূপকও নয়, প্রতীকও নয়।

প্রমথনাথ বিশী 'রক্তকরবী'-র শ্রেণিবিচারের ব্যাপারে জটিলতা দেখে একে 'তত্ত্বনাটক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে জটিলতা কম। সমালোচকরা যদি মনে করেন কোনো সাহিত্যকে কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্গত করা উচিত, তবে বলতে হয় 'রক্তকরবী' রূপক বা প্রতীক নয়, অন্য একটি শ্রেণির সঙ্গে জড়িত। এটি expressionist বা প্রকাশবাদী নাটক। ইউরোপ বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধরনের নাটক সৃষ্টি হয়। প্রকাশবাদী নাটকের সঙ্গে 'রক্তকরবী'র যোগ অনেকটা স্পষ্ট। নাটকটি সাম্প্রতিককালের ঘটনা নিয়ে রচিত হলেও নাটকটির চরিত্র ও গানের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যার ফলে নাটকটি অন্য নাটকগুলি থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে। লক্ষ করা দরকার কীভাবে সম্পূর্ণ নাটকটি একটানা চলেছে, এর মধ্যে অঙ্ক, দৃশ্যের বিভাগ নেই। কিন্তু নাটকটি একটি স্থানে তো নিশ্চয়ই ঘটেছে। মঞ্চে অভিনয়ের সময়ও একটি Set বা স্থান দেখানো হয়। ঘটনারও কিছু সময় থাকে। এই নাটকের কাহিনিতে কতটা সময় আছে তা বিচার্য।

পৃথিবীর নাটকের ইতিহাসে বিংশ শতকে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এ শতাব্দীর সূচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার ২৫ বছর পর আবার একটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি জীবন সম্পর্কে ধারণাকে বদলে দিল। জীবন সম্পর্কে ধারণা বদলে গেলে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পের রীতি, প্রকাশ, শিল্পরূপ, বলার ভঙ্গি বদলে যায়। শিল্পরূপের এই পরিবর্তনকে মনে রেখে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপন্যাস, নাটক ইত্যাদিকে দেখলে বোঝা যায় পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এগুলিকে আর বিচার করা যায় না। যার ফলেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসকে পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে সমালোচকরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রেও ১৮৮০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত প্রতীকবাদ নামে এক শিল্প-আন্দোলন শুরু হয়। তখন থেকে নাটকের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মেটারলিঙ্ক প্রমুখ প্রতীকী নাটক লিখেছেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপের নাটকে প্রকাশবাদ বা Expressionism নামে এক নতুন আন্দোলন শুরু হয়। চিত্রকলার জগতে যে পরিবর্তন Expressionism নামে চিহ্নিত হয়েছিল তাই পরে নাটকে এসেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকাল থেকে পনেরো বছর ধরে এই আন্দোলন চলছিল। বহু নাট্যকার এর মধ্যে ছিলেন।

Kaiser, Taller সব বিখ্যাত নাট্যকাররা এমন নাটক লিখলেন যার সঙ্গে প্রাচীন নাটকের সাদৃশ্য নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ধ্বংসকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। মানুষের সমাজ, স্বপ্ন সব যেন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোনো বন্ধন ও সত্য নেই এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যন্ত্র যেভাবে বিকশিত হচ্ছিল তার ফলে মানুষও যেন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছিল। সে সময় এক যান্ত্রিক যুগ সৃষ্টি হচ্ছিল। এই যান্ত্রিকতার ফলে সভ্যতার এক সংকটের কাল উপস্থিত হল। Kaiser, Taller প্রমুখের নাটকের বিষয়বস্তু ছিল নতুন যন্ত্রসভ্যতার সংকট ও তা থেকে উত্তরণ। তাঁরা যেভাবে নাটক লিখলেন তাতে পুরোনো নাটকের গঠনের মতো পরম্পরাভিত্তিক Plotকে চুরমার করে দেওয়া হল এবং তা করতে গিয়ে নাটকে সময়ের ধারাবাহিকতাকে ভাঙা হল। নাটকের স্থান কালের কোনো যুক্তি রক্ষা করা হল না। তাই তাঁদের নাটকে কোনটা কখন ঘটছে তা বুদ্ধি-যুক্তির দৃষ্টিতে সংগত নয়, মনে হয় যেন কিছু অসংগতি রয়েছে, কোনো পারম্পর্য নেই। যে যে চরিত্রগুলিকে নাটকে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোনো ব্যক্তিনাম নেই। এসব নাটকে চরিত্রগুলি প্রায়ই the man, the woman এসব নাম বা সংখ্যা এই পরিচয় নিয়ে আসে। এরা প্রায়ই ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে নয়, কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আসে। এর ফলে মূল নাট্যবিষয়কে ধরার জন্য প্রভূত পরিমাণে প্রতীক বা Symbol ব্যবহৃত হয়। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আধুনিক যান্ত্রিক যুগের বিচ্ছিন্ন মানুষের সমস্যা। এই বিষয়কে ধরতে গিয়ে প্রাচীন নাটকের গঠনকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। চরিত্ররা সংখ্যা বা শ্রেণি-নাম নিয়ে এসেছে, তারা প্রতিনিধি চরিত্র— ব্যক্তিগত নয়। এসব নাটকে স্থান, কাল পর্যুদস্ত হয় এবং প্রতীক ব্যবহৃত হয়। এগুলি হল প্রতীক নাটকের বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয়, প্রতীক নাটকের সব বৈশিষ্ট্যই 'রক্তকরবী'র সঙ্গে মিলে যায়। 'রক্তকরবী'তেও আছে যান্ত্রিক যুগের সমস্যা, তাতে গল্প বলার পুরোনো ধরনটি নেই। সংখ্যানামে চরিত্ররা চিহ্নিত, তারা প্রতিনিধিমূলক; স্থান কালের পারম্পর্য নেই এবং প্রতীক আছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

সাহিত্যের দিক থেকে 'stream of consciousness'-কে Expressionism-এরই একটি বর্ধিত-বিবর্তিত রীতি বলে মনে করা হয়। এই নাট্যধারার মধ্যে একদিকে যেমন চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থাকে, বাহ্যবাস্তবতার বদলে যেমন 'আন্তর বাস্তবতা' প্রাধান্য পায়, নাটকও তেমনি মানব মন ও জীবনের গভীর তলদেশের দ্যোতক হয়, একে তাই 'innerdrama' বলা হয়। যে সব Image-Icon-Emblem এতে থাকে তা একাত্মই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু তার খুঁটিনাটির বর্ণনা নেই। ব্যক্তিচরিত্রগুলির ব্যক্তিগত পরিচয় অপেক্ষা তারা যে সমাজ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজ-গোষ্ঠীর সমষ্টিগত মানুষ রূপে তাদের পরিচয় ব্যক্ত হয়। হয় কোনো মন্ময় জগতের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি রূপে, নাট্যকারের নিজস্ব অর্ন্তদৃষ্টির ছায়া রূপে চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয়; নয়তো কোনো আবেগ-ক্ষুব্ধ জগতের প্রচণ্ড এক রাজনৈতিক চরিত্ররূপে।

অভিনয়ের দিক থেকে Expressionisy নাটকের সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য— এর রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপট। কেউ-কেউ এই দিকটির প্রতিই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এর stage craft-ই ভিন্ন। দৃশ্যসজ্জার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবটিই ফুটিয়ে তোলা হয়। নায়ক চরিত্র যেন লেখকেরই আত্মবিকল্প বা Surrogation,-এ জন্যে নায়কচরিত্রকে অনেক সময়েই 'Author Hero' বলা হয়। পৃথিবীকে বাস্তবরূপে প্রদর্শন না করে, লেখকের নিজস্ব জীবন ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে নায়কের মাধ্যমে দেখানো হয়, —যে নায়ক প্রচণ্ড আবেগে উত্তাল, নানা আঘাতে বিপর্যস্ত, কিছুটা বা অস্বাভাবিক। কাজেই 'লেখক-নায়কে'র মনোভাবটি প্রকাশের জন্য নানান ভাবময় নির্বস্তুক রূপসজ্জা, দৃশ্যগত কোনো প্রতীক-সঙ্কেত, আদিমতা প্রকাশক অরণ্যের প্রতিভাস, দূর অতীতের রূপকথার অরূপ জগতের অস্পষ্ট স্পর্শ, প্রাচীনতাগন্ধী গ্রাম বা পোড়োবাড়ী প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হয়। প্রচণ্ড আবেগ উদ্রেক করবার জন্য এখানে চরিত্রে-সংলাপে— দৃশ্যবিন্যাসে-রূপসজ্জায় স্বাভাবিক জগতের কিছু বিকৃতি, কিছু অতিরেক প্রদর্শন করা হয়। সময় এবং সমাজের এক বিশেষ সঙ্কটসন্ধিতে এই ধরনের নাটকের উদ্ভব বলে, এই প্রকার বিকৃতি-আতিশয্য-প্রতীকতা ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। এ নাটক হল— যুগ বা সময়ের মানসিক যন্ত্রণার নাটক। আধুনিক যন্ত্রবদ্ধ জীবনের মর্মতল ভেদ করে উঠে-আসা যুক্তিহীন বিশৃঙ্খল শক্তির বিস্ফোরণ। সংলাপও হয় সেই রকমের ঃ ভাষা অত্যন্ত কাব্যগন্ধী, বিশেষ 'Stylized' [সংলাপ এবং দৃশ্যসজ্জা— দু'দিক থেকেই এই অভিধাটি প্রযোজ্য। এর প্রথম অর্থ ঃ যে বিশেষ বস্তুটিকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, তার প্রকৃত-স্বাভাবিক-বাস্তব রূপ অপেক্ষা এক বিশেষ ঢঙে তাকে প্রকাশ করা; দ্বিতীয়ত, নাটকের অভিনয় কালে তার দৃশ্যপট, রূপসজ্জা ইত্যাদি যেন নাটকটির মূল ভাবনার পরিপোষক হয়ে ওঠে]। নাটকের কাল-পরম্পরা (time-sequence)-কেও এখানে স্বীকার করা হয় না।"

[রবীন্দ্রনাথ : রক্তকরবী— নির্মলেন্দু ভৌমিক]

কিন্তু প্রতীক থাকলেই যে প্রতীকী নাটক হয় না এই নাটকগুলিই তার প্রমাণ। Symbolic নাটক অধিকাংশ সমসয়ই বস্তুজগতকে অতিক্রম করে নির্বস্তুক জগতে যেতে চায়। কিন্তু প্রতীকী নাটক প্রত্যক্ষ জগতেই থাকে। 'রক্তকরবী'কে বিচার করলেই বোঝা যাবে একই সমস্যাকে কীভাবে অন্যভাবে দেখানো যায়। এই নাটককে বিশেষ নামে চিহ্নিত করতে হলে বলতে হয় প্রতীকী নাটকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশের ধ্বংসাত্মক রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছেন। সুতরাং এটি সমসাময়িক কালের। তবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীকী নাটকের অনুসরণে 'রক্তকরবী' লিখেছেন তা নয়। তবে এই ধরনের বিশ্বগত আবহাওয়া ও সমসাময়িক পটভূমিকায় জার্মান নাট্যকারেরা নতুন নাট্যরীতি গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই একই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করে 'রক্তকরবী' রচনা করেছেন। দুটোর মধ্যে একটি সাদৃশ্য থাকতে পারে। জার্মান নাট্যকারদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন তা

নয়। ১৯২০-২১ সালে ফ্রান্স, জার্মানিতে তরুণতম শিল্প-আন্দোলনগুলির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। বহু শিল্পীর স্টুডিওতেও তিনি গিয়েছেন। তাই জার্মান থেকে ফিরে আসার পর এই ধরনের নাটক লেখা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তাই রূপক, প্রতীক নয়, একে Expremssonist বা প্রকাশবাদী নাটক নামে চিহ্নিত করা যায়।

'শারদোৎসব' থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে অঙ্কবিভাগের প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসেছেন। তখন থেকে তিনি নাটকগুলিকে ১/২/৩ —এভাবে সাজিয়েছেন। এরপর 'মুক্তধারা'তে দৃশ্যেরও ভাগ নেই। 'রক্তকরবী'তেও দৃশ্যবিভাগ নেই। এই নাটকের শুরুতে নাট্যনির্দিশে বলা আছে এর ঘটনাক্রম একটি ও এর বিরতি নেই। যদি একাধিক ঘটনাবহুল নাটক হয় তবে ঘটনাগুলিকে প্রকাশ করার জন্য দৃশ্য, অঙ্কের বিভাগ জরুরি। এটি না থাকলে মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটি একই স্থানে ঘটছে। 'রক্তকরবী'তেও বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ঘটনাটি রাজার জালের বাইরেই ঘটছে। তখনই বোঝা যায় এর মধ্যে একটি স্থানগত ঐক্য আছে। স্থানটি হল রাজার জালের বাইরে। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে সম্পূর্ণ নাটকে দৃশ্যের কোনো বিরতি বা ছেদ নেই। এটি এক প্রবাহে চলেছে এবং সে ঘটনার স্থানের একটি নির্দিষ্ট নাম আছে।

দৃশ্য বিভাগের আর একটি সুবিধা হল আগের দৃশ্য দিন এবং পরের দৃশ্য রাত হলে সেটাকে বদলানো যায়। এই দৃশ্য বদলের সঙ্গে সময়েরও একটি সুবিধা ও যোগ আছে। এমন নাটক আছে যেখানের কাহিনিতে ঘটনার কালগত পার্থক্য অনেক। হয়তো আগের অঙ্কে যে যুবক পরের অঙ্কে সে বৃদ্ধ। সুতরাং কালও একটি বিভাগ। কিন্তু যেখানে কাল ইত্যাদির ভাগ নেই সেখানে একটু সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং এই ছেদহীনতা যেমন স্থানের ঐক্য প্রত্যাশা করে তেমনি কালের ঐক্যও প্রত্যাশা করে। 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম এরকম টানা নাটক। সেটাতেও প্রথমে স্থান নির্দেশ করে দেওয়া আছে। এটি আড়াই-তিন ঘণ্টার ঘটনা। নাট্যকাল, মঞ্চকাল, এদুটো প্রায় যেন সমান হয়ে গেছে। অর্থাৎ নাটকের ঘটনা যত সময়ের, অভিনয় করতেও তত সময়ই লাগে। এই নাটকটি সন্ধ্যার একটু আগে শুরু হয়েছে, যদিও এটি বলা হয়নি। কিন্তু একটি চরিত্রের সুখে সন্ধ্যার আকাশের বর্ণনা আছে। তারপর যে অন্ধকার হয়েছে তাও চরিত্রের সংলাপ থেকে বোঝা যায়। তারপর দেখা যায় এত ঘন অন্ধকার যে একে অপরকে চিনতে পারছে না। শেষে তারায় ভরে গেছে আকাশ— এরকম একটি গান দিয়ে নাটকটি শেষ হয়েছে। অর্থাৎ একটি দিনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি নাটকে বোঝা যায়। 'রক্তকরবী'তে দেখি প্রথম থেকে একটি বিশেষ দিনের কথা বলা হয়েছে, সে দিনটি হল ধ্বজাপূজার দিন। ধ্বজাপূজার ছুটির দিনে নাটকটি ঘটেছে। রাজা যখন ধ্বজাপূজায় যাচ্ছেন তখন নাটকটি শেষ হয়েছে। সকাল থেকে রাত গড়িয়ে গেছে। এখানেও সংলাপের মধ্যে দিনের গতির একটি চিহ্ন এঁকে দেওয়া আছে। নাটকটি শুরু হয়েছে নন্দিনী কিশোরের কথাবার্তা দিয়ে। কিশোর নন্দিনীকে ফুল দিচ্ছে। যদিও জোর দিয়ে বলা যায় না তবুও এটি ভাবতে ভালো লাগে যে কিশোর সকালে এসে ফুল দিচ্ছে। নন্দিনীর সঙ্গে কিশোরের কথাবার্তার মধ্যেও যেন

একটি সকালেরই ভাব ধরা পড়েছে। এটি অনুভবের কথা। অবশ এর মধ্যে তথ্যেরও সমর্থন আছে। কারণ নন্দিনী কিশোরকে কাজে পাঠাচ্ছে। কিশোর তখনও কাজে লিপ্ত হয়নি। তাই সময়টিকে সকাল ভাবা যায়। যদিও এটি জোরালো যুক্তি নয়। কিন্তু তারপর চন্দ্রা ও ফাগুলালের কথায় প্রত্যক্ষভাবে 'সকাল' কথাটি পাওয়া যায়। চন্দ্রা বলেছে 'সকাল থেকেই মদ' অর্থাৎ ফাগুলালদের সকলাবেলা দেখা যাচ্ছে। এরপর নন্দিনী বিশুকে জিজ্ঞাসা করেছে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, বিশু তা শুনেছে কিনা। এ থেকে বোঝা যায় এখন সময়টি আর সকাল নয়, দুপুর গড়িয়েছে। এরপর আর সকাল ইত্যাদির বর্ণনা নেই। কিন্তু তীব্র রৌদ্রের কথা আছে। আরো খানিকটা এগিয়ে নন্দিনীর মুখে সন্ধ্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। তারও পরে রাজা বেরিয়ে এসেছেন। তখন থেকে আর কোনো স্পষ্ট সময়বাচক ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তবু বোঝা যায় এটি গোধূলির পরের ঘটনা, তাই তখন রাত হয়ে যাবার কথা।

দ্বিতীয়ত জানি, ধ্বজাপূজা একটি শক্তি-পূজা। রাজা বলেছেন সেই পূজায় গিয়ে তিনি শক্তিসঞ্চয় করবেন। এ ধরনের শক্তি-পূজা সাধারণতে রাত্রে হয়। সুতরাং এর থেকেও বোঝা যায় যে নাটকটিতে একটি কালের ঐক্য আছে। ধ্বজাপূজার দিন সকাল থেকে রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের দিক্ থেকে বলা যায় এতে Unity of time আছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের গঠনকে মানেননি। তাও দেখি অ্যারিস্টটল যে বলেছেন সূর্যের এক আবর্তনের মধ্যে নাটক ঘটবে, তা এ নাটকে মানা হয়েছে। সুতরাং এ নাটকে ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্থান ও কালগত ঐক্যও দেখা যায়।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বিপরীত কথাও বলা যায়। যদিও বলা হচ্ছে এটি ধ্বজাপূজার দিনের ঘটনা। কিন্তু সত্যিই এটি সেই একদিনের ঘটনা কিনা প্রশ্ন জাগে। নাটকে বলা হয়েছে ধ্বজাপূজার দিনটি ছুটির দিন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই কাজে যাচ্ছে। কাজ কামাই করছে বলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খনি থেকে বেরিয়ে আসা শ্রমিকদের দেখিয়ে অধ্যাপক বলেছেন তারা কীটের মতো বেরিয়ে আসছে, অর্থাৎ কাজ চলছে। আবার রাজার ঘর থেকেও সবাই কাজ করে বেরোচ্ছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নাটকটি জুড়েই কাজের আবহাওয়া রয়েছে। আবার অপরদিকে চন্দ্রা ছুটির দিনের কথা বলছে। কাজ আর ছুটি মিলে যাচ্ছে। তাই বলতে হয় এটি কাজের দিন। রঞ্জন আসবে এ খবর নন্দিনী পেয়েছে এবং যক্ষপুরীর অবস্থা দেখে ভীত হয়ে রঞ্জনের কথা সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছে। তখন একজন বলেছে রঞ্জনকে সেদিন দেখেছে। এ থেকেও বোঝা যায় এটি একদিনের ঘটনা নয়। তারপর আর একদল বলেছে, পাঁচদিন আগে দেখেছি। সুতরাং সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে এটি একদিনের ঘটনা নয় এবং নাটকটিতে কালের ঐক্য নেই।

স্থানের দিক থেকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রাজার জালের বাইরেটা হল ঘটনাস্থল। নন্দিনী সেখানে দাঁড়িয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলে। অধ্যাপক তাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে সে যায় না। কিন্তু চন্দ্রা, ফাগুলালরা তো অন্য পাড়াতেও থাকতে

পারে? তারা কি রাজার জালের সামনেই থাকবে? ফাগুলাল কি রাজার জালের সামনেই মদ খাবে বা দাম্পত্যকলহ করবে? এরপর সর্দারদের কথাবার্তাতেও স্পষ্টত রাজার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র দেখা যায়। তারা রাজাকে ভোলাবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। তারাও কি রাজার জালের সামনেই ষড়যন্ত্র করবে? আসলে নাটকটিতে নানা খণ্ড খণ্ড স্থান আছে। নানা স্থানে ঘটনাগুলি ঘটেছে। যেমন এর ভেতরে ঘটনার কাল হিসাবে অনেক টুকরো টুকরো দিনও আছে। দিন ও কালের কোনো ঐক্যই নেই। নাটক অভিনয়ের সময় সিন ফেলে দিয়ে নতুন অঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যাত্রায় একটি বৃত্তের মধ্যেই অভিনয় হয়। অভিনেতারা দূর থেকে দৌড়ে আসেন। সেখান দৃশ্যের ব্যবহার থাকে না। সেখানেও নিশ্চয় একই স্থান বা কালের ঘটনা অভিনীত হয় না। যাত্রায় একটি স্টেজই এই মুহূর্তে অন্দরমহল, পরমুহূর্তে বাহিরমহল রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ সেখানে সংলাপের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে স্থান কাল সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। বস্তুত 'রক্তকরবী'তে একই সঙ্গে তিনি একদিন এবং বহুদিনের কথা বলেছেন। চিত্রশিল্পের মধ্যে একটি রীতি আছে 'কোলাজ', যাতে একটি ছবির মধ্যে অনেক ছবিকে বুনে দেওয়া হয়। 'রক্তকরবী'কেও কোলাজীয় পদ্ধতি বলা যায়। এখানে বহুদিনকে একদিনে, বহু স্থানকে এক স্থানের মধ্যে বুনে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে এটি একটি স্বতন্ত্র গঠনভঙ্গি লাভ করেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অভিব্যক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণগুলি উল্লেখ করুন। (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

প্রতীক এবং সংকেতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

'রক্তকরবী' নাটকে নীলকণ্ঠ পাখির পালকের প্রসঙ্গদ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) মূল বক্তব্য এবং উপস্থাপনরীতির বিচারে 'রক্তকরবী' কোন শ্রেণির নাটক? এ প্রসঙ্গে আপনার যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত প্রতিষ্ঠা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

১১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের আলোনার শেষে এর সারসক্ষেপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে নানা রূপান্তর সাধিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। 'রক্তকরবী' নাটকেরে নামও দুবার পরিবর্তিত হয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে অনেকে 'রক্তকরবী'র পূর্ববর্তী নাম দুটিকে সমর্থন করেছেন। তবে সাধারণভাবে 'রক্তকরবী' নামকরণের পক্ষে বেশির ভাগ সমালোচক মত প্রদান করেছেন।

নাটকের নামকরণের আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেল 'যক্ষপুরী' নামটি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে তুলে ধরে। 'রক্তকরবী' নাটকের শেষে ফাগুলালের নেতৃত্বে বন্দীশালা ভেঙে ফেলার মধ্যে যে বৃহৎ ব্যঞ্জনা রয়েছে 'যক্ষপুরী' নামের মধ্যে তা ধরা পড়েনি। 'যক্ষপুরী' নামের তুলনায় 'নন্দিনী' নাম যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময়। নন্দিনী নামটি নাটকের মূল ভাবনার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে দেখা যায় ব্যক্তি নন্দিনী এখানে একটি বস্তুপ্রতীকতায় উল্লিখিত। নাটকের মধ্যে এই বিশেষ সাংকেতিকতার দিকটি ব্যাপকতর হয়ে 'রক্তকরবী' নামে পরিবর্তিত। রক্তকরবী ফুল নাটকে এক বহু উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রতীকরূপে এসেছে, নাটকে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করতে হয় নাটকের নামকরণ সার্থক ও সুপ্রযুক্ত।

'গীতাঞ্জলি'র যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে নতুন ধারা শুরু হয় সেগুলিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিধা আরোপিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী এ সমস্ত নাটককে তত্ত্বনাটক বলে অভিহিত করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকের ক্ষেত্রেও এর শ্রেণিবিচার প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছে।

রূপক এবং প্রতীকের ব্যাখায় দেখা গেল 'রক্তকরবী' রূপক নাট্য নয়। 'রক্তকরবী' নাটকে প্রচুর প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও একে প্রতীকী নাটকও বলা যাবে না। এই নাটকের বক্তব্যবিষয় একেবারেই সমকালীন। এর মধ্যে কোনো আলো-ছায়ার অস্পষ্টতা নেই। প্রতীকী রচনার স্বভাবধর্মের অনেক বাইরে এর অবস্থান। 'রক্তকরবী' নাটকের সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদী নাট্যধারার সাজুয্য খুঁজে পাওা যায়। নাটকের গঠনভঙ্গি, চরিত্রনির্মাণ ও বক্তব্যবিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অভিব্যক্তিবাদ বা Expressionism-এরই ছায়াপাত

ঘটেছে 'রক্তকরবী' নাটকে। তবে শুধু Expressinism-ই নয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তারও প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটকের গঠন ভঙ্গিতে।

১১.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

দান্তে/ডিভাইন কমেডি : দান্তে ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জীবৎকাল ১২৬৫ থেকে ১৩২১ খ্রিস্টাব্দ। 'ডিভাইন কমেডি' তাঁর রচিত মধ্যযুগের বিরাট কাব্যগ্রন্থ। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এর রচনা শুরু হয়। এই গ্রন্থ বহুবার পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই কাব্যের জন্য কবির প্রণয়িনী বিয়ত্রিচ-এর নামও জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ইবসেন / 'The Doll's House' : নরওয়েবাসী বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর জীবৎকাল ১৮২৮ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর নাটকগুলি ইউরোপের বহু দেশে উচ্চ প্রসংশিত। তাঁর সমস্যামূলক নাটকগুলির মধ্যে 'The Doll's House', 'Ghosts', ইত্যাদি বিখ্যাত। 'The Doll's House' রচিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। নায়িকা নোরার বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মদর্শনের কাহিনি এতে বর্ণিত হয়েছে।

চেখভ (১৮৬০-১৯০৪) : রুশীয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'Ivanov' (১৮৮৭)। 'Uncle Vanya' নাটকটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে বিবেচ্য। তিনি অনেক ছোটোগল্প ও উপন্যাসও রচনা করেছেন।

গালিভার্স ট্র্যাভেলস : জোনাথন সুইফ্‌ট রচিত ইংরেজি ব্যঙ্গ-কাহিনি। এই কাহিনির মধ্য দিয়ে লেখক বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার পরিচয় দিয়ে চেয়েছেন। রাজনীতিক ও যৌদ্ধাদের ব্যঙ্গ করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

অ্যারিস্টটল : প্রসিদ্ধ গ্রিক পণ্ডিত। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্লেটো তাঁর অধ্যাপক। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এথেন্সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রদের ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার, রাজনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তিনি মহাবীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। 'Ethics', 'Poetics', 'Politics' ইত্যাদি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

১১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর নিরানন্দ পরিবেশে রাজা-বিশু-ফাগুলাল-চন্দ্রা-সর্দার-অধ্যাপক চরিত্রগুলি নন্দিনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে নন্দিনী চরিত্রটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২। 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনীর আভরণস্বরূপ প্রিয় রক্তকরবী ফুলটি কেমন করে অন্যান্য চরিত্রের কাছে গভীর কোনো সংকেত বহন করে এনেছে তার সবিস্তার আলোচনা করুন।

৪। 'আমি রঞ্জনের উল্টো পিঠ যে পিঠ আলো পড়ে না।' —নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জন এবং বিশুর সম্পর্কের এই বৈপরীত্যের কথা মনে রেখে বিশু ও রঞ্জন চরিত্রের তুলনা করুন।

৫। 'কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সেতো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।' —নন্দিনী সম্পর্কে অধ্যাপকের এই মন্তব্য নন্দিনী চরিত্রটি বুঝতে কতটা সাহায্য করে, যথাসম্ভব নিজের ভাষায় তা পরিস্ফুট করুন।

৬। 'রক্তকরবী' নাটকের যে কোনো দুটি অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা এবং নাট্যোপযোগিতা যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করুন।

৭। 'রক্তকরবী' নাটকে 'রক্তকরবী'র ফুলটির উল্লেখ, প্রয়োগ বা ব্যবহার নাট্যকারের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে, দৃষ্টান্ত সহযোগে যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করুন।

৮। 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ।' —কোন চরিত্র সম্বন্ধে নাট্যকার এই মন্তব্য করেছেন এবং কী অর্থে, উক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

১১.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৪র্থ পর্যায়) : ভূদেব চৌধুরী।

২। রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩। রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা : সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

৪। রবিরশ্মি (২য় খণ্ড) : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৬। কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক : শঙ্খ ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা : রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ।

৮। রবীন্দ্র-বিবেচনা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৯। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ : প্রমথনাথ বিশী।

১০। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক : কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঃ রক্তকরবী : নির্মলেন্দু ভৌমিক।

১২। নাটক রক্তকরবী : শম্ভু মিত্র।

* * *